স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিপান চন্দ্র
অমলেশ ত্রিপাঠী
বরুণ দে

অনুবাদ
ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়
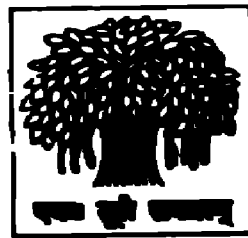
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচীপত্র

ভূমিকা vii

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব 1

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগ্রামের আদিপর্ব 33

তৃতীয় অধ্যায়

উগ্র স্বাদেশিকতার যুগ 68

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরাজ লাভের সংগ্রাম 104

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তির পূর্বাভাস 134

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তির আস্বাদ 164

ভূমিকা

এ বছর ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঞ্চবিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপনে আমরা ব্রতী হয়েছি। যে স্বাধীনতাকে আমরা সযত্নে লালন করি তা অর্জন করতে ভারতের মানুষকে কি সংগ্রাম করতে হয়েছে তার ইতিহাস পুনরীক্ষণ করার এই উপযুক্ত সময়। স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নাগরিকেরই জানা উচিত কতো পরিশ্রমে, কতো রক্তের মূল্যে অর্জিত এই স্বাধীনতা। ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য দুঃখবরণ করেছেন, আত্মত্যাগ করেছেন—তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা।

এ উদ্দেশ্যকে সফল করা কিন্তু খুব সহজসাধ্য ছিল না। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের রূপরেখা সুপরিচিত ঠিকই। কিন্তু তার সকল বৈশিষ্ট্যকে বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে চিত্রিত করতে, সংগ্রামে বিবিধ শক্তির অবদানের যথাযোগ্য ছবি আঁকতে গেলে প্রভূত যত্ন, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। কাজটি আরো দুঃসাধ্য এই কারণে যে গবেষকদের উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করতে চাইনি, চেয়েছিলাম সাধারণ পাঠক, বিশেষ করে তরুণদের উপযোগী স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঠযোগ্য একখানি ইতিবৃত্ত।

গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও রচনার ভার নেওয়ার জন্য আমি দেশের খ্যাতনামা কয়েকজন ঐতিহাসিককে আহ্বান জানাই। ড. এস. গোপাল এই বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর সভাপতি। অন্যান্য সদস্য ড. সতীশ চন্দ্র, ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, ড. বিপান চন্দ্র, ড. বরুণ দে, ড. শেগ আলি এবং ড. এস. আর. মেহরোত্রা। বইটির কাঠামো কি হবে তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হন এবং ড. বিপান চন্দ্রকে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, ড. ত্রিপাঠীকে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এবং ড. বরুণ দেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় লেখার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা যে পাণ্ডুলেখ প্রস্তুত করেন, বিশেষজ্ঞমণ্ডলী সেটি আলোচনা করেন এবং তাঁদের বিবিধ পরামর্শের ভিত্তিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের শ্রী কে. পি. রঙ্গচারি পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন। যে রকম তৎপরতার সঙ্গে এঁরা এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন তাতে প্রত্যেকের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বইটির চূড়ান্ত রূপ বিশেষজ্ঞমণ্ডলী অনুমোদন করেছেন। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও

বইটি প্রামাণিক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ বই পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট স্থির করেছেন প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ করবেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে এ বইটি বেশি উপযোগী হবে।

এস.নুরুল হাসান
মন্ত্রী
শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি
ভারত সরকার

নয়াদিল্লি
২ অগাস্ট, ১৯৭২

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

"অনেক বছর আগে আমরা অনাগতের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি রেখেছিলাম। সম্পূর্ণভাবে হয়তো নয়, কিন্তু বহুলাংশে এখন সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সময় আসন্ন। মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, সমস্ত পৃথিবী যখন সুপ্তিমগ্ন, ভারতবর্ষ তখন জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায়।"

১৯৪৭-এর পনেরই অগাস্ট সংবিধান সভা ও ভারতীয় জাতির উদ্দেশে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সংগ্রামের তখন সমাপ্তি ঘটেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন।

অনাগতের কাছে যে প্রতিশ্রুতি রাখার কথা নেহরু বলেছিলেন, কী সেই প্রতিশ্রুতি? স্বাধীনতার সতেরো বছর আগে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন নববর্ষকে স্বাগত জানালো, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রাভী নদীতটে অগণিত জনতার উপস্থিতিতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উন্মোচন করে নেহরু তখন ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য হবে পূর্ণ স্বরাজ, পূর্ণ ও সামগ্রিক স্বাধীনতা। তখন একটি শপথপত্র লেখা হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনগণ এই শপথ গ্রহণ করবেন ও স্বাধীনতার জন্য তাঁদের সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করবেন। এই দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫০-এ নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হয়। এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে ২৬ জানুয়ারিতেই হল নতুন সংবিধানের উপস্থাপনা। তারপর থেকে প্রতি বছরই এই দিনটি ভারতবর্ষে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ভবিষ্যতের কাছে প্রতিশ্রুতি রাখার কথা নেহরু যখন বলছিলেন তখন তিনি নির্দেশ করছিলেন ১৯২৯-৩০ সালের ঘটনাগুলির দিকে। সেই দিনটিতে যে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল, তার শর্ত পালিত হল ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্টে ভারতের স্বাধীনতালাভে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিন্তু ১৯২৯ সালে শুরু হয় নি। এর বহু যুগ আগেই সে সংগ্রামের সূচনা। স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের কাহিনীই এই বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস খৃস্ট-অব্দের সূচনাকাল থেকেও বহু শতাব্দী পুরনো। এই দীর্ঘ ইতিহাসের ধারা সব সময় সমতল ও একমুখী খাতে প্রবাহিত হয় নি। বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষ ছিল অসংখ্য রাজ্যের সমষ্টি, তাকে একটি দেশ বলে চিহ্নিতই করা যেত না। সময়ে সময়ে এই উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল হয়তো কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে এসেছে। বহু বার এদেশ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে, ভারতীয় হয়ে গেছে, রাজা বা সম্রাটের মর্যাদায় দেশ শাসন করেছে। আবার কেউ কেউ এদেশকে শুধু লুণ্ঠন করেই আহৃত ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে গেছে। কোনো কোনো যুগ ছিল মহতী সমৃদ্ধির যুগ, কোনোটা বা ছিল পরিবর্তন-বিমুখতা বা দুর্দশায় ভারাক্রান্ত যুগ। অবশ্য আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে সাম্প্রতিকতম ইতিহাসের কথাই বুঝি—যখন ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের শাসনাধীন এবং এদেশের মানুষ বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে মুক্তিলাভের সংগ্রামে ছিল অবিচল।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনী যখন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে তখন থেকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা ধরা যায়। তবে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ভারতীয় জনগণ ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতই এই সংগ্রামের উৎস। এই স্বার্থসংঘাতকে বুঝতে গেলে বুঝতে হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক স্বরূপ ও ভারতীয় সমাজের ওপর তার প্রভাব। বিদেশী শাসনের চরিত্র থেকেই জন্ম নিয়েছিল এদেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনা; জাগতিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত, রাজনৈতিক ইত্যাদি যেসব উপকরণ যে কোনো শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন তা সৃষ্ট হয়েছিল বিদেশী শাসনের বিশেষ প্রকৃতি থেকেই।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিকাশ

১৭৫৭ থেকেই ব্রিটিশ তাদের ক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তবে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র আগাগোড়া অপরিবর্তিতই ছিল এ কথা মনে করা ভুল হবে। প্রায় দুশো বছরের ইতিহাসে কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে দেখা যায়। ব্রিটেনের নিজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ধারার সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তন ঘটে ব্রিটিশ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতির; পরিবর্তিত হয় তার শাসননীতি ও তার প্রভাব।

আদিতে, অর্থাৎ ১৭৫৭-রও আগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগ্রহ ছিল মাত্র দুটি ব্যাপারে। সে চাইত ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার; আর কোনো ইংরেজ ও ইওরোপীয় ব্যবসায়ী বা বণিকগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

যাতে না নামতে পারে সে দিকেই ছিল তাদের লক্ষ্য। ভারতীয় পণ্য এদেশে কেনা এবং বিদেশে বিক্রির ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এটাও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চাইত না। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি মুনাফা যাতে লাভ করা যায় সেটাই কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল। তারা নিজেদের পণ্য যথাসম্ভব চড়া দামে বিক্রি করে ভারতীয় পণ্য যথাসম্ভব কম দামে কিনতে চাইত। স্বাভাবিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসায়ে লিপ্ত, এ সুবিধা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ প্রতিযোগীদের অবশ্য হঠিয়ে রাখা খুবই সহজ ছিল। উৎকোচ এবং অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উপায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের সম্মতি আদায় করতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ আইন দিয়ে অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাই শুরু করতে হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং হিংস্র অনেক যুদ্ধ। বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলি অবস্থিত ছিল স্বদেশ থেকে অনেক দূরে, অনেক সমুদ্র পেরিয়ে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাই একটি শক্তিশালী নৌবহরও মজুত রাখতে হত।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যাওয়াও খুব সহজ ছিল না। তাদের রক্ষক ছিল প্রবল প্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য করার অধিকারই মিলত মুঘল সম্রাট বা তাঁর প্রদেশপালদের কাছে অত্যন্ত বিনীত ভাবে আবেদন জানানোর পর। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করল। দূরবর্তী উপকূল অঞ্চলগুলিতে মুঘলদের শাসন ক্রমশ শিথিল হতে লাগল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও ক্রমশ বেশি করে তার উন্নত সামুদ্রিক শক্তিকে কাজে লাগাল যাতে উপকূল বরাবর নিজেদের বাণিজ্যিক অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং উপকূল-অঞ্চলের এবং বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হঠানো যায়।

আরো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল তাদের। ভারতবর্ষের মধ্যে এবং সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধ চালানোর জন্য, নৌবাহিনী ও সৈন্যবাহিনী পোষণ করার জন্য এবং দেশের অভ্যন্তরে দুর্গ ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোম্পানির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিপুল অর্থসম্পদ না ছিল ব্রিটিশ সরকারের, না ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির। সুতরাং এই অর্থভাণ্ডার আহরণ করতে হত ভারতবর্ষ থেকেই। কোম্পানি এই অর্থ সংগ্রহ করত কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রভৃতি উপকূল অঞ্চলের দুর্গনগরগুলি থেকে স্থানীয় কর আদায় ক'রে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানির অধিকৃত ভূখণ্ডের সীমানা বাড়িয়ে তোলার দরকার হল যাতে তারা বিস্তৃততর অঞ্চল থেকে বেশি পরিমাণে কর আদায় করতে পারে এবং এইভাবে

নিজেদের অর্থসম্পদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এই সময় নাগাদ ব্রিটেন ধনতন্ত্র বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে শুরু করেছিল। ধনতন্ত্রের আরো অগ্রগতির জন্য কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিল প্রভূত পরিমাণ পুঁজির। ব্রিটেনে এই পুঁজির উৎস ছিল সীমিত, তাই সে দেশের পুঁজিপতি সম্প্রদায় ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রসারের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা ভাবতে লাগলেন। ভারতের খ্যাতি ছিল তার ঐশ্বর্যের জন্য; সেজন্য তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে এ ব্যাপারে সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

দুটি উদ্দেশ্যই—অর্থাৎ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ও অর্থসম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা—সাধিত হয়েছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-ভারত—এই দুটি অঞ্চলই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্যে এল; কোম্পানির ডিরেক্টরদের তা কল্পনারও বাইরে ছিল। এর ফলে বিজিত অঞ্চলগুলির প্রাদেশিক রাজস্ব সরাসরিভাবে এসে গেল কোম্পানির হাতে। স্থানীয় শাসক, অভিজাত সম্প্রদায় ও জমিদারদের সঞ্চিত সম্পদও কেড়ে নেবার ক্ষমতা জন্মাল কোম্পানির। সম্পূর্ণভাবে নিজেদের এবং নিজেদের কর্মচারী গোষ্ঠীর স্বার্থসাধনের জন্যই এই সমস্ত সম্পদ এবং স্থানীয় রাজস্ব আত্মসাৎ করত কোম্পানি; তার আরো উদ্দেশ্য ছিল—সেই অর্থ দিয়ে ভারতে নিজেদের ক্ষমতাকে আরো প্রসারিত করা। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে খরচখরচা বাদ দিয়ে তার রাজস্বের মোট ৩৩ শতাংশ, কোম্পানি পণ্যের আকারে বাইরে পাঠিয়েছিল।

তা ছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতীয় ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী এবং জমিদারদের চাপ দিয়ে বেআইনী ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত এবং তা বাইরে পাঠাত। ব্রিটেনের ধনতন্ত্রের অগ্রগতিতে ভারত থেকে পাঠানো এই অর্থসম্পদের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য। হিসেব কষে দেখা গেছে যে ব্রিটেনের তৎকালীন জাতীয় আয়ের প্রায় দুই শতাংশ ছিল এই অর্থসম্পদ।

একই সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের জন্য কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাত। আস্তে আস্তে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্পিষ্ট করে দেওয়া হল। তাঁতী এবং অন্য কারিগরদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তাদের তৈরি পণ্য বেচতে অথবা কোম্পানির কাছে সামান্যমাত্র মজুরিতে তাদের ভাড়া খাটতে বাধ্য করা হল। ব্রিটিশ শাসনের এই প্রথম পর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, শাসন-ব্যবস্থায়, বিচার-ব্যবস্থায় বা যোগাযোগ-ব্যবস্থায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কৃষি বা শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতিতে, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা শিক্ষা ও বুদ্ধি বৃত্তির জগতেও কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নি। এই পর্বের ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে প্রাচীন ধরনের সেই-সব সাম্রাজ্যের

প্রায় কোনো তফাত ছিল না—কারণ তারাও সুদূরবর্তী উপনিবেশ থেকে শুধু কর সংগ্রহ করত। ব্রিটিশ শাসন অবশ্য এ কাজে তাদের চেয়ে দক্ষ ছিল অনেক বেশি।

তাদের পূর্বসূরীদের মতো ব্রিটিশও বুঝেছিল যে যতদিন গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের উদ্বৃত্ত শোষণ করে নেওয়া চলবে, ততদিন গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে যেটুকু পরিবর্তন আনা হয়েছিল তা শুধু রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার উচ্চ স্তরে। রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থাকে আরো নিপুণ করে তোলাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

জ্ঞান এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রচার করার কোনো চেষ্টা করা হয় নি যে চিন্তাধারা পাশ্চাত্য জীবনধারার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসছিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি মাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তার একটি কলিকাতায়, অন্যটি বারাণসীতে। দুটিই ছিল পুরনো ধাঁচের ফার্সী এবং সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। এমন-কি, খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকদেরও রাখা হত কোম্পানির এলাকার বাইরে।

এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যখন নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছিল, তখন ব্রিটেনে বড়ো বড়ো বাণিজ্য-সমিতিগুলির যুগ শেষ হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সমাজের মধ্যেই কোম্পানি ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক প্রভাবের প্রতিনিধি, উদীয়মান সামাজিক শক্তির নয়।

শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র ও অবাধ বাণিজ্যের যুগ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনে এক তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল—এই নতুন অধিকৃত সাম্রাজ্য কার স্বার্থে লাগানো যায়। ব্রিটেনের অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের কাছে বছরের পর বছর কোম্পানিকে নতি স্বীকার করে যেতে হল। ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে তার যা অধিকার টিকে রইল তা আগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ছায়া মাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা তখন ছিল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। সে ক্ষমতা ব্যবহৃত হত সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে।

ব্রিটেনে ইতিমধ্যে শিল্পবিপ্লব ঘটে গেছে। উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে তখন সর্বাগ্রগণ্য। ব্রিটিশ সমাজের মধ্যেই শিল্পবিপ্লব এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। ব্রিটিশ অর্থনীতিতে শিল্পপতি শ্রেণী হয়ে উঠেছিল প্রাধান্যের অধিকারী; তাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থ ছিল ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও নীতির লক্ষ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবলমাত্র একটি বাণিজ্যিক সমিতি হওয়ায় ভারতে তাদের স্বার্থের যে চেহারা ছিল, শিল্পপতি শ্রেণীর ঔপনিবেশিক স্বার্থের চরিত্র ছিল তার থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। ফলে এইবার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল।

সরাসরি রাজস্ব আত্মসাৎ করে কিংবা ভারতের কারিগরি পণ্য রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার অর্জন করে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের খুব একটা লাভ হত না। অন্যদিকে তাদের নিজেদের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল এবং তা বিদেশে রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের মতো বিশাল ও জনবহুল দেশ ছিল স্থায়ী আকর্ষণ। ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রয়োজন পড়ত কাঁচামালের; ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের খাদ্যসামগ্রীর চাহিদাও মেটাতে হত। এই দুটি জিনিসই আমদানি করার দরকার হত। ব্রিটেন এবার চাইল যে ভারতবর্ষ হোক তার অধীনস্থ সহব্যবসায়ী। একদিকে তাকে বাজার হিসেবে কাজে লাগানো যাক, আর অন্যদিকে পরাধীন উপনিবেশ হিসেবে তাকে বাধ্য করা যাক ব্রিটেনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করতে।

একটি সমস্যা অবশ্য ছিল। ভারতবর্ষে যে সমস্ত পণ্য আমদানি হত তার জন্য তাকে অর্থমূল্য দিতে হত। তা ছাড়া কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশ হিসেবে এবং অসামরিক ও সামরিক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অবসরবৃত্তি হিসেবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ তাকে বাইরে পাঠাতে হত। এইসব কর্মচারীদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থও তাদের সঙ্গে স্বদেশে নিয়ে যাবার অধিকার দিতে হত। এ ছাড়া ব্রিটিশ বণিক এবং ভূস্বামীরা যে মুনাফা অর্জন করত তাও বের করে নিয়ে যাওয়া হত এ দেশ থেকে। এদেশে ব্রিটিশ পুঁজি যা লগ্নী করা হত তার সুদ এবং লভ্যাংশও মেটাতে হত ভারতকেই। এইসব কারণে ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশে কিছু পণ্য রপ্তানি করার প্রয়োজন হত ভারতের। কিন্তু চিরাচরিত ভারতীয় কারিগরি পণ্যের উৎপাদন প্রায় একেবারে বন্ধই হয়ে এসেছিল। ভারতের রপ্তানি পণ্য ব্রিটেনের দেশী শিল্পের সঙ্গে যাতে কোনোরকম প্রতিযোগিতা করতে না পারে, ব্রিটেনের পক্ষে সেটাও লক্ষ্য রাখা জরুরি ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং একমাত্র কৃষিজ কাঁচামাল এবং যন্ত্রে তৈরি হয় নি এমন পণ্য রপ্তানি করা যেত। ফলে, চীন সরকার আইন করে আফিঙের আমদানি বন্ধ করে দিলেও আফিঙের উৎপাদন এবং চীনদেশে তার রপ্তানি এই সময় বেড়ে যায়। ভারত সরকার এই সময় অন্য যেসব পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করছিলেন তা হল তুলা, পাট, রেশম, তৈলবীজ, গম, চামড়া, নীল এবং চা। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারা যেভাবে পালটাল তাকে নাটকীয় বলা যেতে পারে। এ পরিবর্তন অবশ্য মন্দর দিকেই গেল। বহু শতাব্দী ধরে ভারত কার্পাসবস্ত্র ও হস্ত শিল্পের রপ্তানির জন্য খ্যাত ছিল, উনবিংশ শতকে তুলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করে তাকে আমদানি করতে হত তৈরি কাপড়। তৎকালীন ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো ছিল তাতে তার পক্ষে এইসব নতুন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। প্রয়োজন পড়ল এই কাঠামো পরিবর্তন করার এবং তাকে এমন একটি রূপ দেওয়ার যাতে সে ব্রিটিশ অর্থনীতির ক্রমোন্নতিতে তার নতুন দায়িত্ব পালন করতে

পারে। তার পুরনো ধাঁচের অর্থনীতির গঠন ছিল যন্ত্রশিল্পের সম্পর্করহিত; সে গঠনকে এবার পরিবর্তন করার দরকার হল। ১৮১৩-র পরে ভারতে ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি এই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সমাজের রূপান্তর সাধনের কাজ হাতে নিয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বৃটিশ পুঁজিপতিদের সম্পূর্ণ অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হল। তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমনভাবে খুশি চালিয়ে যাবার অনুমতি ছিল। আর সবার ওপরে হল অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তন। ভারতের বন্দর এবং বাজারগুলি অবাধে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল ব্রিটিশ উৎপাদকদের কাছে। ব্রিটিশ পণ্য ভারতে প্রবেশাধিকার পেল সম্পূর্ণ বিনা শুল্কে কিংবা বড়োজোর নামমাত্র শুল্কে। শাসনব্যবস্থা এখন শুধু রাজস্ব আদায় এবং বাণিজ্যিক নিরাপত্তার খাতিরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না; তাকে অনেক বেশি বিশদ ও ব্যাপক করে তোলা হল এবং নানা ধরনের কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করা হল। শাসনের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে গ্রামাঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করল যাতে ব্রিটিশ পণ্য দেশের অভ্যন্তরে ছোটো ছোটো শহরে এবং গ্রামে পৌঁছতে পারে এবং সেসব অঞ্চল থেকে রপ্তানির উপযোগী কৃষিজ সামগ্রী আহরণ করে আনতে পারে। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র ব্যাপকভাবে ও দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত হল।

এছাড়া, ভারতীয় সমাজকে ধনতন্ত্রভিত্তিক ব্যবসার সম্পর্কের ওপর দাঁড় করাতে গেলে তার পুরো আইনের কাঠামোটিকেও আগাগোড়া পালটানোর প্রয়োজন ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ অর্থনৈতিক লেনদেনকে যদি কার্যকর করে তুলতে হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে যে কোনো চুক্তিকে অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করা দেশের প্রথম আইন ও নীতি হতে বাধ্য। এইভাবে একটি নতুন বিচারব্যবস্থার সৃষ্টি হল যার ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ নতুন কিছু নিয়ম ও আইনের ধারার সমষ্টি। এর উদাহরণ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় ফৌজদারি আইন।

রাষ্ট্রের এই বিশাল নতুন শাসনযন্ত্র ও বিচার-ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য এবং ব্রিটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিম্নস্তরে কাজ করার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দিল। ব্রিটেনের জনবল এত বেশি ছিল না যে তা দিয়ে এ কাজ চালানো যেতে পারে। তা ছাড়া ভারতের মতো সুদূর উপনিবেশে, তার অপ্রীতিকর জলবায়ুর মধ্যে ইংরেজদের টেনে আনতে গেলে তাদের যেরকম বেশি মাইনে দিতে হত যে, সব চাকুরিতে ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করা ভারত সরকার বা ব্রিটিশ ব্যবসায়ী কারুরই সাধ্যে কুলোত না। আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়১৮১৩ সালে কিন্তু তা প্রসারলাভ করে ১৯৩৩-এর পর থেকে।

ভারতে আমদানি করা পণ্যের পরিমাণ ছিল বিপুল। কাঁচামালের রপ্তানির পরিমাণ

ছিল তার চেয়েও বেশি। তার জন্য প্রয়োজন হল সস্তা এবং স্বচ্ছন্দ পরিবহন ব্যবস্থার। সরকার সেইজন্য নদীপথে বাষ্পীয় পোত চালু করলেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি হল। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের সবচেয়ে উল্লেখ্য কাজ হল ১৮৫৩-র পরে বিস্তৃত রেলপথ স্থাপন। এর ফলে দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পণ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে বন্দরগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হল। ১৯০৫ সালের মধ্যেই প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৮,০০০ মাইল রেলপথ স্থাপন করা হয়েছিল। একই ভাবে চালু হয় আধুনিক ডাক ও তার বিভাগ। এর ফলে ব্যবসায়িক লেনদেনের অনেক সুবিধা হয়।

ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের মধ্যে ও ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে এই সময় একধরনের সাম্রাজ্যবাদমিশ্রিত উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতাদর্শ বিকাশ লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটেনই ছিল একমাত্র দেশ যেখানে যন্ত্রসভ্যতা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ফলে তাকে 'পৃথিবীর কারখানা', আখ্যা দেওয়া হত। এর ওপর এবং ব্রিটেনের সামুদ্রিক শক্তির ওপর নির্ভর করে এইসব রাজনীতিবিদ এবং শাসক দলের অনেকে মনে করতেন যে যতদিন অবাধ বাণিজ্য চালু থাকবে ততদিন প্রত্যক্ষ বা সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের কাঠামো ছাড়াই ভারত এবং অন্যান্য দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আগের মতোই ভালোভাবে শোষণ করা যাবে। তাঁরা সেইজন্য বলতেন যে স্বায়ত্তশাসনের কাজে ভারতীয়দের শিক্ষা দেওয়া হোক যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় ভারতীয় জাতীয়বাদীদের মধ্যে এ ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্বে অর্থনৈতিক শোষণের এক নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়, যদিও শোষণের পূর্বতন পদ্ধতিটি উঠে গিয়েছিল এমন কথা মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। ভারতের বাকি অংশে দখল ও ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় রাজস্ব তখনও কাজে লাগত; প্রশাসন ও সামরিক বিভাগে হাজার হাজার ইংরেজ কর্মচারীকে উচ্চপদে নিয়োগ করতে হত এবং এদের যা মাইনে দেওয়া হত, তা এখনকার মাপকাঠিতে বিচার করলে অকল্পনীয় মনে হয়। তা ছাড়া ভারতের পশ্চাদ্‌ভূমিগুলিতে ঔপনিবেশিকতার যাতে পূর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটে তার উপযোগী অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের খরচপত্র মেটাতে হত এই রাজস্ব থেকে। এইসব কারণে ব্রিটিশ শাসনের নতুন পর্বে ভারতীয় কৃষকদের করের বোঝা বহু পরিমাণে বেড়ে যায়।

ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়নি বলে নীল, আফিং, চা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতেও সরকার এবং এদেশের ব্রিটিশের পুঁজিপতিদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। তা ছাড়া, যে অবাধ বাণিজ্য ভারতবর্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে সুবিধা হত একপক্ষেরই।

উন্নততর যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ-উপনিবেশের পণ্যের সঙ্গে যে সব ভারতীয় পণ্য তখনও প্রতিযোগিতা করতে পারত ব্রিটেনে তাদের চড়া আমদানি শুল্ক দিতে হত। কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮২৪ সালে ভারতে তৈরি কাপড়কে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ শুল্ক দিতে হত। ভারতীয় চিনির ওপর ধার্য শুল্কের পরিমাণ ছিল তার নির্ধারিত মূল্যের তিনগুণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটেনে ধার্য এই শুল্কের পরিমাণ এমন-কি, শতকরা ৪০০ ভাগ পর্যন্ত উঠেছিল। ব্রিটেনে এই সব পণ্য পাঠানো যখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তখনই তাদের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হয়। তা ছাড়া সরকারের সিদ্ধান্তে দেশের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ শুল্কের এক বিশাল জাল বিস্তার করা হয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পণ্য বিক্রির যে সুবিধা আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে ভারতীয় উৎপাদকেরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল। এইভাবে ভারতবর্ষকে এমন এক বিচিত্র বিরোধী অবস্থায় ফেলা হল যেখানে তার নিজের পণ্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলে তার ওপরে শুল্ক ধার্য করা হত, অথচ বিদেশী পণ্য বিনা শুল্কে সেই সুবিধা ভোগ করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এইসব অন্তর্দেশীয় শুল্ক তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু ততদিনে ভারতীয় বাজারেও দেশী হস্তশিল্পের চেয়ে ব্রিটিশ পণ্যের কদর বেশি।

বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ এবং ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ

বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় পর্ব শুরু। এই পর্বের সূচনার মূলে ছিল বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। পশ্চিম ইওরোপের অন্যান্য দেশ এবং উত্তর আমেরিকায় যন্ত্র সভ্যতার প্রসার ঘটছিল। যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ও পুঁজির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আধিপত্যের অবসান ঘটে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম. জার্মানি, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং পরবর্তী কালে জাপান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তাদের পণ্য বেচবার জন্য বিদেশী বাজারের অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়। এইভাবে বাজারের জন্য বিশ্বব্যাপী এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানকে যন্ত্রশিল্পের কাজে লাগানোর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। আধুনিক ইস্পাতশিল্পের জন্ম এই সময়ে। ১৮৫০ সালে সারা পৃথিবীতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০,০০০ টন। ১৮৭০-রেও এই উৎপাদনের পরিমাণ ৭০০,০০০ টনের চেয়ে কম ছিল। ১৯০০-তে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৮,০০০,০০০ টনে। আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের সম্প্রসারণও ঘটে এই যুগে। ইন্টারন্যাল কম্বাশ্‌সন এঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলের ব্যবহার এবং শিল্পোৎপাদনে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারও এই যুগেরই অবদান।

ফলে এক দিকে যন্ত্রশিল্প দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে, অন্য দিকে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। কাঁচামালের সরবরাহ ছাড়া পুরো যন্ত্রশিল্পের কাঠামোই ধসে পড়ত। শিল্পোদ্যোগের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা এত বেড়ে যেতে লাগল যে তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন দেখা দিল। সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হল কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের নতুন নতুন উৎসের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান। আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিতে কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামালের যেসব উৎস ছিল, এমন-কি, যাদের সম্ভাব্য উৎস বলে মনে করা হয়েছিল তাদের ওপর একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি এবং বর্ধিত মাত্রায় উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক বাজারগুলির শোষণ উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলির হাতে এনে দিল অপরিমিত পুঁজির সম্ভার। এইসব পুঁজি আবার বেশি করে জমা হচ্ছিল মুষ্টিমেয় কতকগুলি ব্যাঙ্কে, সমিতিতে, ট্রাস্টে এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারিত করে দেয় এমন কিছু উৎপাদক সঙ্ঘের হাতে। এইসব পুঁজি লগ্নী করার পথ খুঁজে বের করার প্রয়োজন পড়ল। যেসব দেশের হাতে এই পুঁজি ছিল সেখানেও অধিকাংশ লোকই তখনও ছিল গরিব; সুতরাং সেইসব দেশের মধ্যেই পুঁজি লগ্নী করার অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু এই দেশগুলিতে শ্রমজীবি শ্রেণী ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়ে উঠতে শুরু করে। তাই ব্যাপকভাবে পুঁজি লগ্নী করে যদি স্থানীয় শিল্পের প্রসার ঘটানো হত তা হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর সুবিধা আদায় করার ক্ষমতা বেড়ে যেত এবং যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তখনই সক্রিয় ছিল তাদেরও মুনাফার পরিমাণ কমে যেত। কিন্তু এই পুঁজি খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনের কাজে অন্য দেশে লগ্নী করা গেলে তা দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যেত। এতে উদ্বৃত্ত পুঁজির একটা সুরাহা হত, আবার অনুন্নত দেশগুলিতে মজুরি বাবদ নামমাত্র খরচা হত বলে মুনাফার পরিমাণ হত প্রচুর। আবার একই সঙ্গে নিজের দেশে শিল্পগুলির শিরা-উপশিরাকে চালু রাখতে গেলে যে রক্তের সরবরাহ বজায় রাখার দরকার, সেই কাঁচামালেরও সুবন্দোবস্ত করা যেত। কোন্ কোন্ দেশে উদ্বৃত্ত পুঁজি খাটানো যায় সেই অনুসন্ধানে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আরো সচেষ্ট হল। এই পর্বে চিন্তার এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগানো হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার এক প্রবল জোয়ার আসে। পশ্চিম ইওরোপের প্রায় সব দেশে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তারা ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করে। এই দেশগুলির উঁচু তলার মানুষেরা, যারা ছিল শাসক শ্রেণী, উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এই চিন্তায় যে মজুর এবং কৃষকেরা এই অধিকার খাটাবে নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থসাধনের কাজে ও তার ফলে উপর তলার লোকেরা

সমাজে এতদিন যে আধিপত্য ভোগ করে আসছিল তা শেষ হয়ে আসবে। এই সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নিহিত ছিল। সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে জনগণের চেতনাকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যেত বাহ্য ঐশ্বর্যের দিকে। এ দিয়ে তাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবোধ উগ্র স্বদেশপ্রেম এবং আত্মশ্লাঘা এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত যাতে সমাজকে আবার ধনতন্ত্রের আওতায় সংহত করে ফেলা যায়। যেসব মজুরদের বস্তির ঘরে বাস্তব জীবনে সূর্যের আলো প্রায় ঢুকতই না, তাদের মধ্যে গর্ব ও আত্মতুষ্টি সঞ্চারের জন্য ব্রিটিশ জাতি শ্লোগান তুলল, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না'। 'আকাশের নীচে একটি ঠাঁই'-এর দাবির পিছনে জার্মানরা সামিল হল। ফরাসীরা বিশ্বাস করত যে তাদের 'কাজ সভ্যতা প্রসার করা'। জাপানও তাড়াতাড়ি দাবি করতে লাগল যে তারা এশিয়ার ত্রাণকর্তা এবং রাশিয়ার দাবি হল, তারা শ্লাভ-দের মুক্তিদাতা। উত্তর আমেরিকা প্রচার করতে লাগল যে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তাদের 'সুস্পষ্ট নিয়তি'; সেইজন্য সেখানে সে 'তত্ত্বাবধায়কে'র অধিকার দাবি করল।

অচিরে এ বিশ্বাসও উত্তর-আমেরিকাবাসীদের মনে জাগল যে বিংশ শতাব্দী হচ্ছে 'আমেরিকারই শতাব্দী'। ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ, সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় মহত্ত্ব ইত্যাদি ভাবধারায় আচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ তাদের ভোটের অধিকার খাটিয়ে সরকারী ক্ষমতা তুলে দিল তাদেরই হাতে, ভোটের অধিকার অর্জনের আগেও যারা তাদের শাসন করত। এইসব নতুন ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তনের ফল হল একটাই। নিজের নিজের উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের জন্য অনুসন্ধান যেখানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বাজার ও কাঁচামালের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করতে পারে এবং পুঁজি লগ্নী করার একচেটিয়া অধিকার পায় সে দিকে। নতুনভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করা যায় এমন জায়গার সংখ্যা যখন কমে এল, তখন উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠল তীব্র এবং তিক্ত। এতদিন ধরে সমস্ত পৃথিবীটাকে উপনিবেশে ভাগ-বাটরা করে নেবার জন্য যে বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল এবার তা পরিণত হল পুরনো উপনিবেশগুলিকেই নতুন নতুন খণ্ডে ভাগ করে নেবার ঝগড়ায়।

এই সারা পর্বটা ব্রিটেনকে বেশ চাপের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে নবাগত যারা, বাণিজ্য ও পুঁজিবিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের আধিপত্যকে তারা আক্রমণ করতে লাগল। ব্রিটেন এই সময় জোর চেষ্টা করতে লাগল যাতে সে তার পুরনো সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্যের বন্ধন দৃঢ় করতে পারে এবং আধিপত্যের ক্ষেত্র আরো বাড়াতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় পর্বে ভারতবর্ষের ওপর সাম্রাজ্যবাদের মুঠি নতুন করে শক্ত হয়ে উঠল। ভারতে ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি লিটন, ডাফ্‌রিন, ল্যান্সডাউন এবং সর্বোপরি কার্জনের যুগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে এটা খুব স্পষ্ট। সারা পৃথিবীতে

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে মনে করত সেই আশ্রয় যেখানে ব্রিটিশ পুঁজির সুরাহা হবার সম্ভাবনা।

১৮৫০-এর পরে ব্রিটিশ পুঁজির একটা বেশ বড়ো অংশ লগ্নী করা হয়েছিল রেলে এবং ভারত সরকারকে ঋণ দেওয়ার কাজে। এর চেয়ে কিছু কম লগ্নী হয়েছিল চা বাগানে, কয়লা খনিতে, পাটকলে, জাহাজের ব্যবসায়ে, বাণিজ্যিক লেনদেনে এবং ব্যাঙ্কে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট থেকে এই পুঁজিকে নিরাপদ রাখার জন্য ভারতের ওপর ব্রিটিশ শাসনের শক্ত মুঠিকে আরো শক্ত করে তোলার প্রয়োজন হল। এই প্রয়োজনীয়তার কথা তৎকালীন রাজকর্মচারীরা ও রাজনীতিজ্ঞরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। রিচার্ড টেম্পল, যিনি ছিলেন একজন অসামরিক রাজকর্মচারী এবং বোম্বাই-এর রাজ্যপাল, ১৮৮০ সালে লিখেছিলেন ঃ 'ভারতকে ইংলণ্ডের অধীনে রাখতেই হবে...কারণ প্রভূত পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি এদেশে খাটানো হয়েছে এই আশ্বাসে যে ব্রিটিশ শাসন হবে—মনুষ্যসমাজের বিচারে—চিরন্তন।' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মধ্যে ভারতকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার ও সুদৃঢ় করার কাজে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল প্রধান অস্ত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর সক্রিয় ভূমিকা ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। এর ফলে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ একটি স্থায়ী সেনাবাহিনীকে পালন করতে হত। ১৯০৪-এ এই সেনাবাহিনীর জন্য খরচের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৫২ শতাংশ।

স্বায়ত্তশাসনের কাজে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার জন্য যেসব আলোচনা শুরু হয় তাও চাপা পড়ে। ১৯১৮ সালে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিণতি হিসাবেই আবার এই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হয়। স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে এসময় এ কথা প্রচার করা হল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য 'সহৃদয় স্বৈরতন্ত্র' বা 'স্থায়ী তত্ত্বাবধায়কত্ব'; এ কথা বলা হতে লাগল যে ভৌগোলিক, জাতিগত, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেক কারণে ভারতীয়েরা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত। সুতরাং আগামী অনেক শতাব্দী ধরে ব্রিটিশকেই তাদের জন্য 'সভ্য' ও 'সহৃদয়' শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগের পর্বেই ভারতবর্ষের যে রূপান্তর শুরু হয় এই তৃতীয় পর্বেও তার ধারা অব্যাহত থাকে। ভারত এবং ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশে ব্রিটিশ শাসনের জাল বিস্তার করে তোলা আরো জরুরি হয়ে ওঠে। এ সময় ব্রিটেনের লাভের স্বার্থে প্রত্যেকটি বন্দর, প্রত্যেকটি শহর, প্রতিটি গ্রামকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত করে ফেলার প্রয়োজনও অনুভূত হয়। কিন্তু আগের মতোই, এই রূপান্তরও ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং আংশিক। এর কারণও ভারতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রথমত, আগের পর্বে যেমন ব্রিটিশের রাজ্যবিস্তারের ব্যয় ভারতের রাজস্ব থেকে মেটানো হত, ঠিক তেমনই এই পর্বেও শাসনব্যবস্থায়, অর্থনীতি এবং

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন আনা হল তারও ব্যয়নির্বাহ হল এই রাজস্ব থেকেই। কিন্তু ভারতবর্ষ গরিব দেশ; ঔপনিবেশিকতার চাপে পড়ে তার প্রবল দুরবস্থা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতিশীল দেশের পক্ষে বাড়তি রাজস্বের ভার বহন করা শক্ত হত না, কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর ফল হল করের মাত্রা বৃদ্ধি। করের মাত্রা বাড়িয়ে যাবার একটা রাজনৈতিক অসুবিধা অবশ্য ছিল, কারণ পরিবর্তনহীন অর্থনীতিতে করের বোঝা বাড়িয়ে যাবার অর্থই হচ্ছে গণবিদ্রোহকে ডেকে আনা। একই সঙ্গে ব্যয়বহুল শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য খরচের বোঝা মাথায় নিয়ে শিক্ষা, সেচ-ব্যবস্থা, পরিবহন-ব্যবস্থা ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উন্নতিসাধনের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের ছিল না। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের এটা ছিল অন্যতম মুখ্য অসংগতি। ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার প্রয়োজনে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ উন্নতির কিছুটা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শোষণের রীতিই ছিল এমন যে তা এই দেশকে অনুন্নত রেখে শোষণের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তোলা অসম্ভব করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে আধুনিকীকরণের পরিণতি কী হতে পারে তা কিছুটা লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাতে বাধা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বল্পকালীন কিছু কিছু পরিবর্তনের ফলেই এমন সব সামাজিক শক্তি বলীয়ান হয়ে উঠেছিল যা সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণপদ্ধতির বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা সম্মুখীন হয়েছিল আর-একটি উভয় সংকটের ঃ ভারতবর্ষকে লাভজনক উপনিবেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তার রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই রূপান্তরের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এমন সামাজিক শক্তির বীজ যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

ভারতে ঔপনিবেশিকতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ শাসনের ফলে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই ভারতবর্ষ একটি আদর্শ উপনিবেশে পরিণত হয়। এদেশ ছিল ব্রিটিশ পণ্য বিক্রির প্রধান কেন্দ্র, কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য আহরণের পক্ষে প্রশস্ত উৎস এবং ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে এদেশের কৃষির ওপর ছিল গুরুতর করের বোঝা। পরিবহন-ব্যবস্থা, আধুনিক খনি এবং কলকারখানা, বৈদেশিক বাণিজ্য, উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাহাজে পণ্য আমদানি-রপ্তানি, ব্যাঙ্ক, বীমা—এসবের প্রায় সবটুকুই ছিল বিদেশীদের হাতে। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ইংরেজের কর্মসংস্থান করত ভারতবর্ষ; তার রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ব্যয় হত তাদের বেতন জোগাতে। বহু দূর বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার কাজে প্রধান অস্ত্র ছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী; পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা ও বর্ধন করায় তাদের ভূমিকা ছিল প্রধান।

সবচেয়ে উল্লেখ্য, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সর্বতোভাবে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির অধীনে ছিল। বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিকে এক সূত্রে বেঁধে নেওয়া হয়েছিল, অথচ তার স্থান ছিল নীচে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ১৯৬০-এর পরের বছরগুলিতে ব্রিটেন পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ হয়ে ওঠে, কিন্তু ঠিক একই সময় ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হয় একটি অনুন্নত উপনিবেশে—পৃথিবীর অনুন্নত উপনিবেশগুলির মধ্যে তার স্থান হয়ে দাঁড়ায় 'সর্বাগ্রগণ্য'। বাণিজ্য, মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটেনের যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার পুরো সংগঠনটাই ভারতবর্ষের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও তাকে সাম্রাজ্যবাদের অধীন করে রেখেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের ফল

ব্রিটিশ শাসন ও ভারতবর্ষের ওপর তার প্রভাব এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার থেকে জন্ম নিয়েছিল একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। সেই অবস্থা থেকেই ভারতের জনসাধারণ একটি জাতিতে সংগঠিত হয়ে উঠল। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে যে স্বার্থকেন্দ্রিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার চাপ সব চেয়ে বেশি পড়েছিল এদেশের কৃষি, কৃষিনির্ভর শ্রেণী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর। সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে।

ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর উদ্দেশ্য অবশ্য এই ছিল না যে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি হবে, কৃষি-উৎপাদন বাড়বে বা কৃষিজীবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের জন্য ভূমিরাজস্ব হিসেবে সমস্ত কৃষি-উদ্বৃত্ত আদায় করা এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায় ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে তার নির্ধারিত ভূমিকা নিতে বাধ্য করা। কৃষির ক্ষেত্রে যে সব পুরনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সংগঠন ছিল সেগুলি সব ভেঙে ফেলা হল; উদ্ভাবিত হল নতুন ব্যবস্থা। কিন্তু যে পরিবর্তন এল, তা আধুনিক লক্ষণাক্রান্তও নয়, সঠিক পথের নির্দেশকও নয়।

ভূমিরাজস্ব ও ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। একটি হল জমিদারি প্রথা (পরবর্তীকালে এই জমিদারি প্রথাই একটু পরিবর্তিত আকারে মহলওয়ারি প্রথা হিসেবে উত্তর ভারতে প্রবর্তিত হয়)। অন্যটি রায়তওয়ারি প্রথা। জমিদারি প্রথার ফলে আগে যারা কর ও ভূমিরাজস্ব আদায়কারী ছিল তারা হয়ে উঠল ভূস্বামী, যদিও জমিতে ছিল তাদের আংশিক মালিকানা, পুরোপুরি নয়। একদিকে যেমন রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমিরাজস্বের অধিকাংশই তাদের তুলে দিতে হত সরকারের হাতে, অন্যদিকে তেমনি পল্লীসমাজের ওপর তাদের প্রভুত্ব ছিল সামগ্রিক। এর ফলে জমি যারা চাষ করত সেই পৃথক সম্প্রদায় হল ভাড়াটিয়া প্রজা।

অবশ্য রায়ত প্রথায় যে জমি চাষী চাষ করত তাকে সেই জমির মালিক বলে আইনে স্বীকার করা হত এবং সরকার তার কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু দুটি কারণে জমির ওপর তার মালিকানা ছিল সীমিত। প্রথম কারণ, ভূমি-রাজস্বের ব্যাপারে পাকাপাকিভাবে কিছু নির্দিষ্ট ছিল না; দ্বিতীয়ত, তাদের কাছ থেকে চড়া হারে ভূমিরাজস্ব দাবি করা হত যা দেবার ক্ষমতা অধিকাংশ সময়েই তাদের থাকত না।

জমিদারি, মহলওয়ারি বা রায়তওয়ারি প্রথা যাই হোক-না কেন, চাষীর দুর্দশাই ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা বাধ্য ছিল চড়া হারে রাজস্ব জোগাতে; তাদের প্রকৃত অবস্থা ছিল 'ইচ্ছাধীন প্রজার'। অনেক বেআইনী খাজনা এবং কর দিতে তাদের বাধ্য করা হত, বাধ্য করা হত বেগার খাটতে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয়, রাজস্ব-ব্যবস্থার নাম বা প্রকৃতি যাই হোক-না কেন, জমির প্রকৃত মালিকানা ছিল সরকারেরই হাতে। অনেক পরে, বিশেষ করে ১৯০১-এর পর থেকে ভূমি-রাজস্বের হার আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে কৃষি-অর্থনীতির দুর্দশা এমন চরমে পৌঁছে গেছে এবং জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা পল্লীসমাজের মধ্যে এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে এর ফলে চাষীদের কোনো লাভই হয় নি।

ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতির সবচেয়ে অশুভ ফল, মহাজনশ্রেণীর আবির্ভাব; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জগতে এরা দিন দিন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। চড়া খাজনার হার এবং খাজনা আদায়ে কড়াকড়ির ফলে খাজনা শোধের তাগিদে চাষীদের প্রায়ই ধার করতে হত। এর জন্য তাকে অত্যন্ত চড়া সুদ তো দিতে হতই, উপরন্তু প্রত্যেকবার তাকে ফসল বেচতে হত সস্তা দামে। এই দারিদ্র্যের তাড়নায়—বিশেষ করে খরা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে—তাকে হাত পাততে হত মহাজনের কাছে। অন্য দিকে মহাজনের এই সুবিধা ছিল যে সে নতুন বিচার-পদ্ধতিকে এবং শাসনযন্ত্রকে নিজের কাজে লাগাতে পারত। এ ছাড়া সময়মত খাজনাও আদায় হত না। কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য বন্দরে আনা যেত না বলে সরকার এ ব্যাপারে তাকেই সাহায্য করত। খাদ্যশস্য ছাড়াও যেসব অর্থকরী শস্যের উপযোগিতা আরো বেশি, চাষীদের দিয়ে রপ্তানীর জন্য তা আবাদ করতে গেলে সরকারকে প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করতে হত মহাজনের ওপরেই, কারণ মহাজনই অগ্রিম টাকা চাষীকে দিয়ে এধরনের চাষ করাতে পারত। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে মহাজন আস্তে আস্তে গ্রামীণ সমাজে কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে বসেছিল। জমিদারি এবং রায়তওয়ারি প্রথা যেখানে চালু ছিল, এই দুই অঞ্চলেই সত্যি করে যারা জমি চাষ করত, তাদের হাত থেকে জমি বহুল পরিমাণে চলে গিয়েছিল মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী ও সমৃদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে। এর ফলে সারা দেশে ভূমির ওপর আধিপত্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভূমিসংক্রান্ত সকল সম্পর্কের কেন্দ্র।

জমির খাজনার অংশভোগী কতকগুলি মধ্যবর্তী শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল।

উপস্বত্বভোগের প্রথা থেকে এই শ্রেণীর উদ্ভব। পুরনো দিনের জমিদারদের মাটির সঙ্গে যেটুকু সম্পর্কও ছিল, নতুন ভূস্বামী এবং জমিদার শ্রেণীর তাও ছিল না। খাজনা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করার কষ্টটুকুও তাঁরা নিজেরা নিতেন না; সে অধিকার তাঁরা উপস্বত্ব হিসেবে ছেড়ে দিয়েছিলেন মধ্যবর্তী শ্রেণীকে। খাজনা আদায়ের ভার তারাই নিয়েছিল। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সব নতুন সম্পর্কের কাঠামো গড়ে ওঠে তা আদৌ প্রগতির সহায়ক নয়, প্রবলভাবে অবনতির লক্ষণাক্রান্ত। এতে কৃষি-ব্যবস্থার কোনো উন্নতি সম্ভব ছিল না। সমাজের মধ্যে নিচুর তলায় যেমন কতকগুলি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, ঠিক তেমনি উচুর তলাতেও। ভূস্বামী, মধ্যবর্তী শ্রেণী, মহাজন—এরা একেবারে নিচুর তলার, আর 'ইচ্ছাধীন প্রজা', ভাগচাষী, ভূমিদাস—এরা ছিল সমাজের একেবারে নিচু স্তরের। এই নতুন ব্যবস্থাকে ধনতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র বলা চলে না; পুরনো মুঘল ব্যবস্থার ধারাকেও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি নতুন সংগঠন যা ঔপনিবেশিকতার সৃষ্টি। বিচারপতি রানাডে, জওহরলাল নেহরু, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ অনেক লেখক এই ব্যবস্থাকে 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক' এবং 'আধা-ঔপনিবেশিক' বলে অভিহিত করেছেন।

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি, কৃষিপদ্ধতিকে উন্নত করার বা তাকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। চাষের পদ্ধতি আগে যা ছিল এখনও তাই রইল। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, ভালো বীজ, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক সার ইত্যাদিকে চাষের কাজে লাগানোর কোনো প্রচেষ্টাই হয় নি। দারিদ্র্যনিপীড়িত চাষীদের এমন সংস্থান ছিল না যা দিয়ে নিজেরাই চাষের উন্নতি করতে পারে; এ ব্যাপারে জমিদারদেরও কোনো উৎসাহ ছিল না। আর সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আচরণ ছিল একেবারে প্রকৃত মালিকের মতো : ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থাকে উন্নত করার বা তার আধুনিকীকরণের কোনো প্রচেষ্টাই সে সরকার করে নি, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল চড়া হারে রাজস্ব আদায়।

এর পরিণতি—কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুচিরস্থায়ী পরিবর্তনহীনতা। কৃষিপরিসংখ্যান যেটুকু পাওয়া যায়, তা থেকে শুধু বিংশশতাব্দী সম্পর্কিত তথ্যই মেলে। তবু এর থেকেই দুর্দশার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯০১ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে মাথাপিছু কৃষি-উৎপাদনের মোট হার কমে গিয়েছিল ১৪ শতাংশ। এবং মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার আরো কম—২৪ শতাংশ। উৎপাদন যেটুকু হ্রাস পেয়েছিল তার অনেকটাই হয়েছিল ১৯১৮-র পরে।

বাণিজ্য ও শিল্প

কৃষির মতো বাণিজ্য ও শিল্পও ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে এবং তা ব্রিটিশদের স্বার্থেই। ঔপনিবেশিক প্রভাবে অবশ্য ভারতে বাণিজ্যিক বিপ্লব এসেছিল। সে বিপ্লবের

ফলে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু তাকে অধীনে করে রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষ করে ১৮৫৮-এর পর থেকে ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। ১৮৩৪-র ১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য ১৮৫৮-তে গিয়ে দাঁড়ায় ৬০ কোটিতে; ১৮৯৯-তে ২১৩ কোটি টাকা। এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ৭৫৮ কোটি টাকা—১৯২৪ সালে। কিন্তু এই বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রকৃত কোনো উন্নতি দেখা দেয় নি, বা জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও কিছু বাড়ে নি। তার কারণ, ভারতীয় অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে পরিণত করার এবং তাকে বিশ্বধনতন্ত্রের অধীনে আনার প্রধান উপায় হিসেবে বহির্বাণিজ্যকে কাজে লাগানো হয়েছিল। ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি ছিল অস্বাভাবিক; সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই তাকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল। তার গঠন এবং চরিত্রেও কোনো ভারসাম্য ছিল না। ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যে একদিকে যেমন এদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ব্রিটেন এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন ও রপ্তানি করতে তাকে বাধ্য করা হত।

সবশেষে আর-একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের অভ্যন্তরে আয়ের সুষম বণ্টন গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। চাষী এবং কারিগরদের হাত থেকে সম্পদ যাতে ব্যবসায়ী, মহাজন এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়, ব্রিটিশ নীতি তারই সহায়ক ছিল। এই যুগের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য। এর থেকে এ কথা মনে করা সংগত হবে না যে এটা ভারতের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল। রপ্তানির এই আধিক্যের ফলে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর ভারতের ভবিষ্যৎ দাবির কোনো ভিত্তি রচিত হয় নি; ফলে অর্থসম্পদের দিক থেকে ভারত নিঃস্ব হয়ে গেছে। এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে এই বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল বিদেশীদের হাতে, এবং এর প্রায় সবটুকুতেই ব্যবহৃত হত বিদেশী জাহাজ।

ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড়ো কুফল, শহর ও গ্রামাঞ্চলের হস্তশিল্পের উত্তরোত্তর অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তি। এর ফলে এশিয়া ও ইওরোপে ভারত তার বাজার তো হারালই, উপরন্তু বিপুল সংখ্যায় মেসিনে তৈরি সস্তা পণ্যে তার নিজের বাজার ছেয়ে গেল। এর পরিণতিতেই দেশীয় হস্তশিল্পের অবলুপ্তি ঘটল। দেশীয় শিল্পের অবলুপ্তির ফলে এবং অন্য কোনো কর্মসংস্থানের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক কৃষি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ এইভাবে বেড়ে গেল।

আধুনিক শিল্পের বিকাশ

ব্রিটিশ শাসনের ফলে আধুনিক ধনতন্ত্রী শিল্পের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে পরিবহন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে পণ্যসামগ্রীর লেনদেনের

ভৌগোলিক পরিসীমা সর্বভারতীয় হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে বহুযুগ ধরে গ্রামীণ শিল্প ছিল কৃষির সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত। কিন্তু এই সময় হস্তশিল্প সমেত গ্রামীণ উৎপাদনব্যবস্থার ধারা হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষির মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ে। আবার নতুন রাজস্বব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ চাষী হারায় তাদের জমি। এভাবে সৃষ্ট হল সহজলভ্য এক মজুর শ্রেণী, যাদের দিনমজুর হিসেবে ভাড়া খাটা ছাড়া অন্নসংস্থানের আর কোনো উপায় ছিল না। আধুনিক পুঁজিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি অনুকূল অবস্থারই উদ্ভব হয় ঃ এক, সর্বভারতীয় বাজারের সৃষ্টি; দুই, সুলভ শ্রমের প্রাচুর্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সূচনা হল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত অবশ্য যন্ত্রশিল্পের বিকাশ প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন তুলা এবং পাট শিল্প, কয়লাখনি এবং চা বাগান। কতকগুলি গৌণ শিল্পেরও উদ্ভব হয়েছিল। এর কতকগুলি ছিল তুলাজাত পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, যেমন তুলার গাঁটরি বাঁধার যন্ত্র, এবং তুলা থেকে বীজ আলাদা করার যন্ত্র। এ ছাড়া ছিল ধান, ময়দা ও কাঠের কল। চামড়ার জিনিস তৈরি করার কারখানা, পশমের কাপড়ের কারখানা, কাগজ ও চিনির কল, এবং লবণ, অভ্র, সোরা, পেট্রোল এবং লোহার খনিও এই সময় চালু হয়—রেলের ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরির এবং লোহা ও পেতল ঢালাইয়ের কিছু কারখানাও।

ওপরের তথ্যগুলি থেকে যদি আমরা এ কথা মনে করি যে ভারতে শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি এভাবে স্থাপিত হচ্ছিল তা হলে তার চেয়ে বড়ো ভুল আর হবে না। প্রথমত, যে কটি আধুনিক শিল্প গড়ে উঠেছিল তাদের অধিকাংশই ছিল বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে। দ্বিতীয়ত, এই সময় থেকে শিল্পোন্নতির ধারা অব্যাহত থাকলেও তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। বিশাল এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এত সীমিত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে 'শিল্পোন্নয়ন' আখ্যা দেওয়া অসংগত মনে হয়। ১৯৩১ সালেও 'ফ্যাক্টরি' আইনের আওতায় ছিল দশ লক্ষেরও কম শ্রমিক।

এদেশের পুঁজিপতিরা শিল্পক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষামূলক পদক্ষেপের সুযোগ পেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বজোড়া বিখ্যাত 'মন্দা'র সময়। এ সময় বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছিল বলে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা ছিল না; এবং সরকার এদেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের প্রচুর পরিমাণে পণ্য সরবরাহের সুযোগ দিতে বাধ্য হতেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ভারতীয় পুঁজিপতিরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয় এবং বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয় তখন ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের মন্দার যুগ শুরু হয়।

এর থেকে বোঝা যায় যে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ছিল মন্থর

ও সীমিত। এর দ্বারা কোনো শিল্পবিপ্লব বা তার আভাষমাত্রও সূচিত হয় নি। আরো উল্লেখ্য, এই সীমিত অগ্রগতিও স্বাধীন ছিল না, ছিল বৈদেশিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শিল্পের পুরো সংগঠনটিই এমন ছিল যে পূর্ণতর বিকাশের জন্য তাকে ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত। ব্যয়সাপেক্ষ ভারী শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্প এদেশ প্রায় ছিলই না, অথচ এধরনের শিল্প ছাড়া দ্রুত এবং স্বয়ংনির্ভর শিল্পোন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। মেসিন টুল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ধাতব শিল্পও এদেশে তখনও চালুই হয় নি।

তা ছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রায় পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কোনো গবেষণাই এদেশে হত না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে বিপ্লব ভারতে হয়েছিল তা শুধু বাণিজ্যিক প্রসার, শিল্পবিপ্লব নয়। স্বাধীন শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে তা মোড় নেয় নি, নিয়েছিল পরনির্ভর, অনুন্নত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দিকে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের তথাকথিত শিল্পোন্নতির আর-একটা নেতিমূলক দিক, এই শিল্পগুলির সামঞ্জস্যহীন আঞ্চলিক অবস্থিতি। অত্যন্ত সীমিত কয়েকটি অঞ্চল ও শহরে এগুলি ছড়িয়ে ছিল। এমন-কি অত্যন্ত অসমভাবে সেচ ও বিদ্যুতের সুবিধাও বণ্টন করা হয়েছিল। এর ফলে আয়, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক স্তরবিভাগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উল্লেখযোগ্য ফল হল সাধারণ মানুষের চরম দারিদ্র্য। অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকত, তখনও তারা কায়ক্লেশে জীবনযাপন করত। আর খরা কিংবা বন্যার অভিশাপ যখন দেশের উপর নেমে আসত তখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হত। মাথা পিছু আয় ছিল অত্যন্ত কম, বেকার সমস্যা ছিল তীব্র। ১৮৮০ সালে দাদাভাই নওরোজী প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে একজন ভারতীয়ের গড় আয় যা, তার প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি খরচ হয় একজন জেলের কয়েদীর খাওয়াপরার সংস্থান করতে। এই দারিদ্র্যের ফলশ্রুতি দুর্বল স্বাস্থ্য, স্বল্প পরমায়ু এবং শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি। জনসাধারণের দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পরপর বহু দুর্ভিক্ষে—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশকে যা নিঃস্ব করে দিয়েছিল। ১৮৬০ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে অন্তত কুড়িবার দুর্ভিক্ষ হয়। একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে যে ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে দুর্ভিক্ষে প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ লোক মারা যায়। এতে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে দারিদ্র্য এবং স্থায়ী অন্নাভাব ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ভৌগোলিক নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবও নয়। দেশের লোকের চরিত্র ও কর্মক্ষমতায় কোনো 'সহজাত' গলদও দায়ী ছিল না। এই দারিদ্র্যকে প্রাক্-ব্রিটিশ মুঘলযুগের উত্তরাধিকার বলেও গণ্য করা যায় না। বিগত

দুশো বছরের ইতিহাসের 'ফসল' এই দারিদ্র্য। তার আগে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির চেয়ে ভারতবর্ষ কোনো অংশে অনগ্রসর ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানেরও তখন এত বৈষম্য ছিল না। কিন্তু ঠিক যে যুগে পাশ্চাত্যের দেশগুলির উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটছিল, তখনই ভারতবর্ষকে আধুনিক ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তার উন্নতির সম্ভাবনাকে খর্ব করে দেওয়া হয়। আজকের পৃথিবীতে যেসব দেশ সমৃদ্ধিশালী, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগেই তারা সমৃদ্ধ হয়েছে—অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এ উন্নতি ঘটেছে ১৮৫০-এর পরে। আগেই বলা হয়েছে যে ১৭৫০ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের খুব একটা তফাত ছিল না। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে লক্ষ করার আছে। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূচনা এবং ব্রিটিশের বাংলাদেশ জয় ঘটেছিল একই সময়ে।

আসল কথা ঃ যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ব্রিটেনে শিল্পোন্নতি ঘটিয়েছিল এবং তার সামাজিক ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তারাই অর্থনৈতিক অবনতি এনেছিল ও সেই অবনতির ধারাকে জিইয়ে রেখেছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অনুন্নত রাখার জন্য তারাই দায়ী। এর কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রিটেন ভারতের অর্থনীতিকে আপন অর্থনীতির দাস করে রেখেছিল, এ দেশের সমাজের মূল ধারাগুলিকেও সে প্রভাবিত করত আপন প্রয়োজন অনুসারে। আগেই বলা হয়েছে এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পে দেখা দিয়েছিল মন্দা; তার চাষী ও মজুর-শ্রেণী শোষিত হয়েছিল জমিদার, ভূস্বামী, দেশীয় রাজন্য, মহাজন, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, বিদেশী সরকার ও তার কর্মচারী ইত্যাদি নানা জনের হাতে। দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অন্নকষ্টের ব্যাপকতাও ছিল এরই ফল।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র

ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যেসব আধুনিক ভাবধারা পশ্চিম ইওরোপে প্রথম বিকাশ লাভ করত, তার ঢেউ ভারতেও এসে পৌঁছল। ব্রিটিশ যদি ভারতে কখনও নাও আসত, তা হলেও এদেশ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের পরিবর্তনের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত না। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজের দরজা বহির্জগতের কাছ থেকে কখনও রুদ্ধ রাখে নি বলে এ কথা বলা যায় যে পরিবর্তনের হাওয়া এদেশেও নিশ্চয়ই পৌঁছত। বহু শতাব্দী ধরে বাণিজ্য ও পর্যটনের মাধ্যমে সে শুধু এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেই নয়, ইওরোপের সঙ্গেও বহুবিধ যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এইসব মাধ্যম দিয়ে ইওরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে যা যা ঘটত তার খবর এদেশে এসে পৌঁছত; পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারার বিভিন্ন খুঁটিনাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে এসে পৌঁছতে শুরু করে। অবশ্য,

হয়তো পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা অনেক মন্থর ভাবে, অনেক সময় নিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছত। ব্রিটিশ শাসনের ফলে এই চিন্তাধারা শুধু যে দ্রুত এদেশে পৌঁছল তাই নয়, বৈদেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি দান করে আশু প্রয়োজনে লাগল।

গণতন্ত্র, জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ—ইত্যাদি ভাবধারার প্রভাবে এসে ভারতীয় জনসাধারণের চিন্তার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এইসব ভাবধারা ভারতবাসীকে নিজের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের দিকে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শেখাল, তাকে বুঝতে শেখাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কী।

রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিকা, জনসভা ইত্যাদি অনেক মাধ্যমের দ্বারা আধুনিক ভাবধারা এদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। ১৮১৩-র পরে সরকার-প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা ও অনেক ভারতীয়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই ভূমিকা অবশ্য খুবই জটিল এবং নানাভাবে স্ববিরোধী।

প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রায় একশো বছর ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থা পুরনো প্রথাশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে নি। শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি বিদেশী সরকারের ছিল অবহেলার দৃষ্টি; ১৮৫৮-র পরে উচ্চতর শিক্ষার প্রতিও তার মনোভাব হয়ে উঠল বিরূপ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ভারতবাসী যখন তাঁদের সদ্য-আহৃত জ্ঞানকে ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণপরায়ণ চরিত্রের বিশ্লেষণে ও সমালোচনায় কাজে লাগাতে শুরু করলেন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করতে শুরু করলেন, তখন ব্রিটিশ শাসকেরাও উচ্চশিক্ষার প্রসার সংকুচিত করার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি। উচ্চশিক্ষার ধারা একবার প্রবাহিত হতে শুরু করার পর জনসাধারণের চাপে তা অব্যাহত রাখতে হয়েছিল, যদিও শিক্ষা মানের ক্রমাগত অবনতি ঘটতে লাগল।

যদি মনে করা যায় এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এদেশে জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল, তা হলে এও স্বীকার করতে হবে যে তা হয়েছিল পরোক্ষভাবে। প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু মৌলিক রচনা পাঠ করার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সমাজ বিশ্লেষণে। তা না হলে এর কাঠামো, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যসূচী প্রভৃতি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের সবটুকুই রচিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সেবায় লাগার জন্য।

এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র থেকে উদ্ভূত ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার আর কয়েকটি দিক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক হল—আধুনিক শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের

জন্য যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা একেবারে অপরিহার্য, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়। আর-একটি বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় ভাষাগুলির বদলে ইংরাজির উপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বন্ধ হয়েছিল তা নয়, শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দুস্তর ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান গড়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় করতে সরকার রাজি ছিলেন না; তাই শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচু স্তরে নেমে এসেছিল। স্কুলে ও কলেজে ছাত্রদের মাইনে দিতে হত বলে একমাত্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এবং শহরবাসীদেরই শিক্ষালাভের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল।

নতুন ভাবধারা, নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং ব্রিটিশ শাসন—সব মিলে ভারতীয়দের সামাজিক জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব প্রথমে অনুভূত হয় শহরাঞ্চলে, পরে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক যন্ত্রশিল্প, নতুন পরিবহন-ব্যবস্থা, নগর-অঞ্চলের বিস্তার, কলকারখানা-অফিস-হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ—সবকিছু এক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও জাতিপ্রথার অনেকটা ক্ষয় হয়েছিল। ভূমিভিত্তিক এবং গ্রামীণ সম্পর্কের কাঠামো সম্পূর্ণ ওলট-পালট হয়ে যাবার ফলে গ্রামাঞ্চলে জাতিপ্রথার স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সকল সামাজিক অমঙ্গল অবশ্য এতে দূর হয় নি। তবু ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে সামাজিক মর্যাদা অর্থ-সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল এবং অর্থোপার্জন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে বাঞ্ছিত সামাজিক পেশা।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গোড়ার দিকের নীতি সমাজ-সংস্কারের উদ্যমে প্রেরণাই জুগিয়েছিল। যাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা যায় ও ব্রিটিশ শাসনের ভিত শক্ত করা যায় সেজন্য ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। ভারতের জাতিভেদ প্রথার অন্যায় ও অবিচার এবং সমাজে স্ত্রীজাতির অত্যন্ত নগণ্য মর্যাদা কিছু কিছু রাজকর্মচারীর মানবিক বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এরও একটি ভূমিকা আছে। খৃস্টান ধর্মপ্রচারকেরা এই পর্বের সমাজ-সংস্কারে কিছু অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই সাম্রাজ্যবাদের মূলত রক্ষণশীল চরিত্র ও তার দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ প্রকট হয়ে উঠল। ফলে সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন ঘটল। সংস্কারকদের সমর্থন করা ব্রিটিশ শাসকেরা বন্ধ করে দিলেন এবং আস্তে আস্তে হাত মেলালেন তাদের সঙ্গে যারা সমাজের রক্ষণশীল ও গোঁড়া শক্তিগুলির প্রতিনিধি।

ব্রিটিশের সামাজিক নীতি বেশি দিন নিষ্ক্রিয় থাকে নি। জাতীয়তাবাদ ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল, এবং তার মোকাবিলা করার জন্য শাসকেরা বেশি মাত্রায় 'বিভাজন ও শাসনে'র (divide and rule) নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও

জাতিভেদপন্থী মনোভাবকে তাঁরা সক্রিয়ভাবে উস্কানি দিতে লাগলেন। এতে সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির হাত দৃঢ় হল।

জনসাধারণের মধ্যে চিন্তাগত ও রাজনৈতিক যেসব চেতনা দেখা দিয়েছিল তার ফলে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু সমাজ-পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা তখনই এসেছিল যখন তথাকথিত 'নিচু' জাতের মানুষ এবং মহিলারা নিজেদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজকে নতুন করে গড়বার সংগ্রাম শুরু করলেন। জোতিবা ফুলে প্রমুখ নেতাদের পরিচালনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে 'নিচু' জাতের মানুষেরা অনেক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২০ ও ১৯৩০-এ কেরেলার ও দক্ষিণ-ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সমাজের উঁচু জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। মহিলারা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে দেশের সকল শ্রেণীর লোককে একত্রিত করা; সেজন্য জাতি, লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক সকল বিভেদ ও বৈষম্য মুছে ফেলা ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। তা ছাড়া, গণবিক্ষোভ, গণআন্দোলন, জনসভা, শ্রমিকসংঘ, কিষাণসভা প্রভৃতিতে জনসাধারণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলে এই ধারণা অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল যে জাতিপ্রথাই সামাজিক শ্রেষ্ঠতার নির্ধারক।

ভারত-সংস্কৃতির আধুনিকতা প্রাপ্তির আর-একটি দিক উল্লেখ্য ঃ ভারতীয় সমাজে যাঁরা রক্ষণশীলতা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিনিধি ছিলেন, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের আসন টলে গিয়েছিল বলে তাঁরা আধুনিক সংস্কৃতির নতুন জোয়ারকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার কিছু দল ছিল যাঁদের মনোভাব ছিল ঠিক এর বিপরীত। পাশ্চাত্য জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা-কিছু সার্থক মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দিক, শুধু সেইটুকু নিজেদের জীবনধারার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা না করে তাঁরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করতে শুরু করলেন। তাঁরা ইউরোপীয় আদবকায়দা, রীতিনীতি ইত্যাদি হুবহু নকল করতে লাগলেন; এটুকু বুঝলেন না যে আধুনিকতা দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাপদ্ধতি ও মূল্যবোধের ব্যাপার, শুধু কথা বলার ঢঙ, পোষাক-আশাক কিংবা আহার-পানের নতুন অভ্যাস দিয়েই আধুনিক হওয়া যায় না। তাঁদের এ বোধ ছিল না যে আধুনিক ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের সমন্বয় ঘটানো। তবে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তিরও উৎস হচ্ছে ঔপনিবেশিক নীতি। ভারতীয়েরা যাতে ব্রিটিশরাজের বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ পণ্যের উৎসুক ক্রেতাতে পরিণত হয়, সেজন্য ভারত উপনিবেশের ওপর কেন্দ্র অর্থাৎ ব্রিটেনের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেবার সবরকম চেষ্টাই করা হত।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনাকে ব্রিটিশ লেখক ও রাজনীতিবিদেরা ব্রিটিশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ব্যাপারে কাজে লাগাতেন। তাঁরা প্রচার করতেন যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহজাত অপূর্ণতার ফলে বিদেশী প্রভুদের দ্বারা চিরকাল শাসিত হওয়াই ভারতবাসীর নিয়তি। এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক ভারতীয় মনে করতেন যে এদেশের সুদূর অতীতের গৌরবময় চিত্র তুলে ধরে প্রমাণ করা দরকার যে তাঁরা স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য। অন্যেরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকারকদের ব্যঙ্গ করতেন এবং এদেশে আধুনিক ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রবর্তনেরই সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অটুট রাখার জন্য নিজের দিকেই তাকানো প্রয়োজন। যদিও এই ধরনের চিন্তা খুব একটা আধিপত্য পায় নি তবু জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, এর কিছুটা প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে একটি শাসনব্যবস্থাই সমস্ত দেশ জুড়ে স্থাপিত হয়। একটি সরকারের অধীনে, একই আইনকানুনের আওতায় এদেশকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছিল। রেলপথ, আধুনিক ডাক ও তার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের উন্নতি, মোটর-পরিবহন ইত্যাদি যোগাযোগের আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে একই ভাবে এই ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। গ্রামীণ বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বয়ংনির্ভরতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এদেশের অর্থনীতির একটি সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া সম্ভব হল। আধুনিক শিল্পের উপযোগী কাঁচামালের উৎস এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিল এবং এইভাবে আধুনিক শিল্পের পরিধিও ছিল সারা ভারত জুড়ে। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরাও আসত বহু অঞ্চল থেকে। ক্রমে ক্রমেই এদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক ভাগ্য আরো বেশি করে একসূত্রে বাঁধা পড়ছিল। ভারতীয় অর্থনীতিও আস্তে আস্তে সমগ্রতা লাভ করছিল। সারা দেশের মধ্যে একই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া এবং জনসাধারণ আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করার ফলে ধীরে ধীরে এক সর্বভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। তাঁদের সমাজ-বিশ্লেষণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একই ধরনের। তেমনই, এই যুগে পুঁজিপতি ও শ্রমিক—এই যে দুই শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছিল সেই শ্রেণীদুটিরও চরিত্র ছিল সর্বভারতীয় এবং জাতি, অঞ্চল, ধর্ম প্রভৃতি প্রথাগত বিভেদের ঊর্ধ্বে।

এসব কারণ ছাড়াও যে অন্য সূত্রটি সমস্ত ভারতবাসীকে একটি ঐক্যবন্ধনে বেঁধেছিল তা হল সাম্রাজ্যবাদরূপী একটি সাধারণ শত্রু : যে শত্রুর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল দেশ, জাতি, ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা-নির্বিশেষে সকলেই। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও তার থেকে উদ্ভূত ঐক্যবোধ সকল মানুষকে বেঁধেছিল একই আবেগ ও মনস্তত্ত্বের সূত্রে। এইভাবে অভ্যুদয় ঘটেছিল একটি সাধারণধর্মী জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

ভারতের সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণী

এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের বয়স যত বাড়ছিল তার ফলাফলও তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষও স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। দেশের অনেকেই বুঝতে পারেন যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ এদেশে রাজত্ব করছে এবং সে রাজত্ব বজায় রাখার জন্য সে সাধারণভাবে ব্রিটিশ জাতির ও বিশেষ করে ব্রিটিশ পুঁজিপতির স্বার্থে ভারতের মঙ্গল বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাঁরা এও উপলব্ধি করলেন যে সাম্রাজ্যবাদই ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝতে শিখলেন যে ব্রিটিশ শাসনই এদেশের সমস্ত মুখ্য ব্যাপারে উন্নতির অন্তরায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বলি ছিল বোধহয় ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়। ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য করের আকারে এদের উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ সরকার আত্মসাৎ করতেন। জমির মালিক ও মহাজনের শক্ত মুঠিতেও এরা আটকা পড়েছিল। কৃষক জমির মালিক ছিল না, নিজের উৎপাদিত শস্যেরও নয়। এমন-কি, নিজের শ্রমের ওপরও তার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আর কৃষকেরা যখন জমিদার, ভূস্বামী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলত, তখন আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে সরকার সমস্ত পুলিশ বাহিনী ও বিচারযন্ত্রকে তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতেন এবং অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদের সংগ্রামকে দমন করতেন। যথাসময়ে কৃষক সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা বুঝতে পেরেছিল এবং অনুভব করেছিল যে তাদের দুরবস্থার জন্য সাম্রাজ্যবাদই প্রধানত দায়ী।

কারিগর সম্প্রদায়কেও সাম্রাজ্যবাদের হাতে অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। বহুশতাব্দী ধরে যে পেশার বলে তারা জীবিকাঅর্জন করে আসছিল তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নতুন কোনো কর্মের দিগন্ত তাদের কাছে খুলে দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ করা হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছয়। বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়।

আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণী জন্ম নেয়। সে শ্রেণী শ্রমিক-শ্রেণী। সংখ্যায় অল্প এবং জনসমষ্টির ক্ষুদ্র অংশমাত্র হলেও তারা ছিল এক নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি। তাদের মাথার ওপর বহু শতাব্দীর পুরনো ঐতিহ্য রীতিনীতি বা জীবনপদ্ধতির কোনো বোঝা ছিল না। শুরু থেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থবোধের চরিত্র ছিল সর্বভারতীয়। তা ছাড়া কলকারখানায় ও শহরাঞ্চলেই শ্রমিক-শ্রেণী ছিল ঘনসন্নিবদ্ধ। এইসব কারণে শুধুমাত্র তাদের সংখ্যা থেকে যতটুকু বোঝা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের গুরুত্ব।

যে পরিবেশে ভারতীয় শ্রমিকদের কাজ ও জীবনধারণ করতে হত তা ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক। ১৯১১ সাল পর্যন্ত তাদের কাজের সময়ের মাত্রা সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। রোগ, বার্ধক্য, কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা, আকস্মিক মৃত্যু—এসব গুরুতর বিষয়েও কোনো সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কোনো প্রকল্প চালু হয় নি। ১৯০০-র দশকে শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তানলাভের সময়ে কিছু সুবিধাদানের প্রকল্প—চালু হয়েছিল, তবে এ প্রকল্পও আদৌ সন্তোষজনক ছিল না।

১৮৮৯ থেকে ১৯২৯—এই বছরগুলিতে কারখানা শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমতে থাকে। ১৯৩০-এর দশকে, শ্রমিক আন্দোলন যখন একরোখা হয়ে ওঠে, তখনই কেবল ১৮৮০-১৮৯০ সালের মজুরির হার পুনরুজ্জীবিত করা হয়—যদিও ইতিমধ্যে শ্রমের উৎপাদনশক্তি বেড়ে গিয়েছিল ৫০ শতাংশ। এর ফলে সাধারণ শ্রমিকের জীবনধারণের মান সবসময়েই ছিল সবচেয়ে নিচু স্তরেরও নীচে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার সারাংশ প্রখ্যাত জার্মান অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখক অধ্যাপক জুর্গেন কুজিয়াস্কি ১৯৩৮-এর একটি লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন :

"ভারতীয় শ্রমিকের যথেষ্ট আহার জোটে না; তাকে বাস করতে হয় পশুর মতো, এমন জায়গায় যেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই। ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সবচেয়ে শোষিত মানুষের মধ্যে সে একজন।"

চা এবং কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। স্বল্প-বসতি এলাকায়, অস্বাস্থ্যকর জলহাওয়ার মধ্যে এই বাগানগুলির অবস্থিতি। কিন্তু এদের মালিকেরা যথেষ্ট পরিমাণ মজুরি দিয়ে বাইরে থেকে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করে নিয়ে আসতেন। তার বদলে নানারকম ভুয়া প্রতিশ্রুতি, জাল জুয়াচুরি ইত্যাদির দ্বারা শ্রমিকদের আমদানি করা হত। তারপর জোর-জুলুম, শারীরিক অত্যাচার করে তাদের প্রায় ক্রীতদাসের অবস্থায় এইসব বাগিচায় রাখা হত। সরকার মালিকপক্ষকে পুরোপুরি সাহায্য করতেন; তাদের সুবিধার জন্য নানারকম দণ্ডমূলক আইনও তৈরি করেছিলেন।

কালক্রমে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণী অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পন্থা গ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় সমাজের আর-একটি প্রধান শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিল ঃ তারা হল মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই শ্রেণীর কাছে অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত হয়েছিল। ব্রিটিশ তখন প্রচুর সংখ্যায় নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করত; নতুন স্কুল, আদালত ইত্যাদি খোলার ফলে অনেক নতুন চাকুরি, নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের আকস্মিক বৃদ্ধিতে সর্বস্তরেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু অনুন্নত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যা সাধারণ রীতি তার পরিচয়

অচিরেই পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসী (সারা ভারতবর্ষে যাদের সংখ্যা আজকের দিনের দিল্লির মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের শিক্ষিত নাগরিকের চেয়েও কম ছিল) ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার মুখোমুখি হলেন। তা ছাড়া যাঁদের চাকুরি জুটেছিল তাঁরা দেখতে পেলেন যে ভালো মাহিনার সমস্ত চাকুরিই মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজের জন্য সংরক্ষিত। বিশেষ করে, বি.এ. ডিগ্রী লাভের আগেই যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হতেন, তাঁদের চাকুরি পাবার সম্ভাবনা আস্তে আস্তে একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে যে-দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতিশীল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আধুনিক, একমাত্র সে দেশই অনুকূল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দিয়ে তাঁদের সার্থক জীবনচর্যায় সহায়তা করতে পারে; দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদাহানির হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারে।

ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮-র পরে। এর অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতায় নামতে হল। তারা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে সরকার-পরিচালিত বাণিজ্য ও শুল্ক, পরিবহন ও আর্থিক বিষয়ে সরকারী নীতি তাঁদের বৃদ্ধির অন্তরায়। স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে প্রায় প্রতিটি মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। বয়ঃকনিষ্ঠতার ফলে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের এমন শিল্পগুলির সঙ্গে যারা তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত; এ ছিল তার প্রাথমিক দৌর্বল্যের কারণ। এর ক্ষতিপূরণের জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের প্রয়োজন ছিল সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যের। ফ্রান্স, জার্মানি বা জাপানের তৎকালীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রভূত পরিমাণে সরকারের সক্রিয় সাহায্য লাভের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ ধরনের কোনো সাহায্যই ভারতীয় পুঁজিপতিদের দেওয়া হল না। ভারতীয় শিল্পের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল রক্ষাত্মক শুল্কনীতির—যাতে সস্তা দামের বিদেশী পণ্য দেশজ পণ্যের চেয়ে বেশি বিক্রি না হয়। এ সুবিধেও ভারতীয় শিল্পকে দেওয়া হল না; বরং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় এখানে অবাধ বাণিজ্য চালু করা হয়।

ভারতীয় আমলারা যদি পুঁজিপতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন তা হলে নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করতে পারতেন। পশ্চিম ইউরোপে আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে, প্রায় পুঁজিপতিশ্রেণীর মতোই, ধনতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত ছিল। দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র ছিল অসংখ্য। ভারতের আমলাতন্ত্র জাতিতে বিদেশী; তাঁদের পানাহারের সম্পর্ক ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সহানুভূতি ছিল স্বদেশবাসী ও স্বদেশবাসীর শিল্পস্বার্থের প্রতি—সে স্বার্থের ক্ষেত্র ব্রিটেনই হোক বা ভারতবর্ষ হোক। ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল সহানুভূতিহীন, এমন-কি, বিদ্বেষভাবাপন্ন।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের সবচেয়ে আশঙ্কা ছিল, তাঁদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বৈদেশিক পুঁজি তাঁদের ওপর আধিপত্য করবে এবং তাঁদের দমন করে রাখবে। তাঁদের টিকে থাকার সহজাত বৃত্তি বিশেষ করে জাগ্রত হয়ে উঠল ১৯১৮-র পরে, প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক পুঁজি যখন ভারতীয় শিল্পে লগ্নি হতে শুরু করল। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকগুলিতে যে রক্ষাত্মক শুল্ক-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার সুযোগ নেবার জন্যে এবং তা ছাড়া ভারতের সুলভ শ্রমশক্তি, অদূরবর্তী বাজার ইত্যাদি সুবিধার সদ্ব্যবহারের জন্য ব্রিটেনের বৃহৎ বৃহৎ শিল্পসমিতিগুলি এ সময়ে ভারতে অনেকগুলি শাখা খুলতে শুরু করল। এর ফলেই ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই সময়ে জিগির তুললেন ঃ "ভারতের বাজার থাকবে ভারতীয়দেরই হাতে।"

এইভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ক্রমশ উপলব্ধি করলেন যে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক নীতি প্রকাশ্যভাবেই তাঁদের বিরোধী। তাঁরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছিলেন যে দেশীয় পুঁজিপতিদের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিশীল জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সরকার। যতদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ দেশ শাসন করবে ততদিন ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। শ্রেণী হিসেবে তখনো দুর্বল হলেও তাঁদের উন্নতি ঠিকই ঘটছিল, অর্থসম্পদও ছিল তাঁদের। শাসনব্যবস্থার আনুকূল্য লাভের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের শাসকদের উপর নির্ভর করতে হত। ১৯১৮-র থেকেই তাঁরা প্রধানত আর্থিক সাহায্য দিয়ে দ্রুত প্রসারমান জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেন। কিছু কিছু জাতীয় নেতারও তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার ফলে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়ে এদেশে যে এক নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে, এই সম্প্রদায়ই তা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথম প্রথম এঁরা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি খুব আগ্রহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা রামমোহন রায়ের মতো অগ্রণীগণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে অন্ধ স্বদেশপ্রেম দিয়ে কোনো কাজ হয় না, ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশ যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশীদের দ্বারা বিজিত হয়েছে তার কারণ এদেশেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের দৈন্যের মধ্যেই নিহিত; তাঁরা বুঝেছিলেন যে তৎকালীন ব্রিটেন উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি। ভারতের তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অত্যন্ত অকপট ও নির্মম বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে সে সমাজব্যবস্থা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি হতে পারে না। সমাজ ও দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলার কাজে এইভাবে তাঁরা ব্রতী হন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রশিল্প, অর্থনৈতিক প্রগতির ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। তাঁদের আশা ছিল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে যুগের সর্বাগ্রগণ্য দেশ ব্রিটেন, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক ভাবধারার দ্বারা তাঁরা আকৃষ্ট হন। জনগণের সার্বভৌমত্বের যে মতবাদ সমাজকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করে দেয় তাঁদের কাছে তার বিশেষ আবেদন ছিল। বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের ভূমিকা, জনসমিতি, প্রকাশ্যভাবে শাসকদের সমালোচনা করার অধিকার—এইসব রাজনৈতিক সম্ভাবনাও তাঁদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হল, ভারতের মানুষ একটি জাতিতে পরিণত হল—এ সবেরও তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁরা আশা করেছিলেন যে এই প্রগতির ধারা যাতে পূর্ণতা লাভ করে তার জন্য ব্রিটেন ভারতকে সহায়তা করবে। বিশ্বাসের চেয়ে আধুনিক যুক্তিবাদের আকর্ষণ ছিল তাঁদের কাছে অনেক বেশি। তাঁরা এ কথা বুঝতে পারেন যে সাহিত্য ও কলার আস্বাদন শুধু সংস্কৃতির শিরোমণিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা যেমন চাইছিলেন যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তার লাভ করুক, তেমনি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতিও তাঁদের কাম্য ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক স্বাধীনতা এবং সমাজ ও ব্যক্তি—সম্পর্কে মানবিকতাবাদী ধারণা তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্য যে তার ব্যক্তিসত্তার জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নয়, এ ধারণাও তাঁদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

এইভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এই অবস্থা ছিল যে যেহেতু তখনকার যুগে ব্রিটেনই সর্বাগ্রগণ্য দেশ সেইজন্য ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তর ব্রিটিশ রাজত্বের মাধ্যমেই ঘটবে। ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি তাঁদের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন; ব্রিটিশ শাসনকে, এমন-কি, 'দৈবপ্রেরিত' বলেও তাঁরা বর্ণনা করতেন। ১৮৫৮-র বিদ্রোহের সময়েও এই সমর্থন অবিচলিত ছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন পাদে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিকাশ যেরকম ভাবে ঘটছিল তাতে কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। ফলে ধীরে ধীরে তাঁদেরও মোহভঙ্গ শুরু হল। তাঁরা দেখতে পেলেন যে ভুল জায়গায় তাঁরা আস্থা স্থাপন করেছেন; ব্রিটিশ রাজত্বের প্রকৃত স্বরূপ কী তাঁরা ঠিক বুঝতেই পারেন নি।

তাঁরা দেখতে পেলেন যে কার্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ তার অধিগত প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের ভাগ ভারতবাসীকে দেয় নি। ১৮৬৬ থেকে ১৯০১—এই বছরগুলিতে ভারতবর্ষ যখন একের পর এক সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল তখন ভারতবাসীর দারিদ্র্যের নগ্নরূপ ও দেশের অর্থনৈতিক পুষ্টিহীনতার কারণ সম্পর্কে তাঁদের চোখ খুলে গেল। ব্রিটিশ শাসনই এদেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে তাঁদের এই দিবাস্বপ্নও গেল

ভেঙে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে ভারতীয় অর্থনীতি যতদিন সাম্রাজ্যবাদের কবলে থাকবে ততদিন তার উন্নতির সম্ভাবনা নেই, বরং ক্রমাবনতির প্রবল সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতারা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের কাজে ভারতীয়দের শিক্ষিত করার জিগির স্তব্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে চিরকালের জন্য সহৃদয় স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক লক্ষ্য। তাঁদের মত ছিল যে ভারতবাসীরা 'স্বায়ত্তশাসন' বা গণতন্ত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে যা অত আকর্ষণীয় ছিল সেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ শুরু হল। এমন-কি, চিন্তা স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, জনসমিতি গঠন প্রভৃতি সাধারণ নাগরিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ শুরু হল বা তাদের সীমাবদ্ধ করা হল। পূর্বে যে আইন ও শৃঙ্খলা ছিল শান্তিপূর্ণভাবে প্রগতি ও আধুনিকতা লাভের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন এখন তাকে বেশি মাত্রায় কাজে লাগানো হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য।

ভারতকে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ ও ভারতের মানুষকে একটি জাতিতে পরিণত করার পথে ব্রিটিশ সহায়তা করে নি, বরং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিপ্রথা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিভেদমূলক শক্তিকে সমর্থন করে এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে উজ্জীবিত করে এদেশে নিজের প্রাধান্যই বজায় রাখতে চেয়েছিল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা দেখলেন যে প্রগতিবাদী বিদেশী প্রেরণার উৎসও বড়ো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ সরকার মোট বরাদ্দের ৩ শতাংশেরও কম খরচ করতেন শিক্ষার জন্য। সাধারণ মানুষ ও মেয়েদের শিক্ষাকে তাঁরা সম্পূর্ণ অবহেলা করতেন এবং উচ্চ শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তার প্রসারের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৮৫৮-র পরে ব্রিটিশ শাসকেরা সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টাই দেখান নি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুন্নত, গোঁড়া ও সংস্কারবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাতে শুরু করেন।

এভাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নতুন করে ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক স্বরূপকে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ঙ্গম করার কঠিন সাধনায় ব্রতী হতে হল। এই বোধ বিকশিত হতে অনেক সময় লেগেছিল; তবু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যাকে এতদিন ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের পদ্ধতি বলে তাঁরা ভেবে এসেছিলেন তা আসলে এদেশ উপনিবেশে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি। এখন থেকে তাঁদের প্রচেষ্টা হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অনির্দিষ্ট মিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁরা হলেন জমিদার, ভূস্বামী, দেশীয় রাজন্যবর্গ, উচ্চপদস্থ ভারতীয় রাজকর্মচারী এবং প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিজীবী। তাঁদের স্বার্থ যেহেতু শাসকদের স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন ছিল সেইজন্য শ্রেণী হিসেবে জমিদার, ভূস্বামী, দেশীয় রাজারা ছিলেন বিদেশী শাসনের

প্রতি বিশ্বস্ত। উঁচু স্তরের আমলাতন্ত্রে যেসব ভারতীয় নিযুক্ত ছিলেন গরিব দেশেও শাসকদের মতোই উঁচু ছিল তাঁদের জীবনযাত্রার মান, শাসনক্ষমতা ও উঁচু সামাজিক মর্যাদাও তাঁরা পদাধিকার বলে ভোগ করতেন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই দুটি সামাজিক স্তর থেকেও অভ্যুদয় ঘটেছিল এমন অনেক ব্যক্তির যাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে সময়ের স্বদেশপ্রেমের জোয়ার; জাতীয় আন্দোলনের পতাকাতলে তাঁরাও সমবেত হয়েছিলেন।

প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন অনেকে যাঁরা ধর্ম নিয়ে চিন্তা করেন, বা ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মপ্রচার বা পুরনো ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষণ তাঁদের পেশা। তাঁরা পড়েছিলেন দোটানার মধ্যে। তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল, সুতরাং তাঁদের আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার প্রতি। সামাজিক সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল যে ক্ষমতাসীন তার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখানো। অথচ এদিকে আধুনিক ধরনের স্কুল, কলেজ ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পাঠশালা, মাদ্রাসা এবং উচ্চশিক্ষার প্রাচীন অনেক কেন্দ্রই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; তার ফলে প্রাচীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁদের সামাজিক স্তর ছিল নীচের দিকে তাঁদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল। এঁদের অনেকে আধুনিক সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতায় যেমন আদর্শগত কারণ ছিল, তেমনি আশঙ্কা ছিল যে এ সবের ফলে সমাজে তাঁদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে। খৃস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরা ধর্মান্তর গ্রহণের পক্ষে যে প্রায় আক্রমণাত্মক প্রচার শুরু করেছিলেন তাও তাঁদের অসন্তোষকে তীব্র করে তুলেছিল।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি প্রবণতা দেখা দিল। একদল আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁদের বিদ্বেষ বজায় রেখেই জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে চাইলেন; অন্য দল বিদেশী শাসকদের সমর্থন জানালেন এই আশায় যে তাতে সমাজে তাঁদের প্রাচীন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। বলা বাহুল্য, সরকার দ্বিতীয় দলটিকেই সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দিতেন এবং তার ফলে মন্দির, মঠ, মসজিদ, দরগা, গুরুদ্বারা এবং অন্যান্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর পুরাতন সংস্কৃতির বাহকদের কর্তৃত্ব দৃঢ় ও অবিচল রইল। অবসরবৃত্তি, আর্থিক পুরস্কার, খেতাব, সম্মান ইত্যাদি দিয়ে সরকার এই সম্প্রদায়কে অনুগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন। পুরনো ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থাকে কৃত্রিমভাবে জীবিত রাখবার জন্যও এই সময় নতুন করে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে সরকার এই সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতি সংস্কারের নীতি বিসর্জন দিয়ে রক্ষণশীলদের আস্থা ও সম্ভ্রম অর্জন করেন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক প্রগতি প্রভৃতি আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার যাতে বন্ধ করা যায় সেজন্য সরকার এ কথাও প্রচার করতে শুরু করলেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তাধারা ও

সামাজিক প্রতিষ্ঠানই এদেশের পক্ষে উপযোগী। সেইজন্য অর্থনীতি, রাজনীতি ও শাসনের ভার ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতীয়দের উচিত তাদের দার্শনিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ও জীবনের 'আধ্যাত্মিক' দিকগুলির প্রতি মনঃসংযোগ করা। কর্মবিভাগের এই আদর্শও অনেক প্রাচীনপন্থী চিন্তাবিদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল।

আর-একটি গুরুতর কারণে রাজা এবং ভিখারি, জমিদার এবং তার প্রজা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং কেরানী, ধনী ও দরিদ্র—সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রগাঢ়ভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল। শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিল যে জাতি হিসেবে তাঁরা অনেক উন্নততর এবং সে মনোভাবকে তাঁরা প্রকাশ করতেন উদ্ধতভাবে। ব্রিটিশ এদেশের লোকদের সঙ্গে সব সময়েই দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মনোভাবেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে যখন শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সামাজিক ও জাতিগত ব্যবধান আরো দুস্তর হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের পুনরুজ্জীবনের ফলে বর্ণবিদ্বেষমূলক ভাবধারা এই সময় ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এ অভিমত প্রচারিত হচ্ছিল যে সহজাতভাবে 'সাদা' 'কালো'র চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। ব্রিটিশও এই সময়ে ভারতে খোলাখুলিভাবে প্রচার করতে শুরু করলেন যে জাতি হিসেবে ভারতীয়রা অনুন্নত এবং বিজেতা শক্তি হিসেবে সুবিধা দাবি করতে লাগলেন। এমন-কি, রাজপ্রতিনিধির মতো উচ্চপদে আসীন থেকে ১৮৭০-রে পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর-এর কাছে মেয়ো (Mayo) লিখেছিলেন ঃ 'আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের এই শিক্ষা দেবেন যে আমরা সবাই ব্রিটিশ ভদ্রলোক এবং একটি নিকৃষ্টতর জাতিকে শাসন করার মতো মহৎ কাজে আমরা সবাই নিযুক্ত।" বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের এরকম নির্লজ্জ ও স্পর্ধিত প্রকাশে চিন্তাশীল আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয়ই অপমানিত ও অবমানিত বোধ করতেন। এই বোধ তাঁদের জাতীয়তাবাদী কর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ব্রিটিশ শাসনের মূলত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ভারতীয় জনগণের জীবনে তার বিষময় ফলাফল ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জাগরণ ও বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়—কারণ এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন ভারতীয় সমাজের সকল শ্রেণী, সব সম্প্রদায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই শ্রেণী ও সম্প্রদায়গুলির ছিল নিজস্ব বিরোধের সম্পর্ক, এবং এই বিরোধের সূত্রে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে সামিল হন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে ছিল অনেক স্বার্থের বিরোধ, কিন্তু পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগ্রামের আদিপর্ব

প্রাচীন ধরনের প্রতিরোধ

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা থেকেই এদেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এমন কোনো বছর প্রায় ছিল না যখন সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতের কোনো-না-কোনো প্রান্তকে আলোড়িত করে নি। এই যে অব্যাহত প্রতিরোধের ধারা এর চরিত্র ছিল পুরোপুরি প্রথাশ্রিত। প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে এইগুলিকে ভাগ করা যায় : অসামরিক বিদ্রোহ, আদিবাসী অভ্যুত্থান, কৃষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-অভ্যুত্থান।

অসামরিক বিদ্রোহ

যে উপায়ে ব্রিটিশ এদেশ জয় করেছিল এবং এদেশকে তার শাসনপাশে বেঁধেছিল তাতে গোড়া থেকেই জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন-কি, যেসব এদেশীয় লোক ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করত, এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তাদেরও স্পর্শ না করে পারে নি। প্রায় একশো বছর ধরে এই বিক্ষোভ সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যচ্যুত রাজারা তাঁর বংশধর ও আত্মীয়েরা, জমিদার, পলিগার, প্রাক্তন সৈনিক, রাজকর্মচারী বা রাজার অন্যান্য অনুচর এইসব সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন। নিজেদের দুর্দশা ও অভিযোগের দ্বারা তাড়িত হয়ে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের অনেকে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করত এবং অনেক ক্ষেত্রে তারাই এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। বাংলাদেশ ও বিহারে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধরনের অসামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বর্ধিত কঠোরতা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের হাতে কারিগর সম্প্রদায়ের শোষণ, প্রাচীন জমিদারদের জমিদারি থেকে উৎখাত করে দেওয়া—এসবই এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে বিস্ফোরণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। গণবিদ্রোহ দেখা দিল প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে, প্রত্যেক জেলায়। এদের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের নাম করলেই বোঝা যাবে জনসাধারণের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কতটা ব্যাপক ছিল।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন ছাঁটাই সৈনিকের দল এবং জমি থেকে উৎখাত কৃষকেরা। এ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন সন্ন্যাসী ও জমিহারা জমিদার সম্প্রদায়। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত চলেছিল এই বিদ্রোহ। বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলা জুড়ে এর পরে যে চুয়ার অভ্যুত্থান শুরু হয় তার স্থায়িত্বকাল ১৭৬৬ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত। এর পরে আরো একটি চুয়ার বিদ্রোহের আগুন ১৭৯৫ থেকে ১৮১৬ পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল।

ব্রিটিশ রাজত্ব দেশের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও একই ধরনের বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০৪ থেকে ১৮১৭ পর্যন্ত উড়িষ্যার জমিদারেরা বিদ্রোহ চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের ভিজিয়ানা গ্রামের রাজা ১৭৯৪ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তামিলনাড়ুর পলিগারেরা ১৯৭০-এর দশকে, মালাবার ও ডিন্‌ডিগালের পলিগারেরা ১৮০১-এ বিদ্রোহে ফেটে পড়েন। অন্ধ্রের উপকূল-অঞ্চলের পলিগারেরা ১৮০১ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত এবং পার্লাকিমিডির পলিগারেরা ১৮৩১ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত বিদ্রোহের ধারা অব্যাহত রাখেন। মহীশূরবাসীরা প্রথম বিদ্রোহ করেন ১৮০০ সালে এবং পরে আবার ১৮৩১-এ। বিশাখাপত্তনমের গণ-অভ্যুত্থান চলেছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভেলু তাম্‌পি ১৮০৫ সালে বিদ্রোহ করেন। পশ্চিম-ভারতে সৌরাষ্ট্রের দলপতিরা ১৮১৬ সাল থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে একের পর এক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। গুজরাটের কোলি-রাও এই পথ অনুসরণ করেন ১৮২৪-২৫, ১৮২৮, ১৮৩৯ ও ১৮৪৯ সালে। মহারাষ্ট্রেও গণ-অভ্যুত্থানের সংখ্যা ছিল অজস্র। এমন-কি, এ রাজ্যে বিদ্রোহের শিখা কখনো নির্বাপিত হয় নি। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় কিট্টুর অভ্যুত্থান (১৮২৪-২৯), কোলাপুর অভ্যুত্থান (১৮২৪), সাতারা অভ্যুত্থান ও গাদকারিদের বিদ্রোহের (১৮৪৪) কথা। উত্তর ভারতও এর চেয়ে কিছু শান্ত ছিল না। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও হরিয়ানার জাঠেরা ১৮২৪-এ তীব্র আন্দোলন শুরু করে। আরো যেকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ তা হল ১৮০৫-এ বিলাসপুরের রাজপুতদের, ১৮১৪-১৭-তে আলিগড়ের তালুকদারদের, এবং ১৮৪২-এ জব্বলপুরের বুন্দেলাদের বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম একশো বছরের ইতিহাসে যেন একটি সুতোর মতো অবিচ্ছিন্ন এই বিদ্রোহের ধারা। জমিদার, ছোটো ছোটো দলনায়ক এবং কৃষকদের মধ্যে যে পুরনো সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার যোগসূত্র ছিল তাকে আশ্রয় করে এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমিত হওয়ার ফলে এগুলি ছিল পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন। এদের দৃষ্টিও ছিল পিছনের দিকে—অতীতের দিকে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও স্বরূপ সম্পর্কে আধুনিক চেতনা, নতুন সামাজিক সম্পর্কের ওপর গঠিত নতুন সমাজবোধ এই বিদ্রোহ বিশ্লেষণ

করলে এর কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলির যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন প্রাচীনত্বের প্রতিনিধি; তাঁদের চারদিকের পৃথিবীতে কী পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অনেক সময়ই তাঁদের দমন করার জন্য ব্রিটিশকে প্রচুর সৈন্যবল প্রয়োগ করতে হয়েছে, তবু ব্রিটিশের ক্ষমতার সঙ্গে সত্যিকার মোকাবিলা করার মতো প্রতিরোধ তাঁদের কাছ থেকে আসে নি। তবু, তাঁদের মহৎ অবদান হচ্ছে এই যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আঞ্চলিক ঐতিহ্য তাঁরা স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রথানুগ প্রতিরোধ চরমে পৌঁছয় ১৮৫৭-র বিদ্রোহে—যাতে অংশগ্রহণ করেছিল লক্ষ লক্ষ কৃষক, কারিগর ও সৈনিক। ১৮৫৭-র বিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসনের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে এ বিদ্রোহের প্রথম সূচনা। কিন্তু তার আগুন অচিরে ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, বহু মানুষের মধ্যে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ এই বিদ্রোহ। সরকারী ভূমিরাজস্বনীতির বিরুদ্ধে অনেক অসন্তোষ জমা হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়ের মনে। সে নীতির ফলে তাদের জমি হাতছাড়া হয়েছিল; তার ওপর পুলিশ, নগণ্য সরকারী কর্মচারী, ছোটোখাটো আদালত—কারো অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রেহাই ছিল না। ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের সমাজে, যাঁরা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, শাসন বিভাগে মোটা মাইনের উঁচু পদ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাঁদেরও দুরবস্থার সীমা ছিল না। পুরোহিত, পণ্ডিত, মৌলভী প্রমুখ যাঁরা সাংস্কৃতিক বা ধর্মসংশ্লিষ্ট পেশা অবলম্বন করে জীবনযাপন করতেন, তাঁদের আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তাঁদের পুরনো পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাজপুত্র, জমিদারদের কোনো বৈভবই আর অবশিষ্ট ছিল না। ১৮৫৬-এ আওধ অধিকারের ফলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; বিশেষ করে আওধে অসন্তোষের মাত্রা ছিল তীব্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের অনেকেই এসেছিল আওধ থেকে, সুতরাং এ ঘটনা যে তাদের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত করবে তা খুব স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাদের পরিবারবর্গ আওধে যেসব জমিজমা ভোগ করত তাদের করের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেল। অধিকাংশ তালুকদার ও জমিদারের ভূসম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হ'ল ব্রিটিশের হাতে; ফলে ভূমিহারা জমিদার ও তালুকদার শ্রেণী ব্রিটিশের বিপদজ্জনক শত্রুতে পরিণত হলেন।

ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসির আমলে ব্রিটিশের আগ্রাসী নীতি চরম রূপ ধারণ করল। ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গও উদ্‌বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে বা হীনভাবে আনুগত্য স্বীকার করলেও তাঁদের অস্তিত্বের আর কোনো নিশ্চয়তা নেই। নানা সাহেব, ঝাঁসীর রানী

এবং বাহাদুর শাহ্ প্রমুখ অনেককে ব্রিটিশের চরম শত্রুতে পরিণত করার জন্য এই অগ্রাসী নীতিই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

কোম্পানির সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ ছিল একাধিক। স্বল্প বেতনে কঠোর জীবনযাপন করতে হ'ত তাদের, তার ওপর ভাগ্যে জুটত ব্রিটিশ অফিসারদের অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার। এ সম্পর্কে তৎকালীন এক ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকের উক্তি : "সিপাইকে গণ্য করা হয় নিকৃষ্ট জীব হিসেবে; তার সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করা হয়। গালাগালও জোটে তার ভাগ্যে। তাকে কখনো বলা হয় 'নিগার', কখনো 'পিগ' বা 'শুয়ার' বলে।...যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ...তারা সিপাহী-র সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন সে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কোনো পশু।" সিপাহীদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও ছিল খুব সামান্য; কোনো ভারতীয়ের পক্ষেই মাসিক ষাট-সত্তর টাকার মাইনের সুবেদারের চেয়ে উঁচু কোনো পদে পৌঁছনো সম্ভব হ'ত না।

এইসব কারণে ১৮৫৭ সালে সারা দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল তা সর্বতোভাবে গণ-অভ্যুত্থানের সামিল। আর এই সঞ্চিত বারুদে স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ নিয়ে এল যে ঘটনা তা চর্বিমাখানো কার্তুজের প্রচলনের সঙ্গে জড়িত। সে সময় নতুন এনফিল্ড রাইফেলের ব্যবহার শুরু হয়; এর কার্তুজে একধরনের চর্বিমাখানো কাগজের আবরণ থাকত; ব্যবহারের আগে মোড়কের প্রান্তটি দাঁতে করে কেটে নিতে হ'ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোড়কের জন্য ব্যবহার করা হ'ত গোরুর কিংবা শূকরের চর্বি। এই ধরনের কার্তুজ প্রচলন করার ফলে সিপাহীদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগল; তারা ক্রোধে ফেটে পড়ল। বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হ'ল তারা, আর তাদের উপলক্ষ করে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে।

দিল্লি থেকে ৩৬ মাইল দূরে মীরাটে ১৮৫৭-র ১০ই মে এই বিদ্রোহের শুরু। প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সিপাহীরা। ক্রমে শক্তি সঞ্চয় ক'রে এ বিদ্রোহ যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল তার ভৌগোলিক পরিসীমা উত্তরে পঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নর্মদা আর পশ্চিমে রাজপুতানা থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত ব্যাপ্ত। মীরাটের সিপাহীরা তাদের অফিসারদের হত্যা করে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করল। পরদিন সকালে তারা পৌঁছল দিল্লিতে। দিল্লির সিপাহীরা এই ইঙ্গিতেরই অপেক্ষায় ছিল। তারাও যোগ দিল বিদ্রোহে। দিল্লি শহর অবরুদ্ধ হ'ল তাদের হাতে। মুঘল সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে তারা ঘোষণা করল ভারতের সম্রাট। এর পর থেকে বাহাদুর শাহ্ ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হলেন। সিপাহী, জমিদার, দলনেতা—যাঁরাই এ বিদ্রোহে যোগ দিলেন তাঁরা সবাই স্বীকার করলেন তাঁর আনুগত্য। এটা খুব লক্ষণীয় যে উত্তর ও মধ্য ভারতে যেখানে যেখানে সিপাহী-বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ ঘটে সেখানে সর্বত্রই পরে অসামরিক গণ-অভ্যুত্থানও দেখা দেয়। এ লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের হাতিয়ার ছিল কুড়ুল, বল্লম, তীরধনুক, লাঠি, কাস্তে, আর বড়োজোর নিতান্ত সাধারণ গাদা

বন্দুক। তবু, কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ এ বিদ্রোহ প্রকৃত শক্তির সঞ্চার করেছিল; উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সম্পর্কে এ কথা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একটি হিসেব থেকে জানা গেছে যে আওধে ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৫০,০০০ তার মধ্যে ১০০,০০০ জনই বেসামরিক নাগরিক।

১৮৫৭-র বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের শক্তির অন্যতম উৎস ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। সিপাহী ও সাধারণ মানুষের স্তরে এবং নেতাদের স্তরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল বিদ্রোহের সময়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল এ সহযোগিতা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিদ্রোহীরা যদি কোথাও জয়লাভ করত, হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আদেশ জারি হ'ত কোথাও গোহত্যা যাতে না হয়। তা ছাড়া নেতৃত্বের সব স্তরেই হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বও ছিল সমান সমান। এক প্রবীণ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন : "মুসলমানদের যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাব এ ক্ষেত্রে তারও উপায় ছিল না।" বস্তুতপক্ষে ১৮৫৭-র ঘটনাবলী থেকে এ কথা খুব ভালোভাবে প্রমাণিত হয় যে মধ্যযুগে, এবং ১৮৫৮-র আগে ভারতের মানুষ এবং তাদের রাজনীতি আদৌ সাম্প্রদায়িক ছিল না।

অবশেষে অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই জয়লাভ করল। তার বিশ্ববিস্তৃত ক্ষমতা তখন সমৃদ্ধির তুঙ্গে, তা ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় রাজা এবং দলনেতাই তার দলে। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের অস্ত্র নেই, সংগঠন নেই, সামরিক শৃঙ্খলা নেই; তাদের মধ্যে সংকল্প দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বেরও অভাব। এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার আগেই ব্রিটিশ তার বিপুল শক্তির সম্ভার নিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করল অত্যন্ত নির্মমভাবে। ১৮৫৭-র ২০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দিল্লি দখল করল; বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ তাদের হাতে বন্দী হলেন। এ আঘাতে বিচলিত হলেও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারা বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু একে একে তাঁদেরও পরাজয় শুরু হ'ল। নানাসাহেব কানপুরে পরাজিত হলেন ব্রিটিশের হাতে। তাঁর বিশ্বস্ত সেনানায়ক তাঁতিয়া টোপি ১৮৫৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে বীরের মতো গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এক জমিদার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে তিনিও ধরা পড়লেন শত্রুর হাতে। ১৮৫৮-র ১৭ জুন উন্মুক্ত তরবারি হাতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ হারালের ঝাঁসির রানী। ১৮৫৯ সালে বিহারের কুনওয়ার সিং, বখ্‌ত খান (ইনি প্রথমে সিপাহী ছিলেন এবং পরে স্বীয় ক্ষমতাবলে দিল্লির বিদ্রোহীদের অধিনায়ক হন), বেরিলীর খান বাহাদুর খান, ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদুল্লা প্রভৃতি নেতাদের মধ্যে আর কেউই জীবিত রইলেন না। আওধের বেগমকে নেপালে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে হ'ল। ১৮৫৯-র শেষাশেষি ভারতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ব্রিটিশের প্রভুত্ব।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ তবু ব্যর্থ হয় নি। দেশকে রক্ষা করার এক আত্যন্তিক প্রয়াসের প্রকাশ এ বিদ্রোহ; এ প্রয়াসের পদ্ধতি পুরনো, নেতৃত্বও পুরনো শ্রেণীনির্ভর। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম মহান মুক্তিসংগ্রাম। সারা দেশে ঘরে ঘরে স্মরণীয় হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী বীরেরা; বিদেশী শাসকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে দেশবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল তাঁদের নাম।

আদিবাসী অভ্যুত্থান

ভারতের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে আদিবাসী মানুষেরা। তারাও সংগঠিত করেছিল শত শত অভ্যুত্থান। ব্রিটিশের ক্ষমতার প্রসার ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিস্তারকে তারাও সুনজরে দেখে নি। ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে আদিবাসী মানুষকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শোষণব্যবস্থার আওতায় টেনে নিয়ে এসেছিল মহাজন, ব্যবসায়ী ও জোতদারের দল। তাদের সরল ও নিভৃত জীবনে এইসব গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশকে আদিবাসী মানুষেরা বাধা দিতে চেয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহগুলিতে একদিকে যেমন পাওয়া যায় তাদের অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয়, অপর দিকে তেমনি দেখা যায় সরকারী দমনপদ্ধতির কসাইসুলভ নির্মমতা। একদিকে ছিল ক্রুদ্ধ কিন্তু অসংগঠিত মানুষের দল যাদের সম্বল শুধু তীর, ধনুক, কুঠারের মতো আদিম অস্ত্র; অপর দিকে আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশের সুসংবদ্ধ ভারতীয় সৈন্যদল। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এইসব বিদ্রোহে। অসংখ্য আদিবাসী বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য : ১৮২০ থেকে ১৮৩৭-এর কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৭৯-র রম্পা বিদ্রোহ এবং ১৮৯৫ থেকে ১৯০১-এর মুণ্ডা বিদ্রোহ।

কৃষক আন্দোলন

ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি বোঝা বহন করতে হ'ত ভারতের কৃষক সম্প্রদায়কে; ফলে প্রতি পদক্ষেপে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহের বিশদ বিবরণ সহজে পাওয়া যায় না। এইসব বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত এখনো আত্মগোপন করে আছে সরকারী মহাফেজখানায় কিংবা অন্য এমন জায়গায় যেখানে আধুনিক ইতিহাসের উপকরণ সংরক্ষণ করা হয়। তা ছাড়া সরকারী নথিপত্রে অনেক সময় কৃষক বিদ্রোহগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা ডাকাতির উদাহরণ হিসেবে। ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ কতবার মূর্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রাথমিক ধারণা আমরা মাত্র গত কয়েক বছরে পেয়েছি।

আগেই বলা হয়েছে যে জমিদার বা ছোটো ছোটো দলনেতারা অনেক সময় যেসব অসামরিক বিদ্রোহে নেতৃত্ব করতেন, কৃষকেরা তাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। এর সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত ১৮৫৭-র বিদ্রোহ। আর-এক ধরনের কৃষকবিদ্রোহের মধ্যে ধর্মের আবরণ লক্ষ করা যায়।

গোড়াতে এগুলি ছিল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ও পরিশুদ্ধির জন্য আন্দোলন; কিন্তু ধর্মনির্বিশেষে নতুন জমিদার, ভূস্বামী এবং মহাজনদের সামনাসামনি আক্রমণ করার ধরন দেখে বোঝা যায় যে এগুলিরও সূচনা কৃষকসমাজের মধ্যে—এদেরও সংঘর্ষ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ওয়াহাবি আন্দোলনের, যা এক সময় সারা বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল; বাংলার যাবাজি আন্দোলন ও পাঞ্জাবের কুকা আন্দোলনও একই ধরনের।

১৮৫৮-র পরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধের চরিত্রে এক পরিবর্তন দেখা যায়। এখন থেকে কৃষকেরা সরাসরি নিজেদের দাবির জন্য লড়তে শুরু করল সরকার, বিদেশী ভূস্বামী এবং দেশী জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। আধুনিক কালের অন্যতম প্রধান কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'নীল বিদ্রোহে'র, যার বন্যায় ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল। নীল চাষের পুরোপুরি একচেটিয়া অধিকার ছিল ইওরোপীয়দের হাতে। বিদেশী নীলকররা চাষীদের বাধ্য করত নীল চাষ করতে এবং তাদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাত। নিজেদের আর্থিক ক্ষতি করেও যাতে চাষীরা নীলের চাষ করতে বাধ্য হয়, সেজন্য নীলকররা বেআইনীভাবে তাদের মারধোর করত এবং আটক করে রাখত। এইসব অত্যাচারের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত বাঙালী লেখক দীনবন্ধু মিত্র, ১৮৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে। চাষীদের ক্রোধ ফেটে পড়েছিল ১৮৫৯ সালে। লক্ষ লক্ষ চাষী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংকল্প নিল যে তারা আর নীলের চাষ করবে না। নীলকর আর তাদের সশস্ত্র অনুচরদের নৃশংসতা ও শারীরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধে স্থির রইল। বাংলাদেশের নব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও এই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থনে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে একটি কমিশন নিয়োগ করলেন এবং তার ফলে নীলকরদের বর্বরতা কিছুটা হ্রাস পেল। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার ও কৃষকদের প্রতিরোধ এতে একেবারে থামে নি। বিহারের দারভাঙ্গা ও চম্পারণে নীলচাষীরা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করেছিল ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশে যশোরের নীলচাষীরা প্রথমে ১৮৮৩-তে ও পরে ১৮৮৯-৯০ সালে বিদ্রোহ করে।

বাংলাদেশে কৃষক-বিদ্রোহের আগুন আবার জ্বলে ওঠে ১৮৭০-এর দশকে। এবার পূর্ববাংলা ছিল তার কেন্দ্র। এ অঞ্চলের শক্তিশালী জমিদারেরা কুখ্যাত ছিলেন প্রজাদের ওপর অত্যাচারের জন্য। তাঁরা যেমন খুশি প্রজাদের উচ্ছেদ করতেন, তাদের নাকাল

করতেন, তাদের ফসল ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল করে নিতেন। তা ছাড়া খাজনার মাত্রা বাড়ানোর জন্য এবং জমির ওপর চাষীদের অধিকার যাতে না জন্মায় তা দেখার জন্য যথেচ্ছ বলপ্রয়োগও করতেন। বাংলার চাষীদের প্রতিরোধের ঐতিহ্য ছিল সুপ্রাচীন—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা ১৭৮২ সালে বিদ্রোহ করেছিল। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে পূর্ববাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধেও চাষীরা সংগঠিত হল। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত যে ইউনিয়নগুলির মধ্যে দিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হল তাদের দাবি ছিল যে তারা খাজনা দেবে না। পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার ও তাদের অনুচরদের তারা আক্রমণ করতে শুরু করল। সরকার এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কৃষক-আন্দোলন দমন করলেন। এ সত্ত্বেও পরবর্তী বছরগুলিতে বিদ্রোহের আগুন মাঝে মাঝেই জ্বলে উঠত। অবশেষে সরকার যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জমিদার-অত্যাচারের সবচেয়ে নির্মম দিকগুলি থেকে তাঁরা কৃষকদের রক্ষা করবেন, বিদ্রোহ তখন শান্ত হল। এ সময়েও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বড়ো অংশ কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের পুনা ও আহমেদনগর জেলায় একটি বড়ো ধরনের কৃষক-বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৭৫ সালে। ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি বন্দোবস্ত ছিল। তা হলেও সরকারের রাজস্বের দাবি এত বেশি ছিল যে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষেই মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে ধার করা ছাড়া খাজনা মেটাবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মহাজনদের কাছে উত্তরোত্তর বেশি করে জমি বাঁধা পড়তে লাগল বা বিক্রি হতে লাগল। ছল-বল-কৌশল, আইন-সম্মত বা বেআইনী উপায়—যত ভাবে সম্ভব মহাজনেরা কৃষক ও তার জমির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে চলল ১৮৭৪-এর শেষের দিকেই কৃষকেরা ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। পুনা ও আহমেদনগর জেলার কৃষকেরা মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রথমে সামাজিক বয়কট সংগঠন করল; তারপর তা শীঘ্রই দাঙ্গার আকার ধারণ করল। তাদের ঋণ সংক্রান্ত যত বণ্ড, ডিক্রী এবং অন্যান্য নথিপত্র যেখানে যা ছিল সব জোর করে দখল করে তারা প্রকাশ্যে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলল। তাদের এই ক্রোধের মোকাবিলা করার সাধ্য পুলিশের ছিল না; তাই পুনায় 'যত অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী' ছিল সবাইকে কাজে লাগিয়ে তাদের আন্দোলন দমন করা হল। এখানেও মহারাষ্ট্রের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ কৃষকদের দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে কৃষকদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ অত্যন্ত চড়া রাজস্বের হার এবং কৃষকদের জন্য সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করার ব্যাপরে সরকারী ব্যর্থতা।

দেশের অন্যান্য অংশেও কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। আরো দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ

করা যেতে পারে। জেন্‌মি বা ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মালাবার বা দক্ষিণ কেরালার মোপলা কৃষকেরা ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৪-র মধ্যে অন্তত ২২ বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর পর আবার নতুন করে মোপলা কৃষকদের অসন্তোষ প্রকাশ পায় ১৮৭৩ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে অঞ্চলের পাঁচটি গুরুতর বিদ্রোহের মাধ্যমে। আসামের সমতল কৃষকেরা করভারে জর্জরিত হয়ে একইভাবে দাঙ্গা শুরু করে ১৮৯৩-৯৪ সালে। এখানের কৃষকেরা বর্ধিত মাত্রায় খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং তাদের জমি দখল করে নেবার জন্য সব সরকারী প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধভাবে ব্যাহত করে। রাজস্ব আদায়কারীদেরও এরা হঠিয়ে দেয়। এখানেও কৃষক-বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণে সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে কাজে লাগাতে হয়েছিল। নৃশংস গুলিবর্ষণ ও বেয়নেটের আঘাতের মুখোমুখি হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল অনেক কৃষক। এই সময়ে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী বর্বরের মতো যে অত্যাচারের নমুনা দেখিয়েছিল তার নির্মম স্মৃতি আসামের জনসাধারণের মনে এখনো পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই কৃষক-বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান অবশ্য কোনো সময়েই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের শিকড়কে আলগা করতে পারে নি। তবু ভারতীয় অর্থনীতি ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায় যেরকম ব্যাপকভাবে উদ্‌বাস্তু হয়ে পড়ছিল ও অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের এগুলি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা তাদের দুর্দশার প্রত্যক্ষ কারণ যেমন নীলকর, জমিদার বা মহাজন অনেক সময় তারাই ক্রোধের লক্ষ্য হ'ত। তবে তার অর্থ এই নয় যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নাম করে ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থাকে কায়েম করার ব্রিটিশ চেষ্টাকে তারা সবলে বাধা দেয় নি। ভারতের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ বাস্তবক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার বিষময় ভবিষ্যৎকে যেরকম বুঝেছিল, তা নব্যশিক্ষিত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ভারতীয়েরাও বোঝেন নি। তা সত্ত্বেও, তাদের অসাফল্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বাস, সাহস, বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগের প্রেরণা সবই তাদের ছিল; কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও বিশ্ববিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্পদের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের দাঁড়াবারই শক্তি ছিল না। নতুন কোনো মতাদর্শ তাদের অধিগত ছিল না; ঔপনিবেশিকতার সম্প্রসারণের ফলে যেসব নতুন সামাজিক শক্তি জন্ম নিয়েছিল তাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচীও তারা গ্রহণ করে নি। সমাজ সম্পর্কে এমন কোনো গঠনমূলক তত্ত্ব বা কোনো নতুন জীবনবাদ তাদের ছিল না যা দিয়ে দেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে। সংখ্যায় অগণিত হলেও এই ধরনের অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ অভ্যুত্থানের দ্বারা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক অভ্যুত্থানের যা আধুনিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের

উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সমাজ সম্পর্কে নবীন দৃষ্টি, এবং যেখানে নতুন মতাদর্শ ও নতুন রাজনৈতিক দল জনগণকে সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম। তা সম্ভব হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে যখন কৃষকসমাজের অসন্তোষ মিলে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সার্বিক বিক্ষোভের সঙ্গে; তখন বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলন ও আধুনিক কিষান-আন্দোলনগুলির মধ্যে কৃষকসমাজের রাজনৈতিক কর্মচেতনা অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। তবু উনবিংশ শতাব্দীর গণ-আন্দোলন ও বিদ্রোহ অন্তত এ কথা প্রমাণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কী প্রচণ্ড শক্তি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে।

আধুনিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক সমিতি

জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশলাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশও ঘটে এই যুগে। এই সময় ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার করার জন্য ও দেশে রাজনৈতিক কাজের গোড়াপত্তনের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করতে শুরু করেন। নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা, বাস্তব সম্পর্কে নতুন বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের নতুন শক্তি, রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন পদ্ধতি—এ সবের ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক কর্মসূচী গড়ে উঠবে এই তাঁদের আকাঙক্ষা ছিল। মতাদর্শ, নীতি, সংগঠন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাঁরা চেয়েছিলেন যে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মধারা এক নতুন গতিপথের ইঙ্গিত বহন করুক। এ কাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল সন্দেহ নেই। ভারতীয়েরা তখনো ছিলেন আধুনিক রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; রাজনৈতিক উপায়ে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে সংঘবদ্ধ হতে পারে এই ধারণাই ছিল অভিনব। ফলে এই আদি সমিতিগুলির ও প্রথম যুগের রাজনৈতিক কর্মচারীদের কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। আধুনিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসতে তাই অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় লাগে।

রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যেসব ভারতীয় নেতা সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেন রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একাধিক। তিনি চেয়েছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারের ক্ষেত্রে জুরিপ্রথার প্রবর্তন এবং শাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ। তাঁর দাবি ছিল যে ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ করা হোক। জমিদারি অত্যাচারের হাত থেকে রায়তদের রক্ষা করা ও ভারতীয় বাণিজ্যের ও শিল্পের অগ্রগতিও তাঁর আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাঁর আশা ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগ শেষ হয়ে গেলে দেশ আবার স্বাধীন হবে। জনসাধারণের জন্য তাঁর সমস্ত কর্মসূচীর রূপায়ণ এই আশার উপর ভিত্তি করে গড়ে

ওঠে। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। যেখানেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ তিনি দেখতে পেতেন, সেখানেই তাদের সমর্থন জানাতেন অকুণ্ঠভাবে।

যে ঐতিহ্য রামমোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উত্তরসূরী ছিলেন উদারপন্থী একদল বাঙালী যুবক। প্রখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামানুসারে তাঁরা নিজেদের 'ডিরোজিয়ান' বলে অভিহিত করতেন। ডিরোজিওর কাছ থেকে ছাত্রেরা যে তীব্র স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করতেন তার উৎস ছিল ফরাসী-বিপ্লবের ভাবধারা এবং টম পেন ও জেরেমি বেন্থামের রচনা। ডিরোজিয়ানরা অসংখ্য জনসমিতি স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং ভাবতেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা যায়। একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে রাজা রামমোহন ও ডিরোজিয়ানরা এইভাবে প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপন করেন।

১৮৩৭-এ কলিকাতায় স্থাপিত হল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। এটিই ভারতে স্থাপিত প্রথম রাজনৈতিক সংঘ। এর সংকীর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৪৩-এ স্থাপিত বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরো ব্যাপক। ১৮৫১-তে এই দুটি সমিতি মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। প্রায় একই সময়ে—১৮৫২ সালে—প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন এবং বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন। সারা দেশজুড়ে ছোটো ছোটো শহরগুলিতেও একই ধরনের অনেক সমিতি বা ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশের চরিত্রই ছিল আঞ্চলিক; তা ছাড়া প্রায় সবগুলিতেই আধিপত্য করতেন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার গোষ্ঠী। এঁদের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনবিভাগে আরো বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষা বিস্তার, সরকারী কার্য পরিচালনায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির পথে সহায়তা করা। এজন্য তাঁরা মাঝে মাঝে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি পেশ করতেন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের বার্থতার ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জমিদার, দেশীয় রাজন্যবর্গ বা ভূস্বামীদের হাতে পরিচালিত রাজনৈতিক প্রতিরোধের সফল হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মোড় ফেরানো দরকার। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল আরো একটি কারণে। আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৫৮-র পরে ব্রিটিশ শাসন ও শাসননীতিতেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্রিটিশ নীতি হয়ে উঠেছিল আরো প্রতিক্রিয়াশীল। ধীরে ধীরে হলেও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশ বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের

মূল উদ্দেশ্য শোষণ এবং সেইজন্য তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনাও করতে শুরু করেছিলেন। তবে কৃষকসমাজের সহজাত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত মনোভাবে বুদ্ধিজীবীরা অনেক সতর্ক ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহের ভঙ্গী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক কম ছিল। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বুঝতে তাঁদের সময় লেগেছিল অনেক দিন। তবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া একবার শুরু হবার পর আধুনিক চিন্তাধারার দ্বারা পুষ্ট হবার ফলে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে অনেক গভীরে যেতে পেরেছিলেন। তাঁদের উপলব্ধি ভবিষ্যতে আধুনিক রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়েরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে তৎকালীন রাজনৈতিক সমিতিগুলির লক্ষ্য অত্যন্ত সীমিত। তাদের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমিতির কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে উত্তরোত্তর এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে এর স্বার্থ জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এবং ফলত শাসকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে নতুন রাজনীতির প্রয়োজন এই সময় দেখা দিয়েছিল, তার জন্য রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীরা একটি নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলবার পথ খুঁজছিলেন।

১৮৬৬-তে দাদাভাই নৌরজি লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং ব্রিটেনের জনসাধারণের মতকে প্রভাবিত করা। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এর অনেকগুলি শাখা স্থাপিত হয়। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে দাদাভাই শীঘ্রই 'ভারতের মহান বৃদ্ধ' বলে পরিচিত হন। দাদাভাই-এর জন্ম ১৮২৫ সালে। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের কাজে তিনি জীবন ও তাঁর সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপরতাকে এদেশের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মনে করার কোনো কারণ নেই; ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ ঔপনিবেশিক শাসন যা এদেশের সমস্ত সম্পদ ও মূলধনকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। তরুণদের সঙ্গে দাদাভাই-এর সারাজীবন ধরে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সারাজীবন ধরে তিনি উদারপন্থী চিন্তা ও রাজনীতির সাধনা করে গেছেন। বিচারপতি রানাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, এস. এইচ. চিপলুংকর প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৭০-এ পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কুড়ি বছর ধরে এই সভা সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্রতী ছিল।

জাতীয়তাবাদী কর্মধারার মন্থরগতি অকস্মাৎ দ্রুত হয়ে ওঠে লিটনের সময়ে, তাঁর শাসনের প্রতিক্রিয়ারূপে। লিটন এদেশে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ১৮৭৬ থেকে

১৮৮০ সাল পর্যন্ত। অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও ভারতবিরোধী কর্মসূচী তিনি খোলাখুলিভাবেই গ্রহণ করেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থানকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রোৎপাদকেরা বিদ্বেষের চোখে দেখতেন; তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হল। ব্রিটিশ অধিকারের সীমা বিস্তারের জন্য আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল এই সময়ে, ভারতীয় রাজস্বই তার সব ব্যয়ভার বহন করল। অস্ত্র আইনও (Arms Act) প্রবর্তিত হয় লিটনের শাসনকালে। এ আইনের লক্ষ্য ছিল যাতে ভারতীয়েরা কোনোরকম প্রতিরোধ সংগঠিত করতে না পারে, এমন-কি, আত্মরক্ষার শক্তিও অর্জন করতে না পারে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বর্ধমান সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এইসময় বিধিবদ্ধ হয়। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সময় প্রাণ হারাচ্ছিল, তবু রাজকীয় সমারোহে রাজদরবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল।

এইগুলি ছাড়াও আরো একটি ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগীদের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯-এ নিয়ে আসা হল যাতে ভারতীয়দের পক্ষে সিভিল সার্ভিসে যোগদানের সম্ভাবনা আরো অসম্ভব হয়ে পড়ে। লিটনের শাসনকালে এই ধরনের শাসননীতির ফলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সারা দেশ মুখর হয়ে উঠে। ব্রিটিশ উৎপাদকদের আক্রমণের হাত থেকে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে স্বদেশী মতবাদ (Doctrine of Swadeshi) প্রথম প্রচারিত হয় এই সময়ে—১৮৭০-এর দশকে।

তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নতুন রাজনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটে বাংলাদেশে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের রক্ষণশীল, জমিদার-ঘেঁষা রাজনীতি নব্য মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষে বরদাস্ত করে চলা সম্ভব ছিল না। জমিদারদের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় তাঁদের দাবি ছিল যে তাঁরাই জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিনিধি। ব্রিটেনই এদেশকে চিরকালের জন্য শাসন করবে, এ ধারণা তাঁরা আদৌ সমর্থন করতেন না। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রথায় যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে এই সমিতি তাদের প্রথম আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই সমিতির বিশেষ প্রতিনিধি করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হ'ল যাতে তিনি এই আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন অর্জন করতে পারেন। আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর খ্যাতিই বোধহয় প্রথম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষকে তৎকালীন রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে সক্রিয় করে তোলার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা অনেকগুলি আন্দোলন সংগঠিত করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজার অধিকারকে

সমর্থন করা এবং বিদেশী মালিকের হাত থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। বাংলাদেশের অনেক শহরে এবং গ্রামে, তা ছাড়া বাংলার বাইরেও অনেক শহরে অ্যাসোসিয়েশনের অনেকগুলি শাখা স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তরুণ সম্প্রদায় এই সময় খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এম. বীররাঘবাচারি, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দচরলু প্রমুখ অনেকে ১৮৮৪-তে মাদ্রাজ মহাজন সভা স্থাপন করেন। বোম্বেতে ফিরোজ শা মেহতা, কে. টি. তেলাং এবং অন্যান্যের উদ্যোগে বোম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা

রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়েরা এইসময়ে উত্তরোত্তর বেশি করে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভব করছিলেন। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ মিলিত হতে পারত ও সর্বগ্রাহ্য কর্মসূচী নির্ধারণ করা সম্ভব হ'ত। তা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রকে আরো বিস্তীর্ণ করে তুলতে হলে যে জনশিক্ষার প্রচার অপরিহার্য, কোনো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারত। সে যুগে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করার উপযোগী অভিজ্ঞতা ও অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতিরও অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা একই সময়ে এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা চিন্তা করছিলেন। পশ্চিম ভারতে দাদাভাই নৌরজি, বিচারপতি রানাডে, ফিরোজ শা মেহতা, কে. টি. তেলাং, রহিমতুল্লা মুহম্মদ সায়ানি, জাভেরীলাল, উমাশংকর দীক্ষিত, বদরুদ্দিন তায়বজী প্রভৃতির নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। দক্ষিণ ভারতে ছিলেন জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং আনন্দচরলু এবং পূর্ব ভারতে ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ ব্যানার্জি প্রভৃতি। ইতিমধ্যে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যদিও এ প্রচেষ্টা খুব একটা সাফল্য অর্জন করে নি। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ভাবনাকে আরো বাস্তব রূপ দিলেন বোম্বাইয়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীরা। অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী এ. ও. হিউমের সহযোগিতায় ও তাঁদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনৈতিক নেতারা বোম্বাইয়ে মিলিত হলেন ১৮৮৫-র ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলিতে। এই নেতাদের সিদ্ধান্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন ডব্লু. সি. ব্যানার্জি।

অনেকে এ কথা বলেন যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের উৎসাহদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সেফটি ভাল্‌ভের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষিত ভারতীয়দের

ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ নিরাপদ বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যাতে বিক্ষুব্ধ কৃষকসমাজের সঙ্গে হাত মেলাবার সুযোগ না পান তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মৃদু ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি আসলে চেয়েছিলেন সে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণের গণ্ডীর মধ্যে রাখতে। তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় পাওয়া যায় এ কথা : "এই আন্দোলনের পেছনে যাঁরা প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। তৎকালীন উত্তেজনা...উত্তরোত্তর তীব্র চরমপন্থী রূপ ধারণ করছিল। এই তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা যাতে প্রকাশ্যে চরমতর রূপ গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল তাকে নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করা।"

জাতীয় কংগ্রেস কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসেবে এ ধারণা পুরোপুরি অসম্পূর্ণ, এমন-কি ভ্রান্ত। এই ব্যাপারে হিউম-এর ভূমিকা কী ছিল তার সীমিত আভাস এতে পাওয়া যায়, কিন্তু একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে ভারতীয় নেতারা কেন এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার ব্যাখ্যা এতে মেলে না। তাঁরা ছিলেন এক নতুন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি; ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতকে যেভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করা যাবে। তাঁরা ছিলেন খাঁটি স্বদেশপ্রেমী, বিদেশী সরকারের ক্রীড়নক নয়। তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার আদিপর্বেই সরকারী রোষের কবলে পড়তে চান নি বলে তাঁরা হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন হিউমের মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর সক্রিয় সাহায্য যদি পাওয়া যায় তা হলে সরকারী মহলে তাঁদের সম্পর্কে সরকারের সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। যদি বলা যায় যে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে 'সেফটি ভাল্‌ভ' রূপে ব্যবহার করা, তা হলে এ কথাও বলতে হয় যে কংগ্রেস নেতারা হিউমকে লাইটনিং কণ্ডাকটার বা বিদ্যুৎসঞ্চালনের দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। পরবর্তীকালে—১৮৩১ সালে—গোপালকৃষ্ণ গোখেল লিখেছিলেন :

> কোনো ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।...এই ধরনের সর্বভারতীয় আন্দোলনে কোনো ভারতীয় যদি অগ্রণী হতেন, তা হলে সরকার নিশ্চয়ই তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ তখন এত তীব্র ছিল যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যদি একজন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত প্রাক্তন ইংরেজ রাজকর্মচারী না হতেন, তা হলে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো উপায়ে এই উদ্যোগ দমন করতেন।

১৮৮৫-সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করল, যদিও সূচনায় তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃদু। তার ক্ষমতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে অবশেষে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শক্তিশালী, চরমপন্থী সংগ্রামে লিপ্ত করানো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

এ কথা অবশ্য মনে করা ঠিক নয় যে ১৮৮৫ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল একক বা প্রধান। অন্যান্য অসংখ্য, প্রবাহ বেয়ে জাতীয় চেতনা উন্মেষ ও অভিব্যক্তি লাভ করেছিল এই যুগে। দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যম ছিল অসংখ্য আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক সমিতি। বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে জনসাধারণ অনেক বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করত। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সংবাদপত্রের ভূমিকা। এই যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশিত হ'ত না; জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের মালিক এবং সম্পাদকদের অনেক সময় অসীম আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই প্রধান প্রধান জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। এ যুগের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে কতকগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : বাংলাদেশে—অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরর, সঞ্জীবনী এবং বেঙ্গলী; মাদ্রাজে—হিন্দু, স্বদেশমিত্রম, অন্ধ্র প্রকাশিকা এবং কেরল পত্রিকা; বোম্বাইয়ে—মারাঠা, কেশরী, ইন্দুপ্রকাশ এবং সুধারক; উত্তরপ্রদেশে—অ্যাড্‌ভোকেট, হিন্দুস্থানী এবং আজাদ; পাঞ্জাবে—ট্রিবিউন, আখবর-ই-আম এবং কোহিনূর।

আদি জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচী

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুকূল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি তখনো সৃষ্টি হয় নি। তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সে চেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করা। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আবর্তে জনসাধারণকে টেনে এনে রাজনীতি, আন্দোলন এবং সংগ্রাম পদ্ধতিতে তাদের সুশিক্ষিত করে তোলা ছিল তাঁদের ভূমিকার অংশ। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল জাগ্রত করে তোলা এবং দেশে জনমত সংগঠিত করা। দ্বিতীয়ত, সারা দেশের ভিত্তিতে জনসাধারণের দাবিগুলিকে এমন সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যাতে তার মধ্যে দিয়ে নবোন্মেষিত জনমতের সর্বভারতীয় চরিত্র প্রতিফলিত হয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজনীতি-সচেতন মানুষের মধ্যে এবং রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বোধ সৃষ্টি করা। এই যুগের

নেতারা খুব ভালোভাবেই জানতেন জাতীয়তাবোধকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই; জাতীয় চেতনা তখন সবেমাত্র রূপ নিতে শুরু করেছে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে জাতি-ধর্ম-অঞ্চল নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের উচিত সতত সচেষ্ট থাকা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সক্রিয় জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে জাতীয় কংগ্রেস এই ঐক্যবোধকে বিকশিত করে তোলার পথে সহায়তা করেছিলেন। সর্বজনীন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যবোধ সংগঠিত করার প্রচেষ্টা তাঁদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে রূপ পেয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সমালোচনা

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অবদান বোধহয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা। ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ অর্থনীতির পুরোপুরি দাস করে রাখাই যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ তা তাঁরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন যে, তিনটি ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক শোষণ পাকাপাকি করা হচ্ছে : বাণিজ্য, শিল্প এবং মূলধন। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য যাতে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য তিনভাবে এদেশের রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করা হচ্ছিল। এক, এদেশকে কাঁচামালের সরবরাহক হিসেবে পরিণত করা, দুই, এদেশকে ব্রিটিশ পণ্যের বাজাররূপে ব্যবহার করা, এবং তিন, ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে এদেশকে কাজে লাগানো। ব্রিটিশের এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে যেসব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাদের প্রায় সবকটির বিরুদ্ধে তাঁরা সংগঠিত করেছিলেন শক্তিশালী আন্দোলন। তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটেনের কাছে ভারতের অর্থনৈতিক অধীনতা হ্রাস পাক, এমন-কি যদি সম্ভব হয় তা হলে সে অধীনতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক। এই যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা তাঁদের রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন এর একমাত্র কারণ ব্রিটেনের হাতে ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ। দাদাভাই নৌরজি লিখেছিলেন, ভারতীযদের অবস্থা "নিতান্তই ভূমিদাসের মতো। আমেরিকান দাসেদের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ আমেরিকান প্রভুরা অন্তত নিজের সম্পত্তির মতো তাদের দাসেদের যত্ন নেয়।" ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "এ যেন এক চিরস্থায়ী বৈদেশিক আক্রমণ যার পরিধি দিন দিন বেড়ে উঠছে। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত গতিতে, এর হাতে দেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।"

একদিকে দেশের পুরনো হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধন করে অন্যদিকে আবার আধুনিক শিল্পবিকাশের পথ বন্ধ করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন, আদি জাতীয়তাবাদীরা তারও তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতের রেলপথ, চা বাগিচা, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে লগ্নি করার জন্য যে ভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি আমদানি করা হচ্ছিল, এঁদের অনেকেই তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে এইভাবে পুঁজি খাটানোর স্বাধীনতা থাকলে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পপতিদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ওপর আরো শক্ত হয়ে উঠবে ব্রিটিশ শাসনের মুঠি। তাঁরা জানতেন বৈদেশিক পুঁজির এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুফল শুধু সেদিনের মানুষই ভোগ করবে না, করবে তাদের উত্তরসূরীরাও। তাই তাঁদের দাবি ছিল যে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হোক।

তাঁদের মত ছিল যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায়, সর্বক্ষেত্রে দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলা, বিশেষ করে আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা। দ্রুত শিল্প প্রসারের জন্য যেহেতু সক্রিয় রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও রক্ষাত্মক শুল্কনীতি অপরিহার্য, সেজন্য তাঁরা সরকারের কাছে কতকগুলি পথ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যার মধ্যে দিয়ে সরকার ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে, গ্যারাণ্টি বা ঋণের ব্যবস্থা করে কিংবা সরকারী অর্থপুষ্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করুন। বিদেশে ধারের ব্যবস্থা করে দেশী শিল্পকে সে মূলধন ধার দেওয়াও সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। তা ছাড়া ইস্পাত, খনি প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করার সামর্থ্য ভারতীয় শিল্পপতিদের তখনো হয় নি; অথচ এইসব শিল্প দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নতির জন্য অপরিহার্য বলে, কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন যে সরকার উদ্যোগী হয়ে এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তুলুন। শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ সম্প্রসারণও তাঁরা সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতির স্বার্থে কংগ্রেসী নেতারা আর-একটি পথ অবলম্বন করেছিলেন। তা হ'ল স্বদেশী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলা। এর ফলে অনেক স্বদেশী দোকান খোলা হয়েছিল। গণেশ বাসুদেব যোশী যখন ১৮৭৭ সালের রাজদরবার পরিদর্শন করেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নিখুঁত হাতে বোনা খাদি। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে একটি বড়ো স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ছাত্রেরা সেখানে প্রকাশ্যে পুড়িয়েছিলেন বিদেশী কাপড়ের স্তূপ।

ভারতে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক রহিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন, জাতীয়তাবাদীরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জোরালো

সর্বভারতীয় আন্দোলন চালিয়ে যান। বস্ত্রশিল্পের উপর কর চাপানোর নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ কী তা ভারতবাসীর কাছে এই আন্দোলনের ফলে ধরা পড়েছিল এবং দেশব্যাপী জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ১৮৯৬-এর ২৮ জানুয়ারির সংখ্যায় পুনার কেশরী পত্রিকা লিখেছিলেন "ইওরোপীয়দের ধারণা ভারতবর্ষ যেন তাঁদের সংরক্ষিত চারণভূমি। এখান থেকে শুধু তাঁদেরই অন্ন সংস্থান করার অধিকার আছে, আর কারোর নেই।" জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পি. আনন্দ চরলুর মতে, "শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসন বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু তামিলে একটা কথা আছে যে ক্ষেতের বেড়া-ই অনেক সময় শস্য খেতে শুরু করে; ব্রিটিশ ও ভারতীয়ের স্বার্থে যখন সংঘর্ষ লাগে, ভারতের অবস্থা তখন ক্ষেতের মতোই অসহায়। আরো কতকগুলি দাবির ভিত্তিতে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের অব্যাহত আন্দোলনের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। এক ছিল ভূমিরাজস্বের অত্যধিক চড়া হার যাতে কমিয়ে আনা হয় তার জন্য দাবি। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কৃষিব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার যাতে চাষীদের সুলভ হারে ঋণ দেন ও ব্যাপকভাবে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন তার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন। আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসম্পর্কের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার বেশ সচেষ্ট ছিলেন; কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা এই নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। আন্দোলনের আর-একটি লক্ষ্য ছিল চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন। তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থা ও সরকারী ব্যয়ের নীতিকে কেন্দ্র করেও তাঁরা আলোড়ন তুলেছিলেন। এই দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা চেয়েছিলেন আমূল পরিবর্তন। তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে তৎকালীন কর ব্যবস্থায় ধনী সম্প্রদায়, বিশেষ করে বিদেশীদের তুলনায়, গরিবদের দুর্দশার মাত্রা অনেক বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দাবি ছিল যে গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বিশেষ করে যেসব করের বোঝা বইতে হয় সেগুলি তুলে দেওয়া হোক। যেমন লবণ শুল্ক। তা ছাড়া যেসব খাতে সরকারের ব্যয় করার ঝোঁক বেশি তাতে ভারতীয়দের অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না; বরং ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই সাধিত হচ্ছে। যেমন সৈন্যবাহিনীর জন্য যে বিপুল ব্যয় হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখা। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এখানেও রাজকর্মচারীদের যে ধরনের উচ্চ হারে মাইনে দিতে হয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে তা সম্পূর্ণ অসংগত। স্বাভাবিকভাবেই এসব ক্ষেত্রে সরকারী নীতি জাতীয়তাবাদীদের তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও রেলওয়ের উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকেও তাঁরা দেখেছিলেন একই ধরনের সমালোচক দৃষ্টি দিয়ে। তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন যে এই দুটি ক্ষেত্রেই সরকারী নীতির লক্ষ্য হল বিদেশী পণ্য এদেশে আমদানির ও এদেশ

থেকে কাঁচামাল রপ্তানির পথ প্রশস্ত করা। তাই তাঁদের দাবি হ'ল যে সরকার বাণিজ্য ও পরিবহনের ক্ষেত্রে এমন নীতি গ্রহণ করুন যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটে।

জাতীয়তাবাদীরা যে তত্ত্বের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন সে তত্ত্ব হ'ল 'নির্গমন তত্ত্ব' বা 'ড্রেন থিয়োরি।' এই তত্ত্বের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের অর্থসম্পদ ও মূলধনের একটি বড়ো অংশ বিভিন্ন প্রবাহপথ বেয়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। এদেশে খাটানো ঋণের সুদ হিসেবে, ব্রিটিশ পুঁজির লভ্যাংশের আকার, আবার সামরিক-বেসামরিক অসংখ্য কর্মচারীর বেতন ও অবসরবৃত্তি রূপে এই নির্গমনের পথ সব সময়েই খোলা। এই 'নির্গমনে'র মধ্য দিতে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছিল ভারতে বৈদেশিক শোষণের স্বরূপ। তাই আদি জাতীয়তাবাদীরা যখন এই 'নির্গমন'কে (drain) তাঁদের তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য করে তুললেন, তখন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূলেই আঘাত পড়ল। ঔপনিবেশিক শোষণের পদ্ধতি কী তাও এর মাধ্যমে স্বচ্ছ হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের কাছে।

এই যুগে অনেক সময় দাবি করা হ'ত যে ব্রিটিশ শাসন ভারতে জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে নিরাপত্তার বোধ এনে দিয়েছে। এই দাবির সমালোচনা করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি :

> ভারতে জীবন ও সম্পত্তি যে নিরাপদ এ রকম একটা গল্প চালু আছে; বাস্তবে এই নিরাপত্তাবোধের কোনো অস্তিত্ব নেই। জনসাধারণ পারস্পরিক হিংসা বা দেশীয় একনায়কদের অত্যাচার থেকে মুক্ত এ কথা হয়তো স্বীকার করা যায়...কিন্তু ইংলণ্ড নিজের থাবা যখন প্রসারিত করে তার থেকে কোনো সম্পত্তির আদৌ পরিত্রাণ নেই, জীবনও সেখানে নির্বিঘ্ন নয়। ভারতবর্ষে সম্পত্তি যে নিরাপত্তা ভোগ করে এ কথা মনে করার আদৌ কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষে নিশ্চিত নিরাপত্তা ভোগ করে একমাত্র ইংলণ্ডের স্বার্থ। তারই বলে ইংলণ্ড প্রতি বছর ৩০,০০০,০০০ বা ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ সম্পদ ভারত থেকে শোষণ করে এবং নিজের দেশে চালান করে...সাহস করে এ কথা আমি তাই বলতে পারি যে জীবন ও সম্পত্তির কোনো নিরাপত্তা ভারতবর্ষ ভোগ করে না।...তার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জীবনের অর্থ হ'ল শুধু অর্ধাহার, অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি।

ব্রিটিশের আর-একটি দাবি ছিল যে তাদের শাসন এদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্য নিয়ে এসেছে। বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা মিশিয়ে এরও জবাব দিয়েছিলেন দাদাভাই :

> কথায় বলে 'পেটে খেলে পিঠে সয়'। দেশের মানুষ যখন দেশেরই স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অধীনে ছিল তখন পিঠে হয়তো তাদের অনেক কিছু সহ্য করতে হ'ত, কিন্তু যা উৎপাদন করত তা ভোগ করার স্বাধীনতাও তেমনি তাদের ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে

হিংসার ভয় নেই, মানুষ শান্তিতেই আছে—আর এই পরম শান্তির মধ্যে অলক্ষিতে, অতি সূক্ষ্মভাবে, বিনা হিংসায় তার ভেতরের সমস্ত সারবস্তু নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে, গভীর শান্তিতে আইনশৃঙ্খলার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় সে অনাহারে মৃত্যু বরণ করছে।

উপরের আলোচনাটির সারাংশ এইভাবে করা যায় : অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় ধারণা গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের কিছু পরোক্ষ সুফলের চেয়ে প্রত্যক্ষ কুফল যে অনেক বেশী, ব্রিটিশ শোষণই যে ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ—এ কথা সর্বসাধারণের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের যে নীতি সরকার গ্রহণ করেন, এই যুগের জাতীয়তাবাদী কর্মীরা তারও নির্ভীক সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। সমগ্র শাসনব্যবস্থারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে ছিল দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও অত্যাচারের বীজ; তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা তাই ছিল যাতে পুরো শাসনব্যবস্থারই সংস্কার করা যায়। বিশেষ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ দাবির পিছনে নীতিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নানাবিধ কারণ ছিল। দাবিটি হ'ল, শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে ভারতীয়দের আধিপত্য দিতে হবে। এ দাবির পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল তা গুরুত্বপূর্ণ। ইওরোপীয় কর্মচারীদের এত বেশি মাইনে দিতে হ'ত যে তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত, তা ছাড়া মাইনের একটা বড়ো অংশ ব্রিটেনে পাঠানো হ'ত বলে 'নির্গমনে'র (drain) পথও এতে প্রশস্ত হ'ত। এ দাবির রাজনৈতিক কারণও ছিল সংগত। ইওরোপীয় কর্মচারীরা প্রথমত ভারতীয়দের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতেন, দ্বিতীয়ত ভারতীয় শিল্পপতিদের বঞ্চিত করে অনুগ্রহ দেখাতেন ইওরোপীয় শিল্পপতিদের প্রতি। তা ছাড়া নীতিগত দিক দিয়ে বিচার করলে, ইওরোপীয় কর্মচারীদের অধীনে থাকার ফলে নিজেদের দেশেই ভারতীয়দের হীনমন্যতা থেকে ভুগতে হ'ত—তাদের চরিত্রের মহত্ত্ব বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছিল না। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের দ্বিতীয় দাবি ছিল যে অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। শাসন বিভাগের নিচুর তলার এই কর্মচারীরা এত কম মাইনে পেতেন যে স্বাভাবিক ভাবেই এই স্তরে অযোগ্যতা ও দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসেছিল।

সাধারণ মানুষের প্রতি পুলিশ ও সরকারী প্রতিনিধিদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও এই যুগের জাতীয়তাবাদী কর্মীরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিদিনই এই ধরনের অসংখ্য অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতেন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি। এই

ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের দাবি ছিল যে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখতে হবে যাতে কিনা পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের যথেচ্ছ আইনের কবল থেকে লোকেরা কিছুটা নিরাপত্তার আশ্রয় পায়। বিচারপদ্ধতি যে অস্বাভাবিক বেশি সময় নেয় তা কমিয়ে আনতে হবে এবং বিচারপ্রার্থীদের যে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয় তা হ্রাস করতে হবে। তা ছাড়া আইনের পক্ষপাতিত্বও ছিল ইওরোপীয়দের প্রতি। ইওরোপীয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের সংঘর্ষের ফলে যখনই কোনো মামলা হ'ত, প্রত্যেকবার সুবিচার পেত ইওরোপীয়, ভারতীয় নয়। এই পক্ষপাতের তীব্র নিন্দা করে করে জাতীয়তাবাদীরা দাবি করেছিলেন যে আইনের সমদৃষ্টি ইওরোপীয়দের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে। জনসাধারণকে নিরস্ত্র রাখার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা তারও বিরোধিতা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন সব মানুষেরই অস্ত্র রাখার অধিকার থাকুক।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা সরকারী নীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রতি সরকার যে আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরা তার তীব্র বিরোধিতা করেন। বর্মা জয়, আফগানিস্থান আক্রমণ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে আদিবাসী দমন—সরকারের এইসব কাজেরই তাঁরা সমালোচনা করেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে, জনকল্যাণমূলক কাজের মান ছিল নিচু, সরকারের ঔদাসীন্যের স্বাক্ষর তাতে ছিল স্পষ্ট। জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন এ ক্ষেত্রেও সরকার সচেষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজের মান উঁচু করে তুলুন। যে বিষয়টির প্রতি তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন তা হ'ল জনশিক্ষা—জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করেন। তাঁদের দাবি ছিল প্রযুক্তিবিদ্যা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা আরো বাড়িয়ে দেওয়া হোক। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের প্রতিও তাঁরা সমান গুরুত্ব আরোপ করেন। আর আগেই আমরা দেখেছি, ভারতীয় শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন যে সরকারী শাসন বিভাগ সক্রিয় ভাবে উদ্যোগী হোক।

যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, ফিজি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ গায়ানা প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে বসবাস করতেন তাঁদের স্বার্থের প্রতিও জাতীয়তাবাদী নেতাদের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। এই উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের চরম বর্ণবিদ্বেষ ও অন্যান্য অনেক অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। অনেক সময় তাঁদের সঙ্গে দাসের মতো ব্যবহার করা হ'ত। ১৮৯৩ সালের পরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতে দক্ষিণ আফ্রিকার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন তাতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতারা। চা ও কফি বাগান প্রভৃতির মজুরদের স্বার্থের প্রতিও জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টি ছিল সমান সজাগ। বিদেশী মালিকদের অধীনে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে হ'ত

এই শ্রমিকদের, প্রায় দাসের মতো ছিল তাদের অবস্থা। এদের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট হয়েও জাতীয়তাবাদী কর্মীরা কলকারখানা ও খনির মজুরদের স্বার্থরক্ষায় কেন উদ্যোগী হন নি তা বিস্ময়ের বিষয়—অথচ এরাও ছিল একই ধরনের নির্মম শোষণের শিকার। এদের স্বার্থের চেয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁদের হয়তো ধারণা ছিল যে বিদেশী আধিপত্যের অবসান যখন ঘটবে, ভারতীয় শিল্পপতিরা তখন নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনে মনোযোগ দেবেন।

নাগরিক অধিকারের জন্য আন্দোলন

বাক্-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, রচনা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা প্রভৃতি যত নাগরিক অধিকার আধুনিক মানুষ ভোগ করে, রাজনীতি-চেতনার উন্মেষের সূচনা থেকেই ভারতবাসীরা সেই অধিকারগুলির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ফলে এই অধিকার খর্ব করার জন্য সরকারের মুষ্টি যখনই উদ্যত হ'ত, দেশের মানুষ তখনই সে অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতেন। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধের জন্য ১৮৭৮-এ যখন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তিত হ'ল, তখন তার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। ফলে সরকার ১৮৮০ সালে এই আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন। ১৮৯০-এর দশকে সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার দোহাই দিয়ে সরকার সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার অধিকার খর্ব করার যে চেষ্টা করেন, তাকেও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে বালগঙ্গাধর তিলক এবং অন্য কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদপত্র সম্পাদকের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁরা ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করছেন। তিলক তখনই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বিখ্যাত—তাঁকে দেওয়া হ'ল ১৮ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড। পুনায় দুই নাটুভ্রাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে দেশান্তর পাঠানো হ'ল। অন্য কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদকের ভাগ্যে জুটল একই ধরনের বর্বর দণ্ড। নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে এই বীভৎস আক্রমণের প্রতিবাদে গর্জে উঠল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি; রাজনৈতিক সমিতিগুলিও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। সারা দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল প্রতিবাদ-আন্দোলনের জোয়ারে। তিলক রাতারাতি জনপ্রিয় সর্বভারতীয় নেতায় পরিণত হলেন। দেশের মানুষ তাঁকে সংবর্ধিত করল 'লোকমান্য' আখ্যা দিয়ে। সরকার এবার সচেষ্ট হলেন নতুন নতুন আইনের মাধ্যমে বাক-স্বাধীনতাকে খর্ব করে পুলিশের ক্ষমতার মাত্রা বাড়াতে। আইনের চোখে এখন রাজনৈতিক কর্মীদের মর্যাদা হ'ল গুণ্ডা-বদমায়েশদের মতো। এর বিরুদ্ধেও সারা দেশ প্রতিবাদে সংগঠিত হয়ে উঠল। নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম আর

কোনো বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম হয়ে রইল না, দেশের মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল সে সংগ্রাম।

সাংবিধানিক সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসন

স্বাধীনতা-আন্দোলনের আদিযুগ থেকেই জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে গণতন্ত্রভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনই হবে ভারতের লক্ষ্য। স্বায়ত্তশাসনের দাবি তাঁরা অবশ্য গোড়াতেই দাবি করেছিলেন। তাঁদের মত ছিল যে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ধীরে ধীরে, অনেক স্তর পেরিয়ে। তাঁদের রাজনৈতিক দাবিও ছিল অত্যন্ত পরিমিত। যুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁরা চেয়েছিলেন যে আইনসভাগুলির বিস্তার ও সংস্কার সাধন করে ভারতীয়দের অধিকতর পরিমাণে সরকারী ক্ষমতার অংশ দেওয়া হোক। ১৮৬১-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের বলে যদিও কিছু বেসরকারী ব্যক্তি আইনসভাগুলিতে মনোনয়নের অধিকার পেয়েছিলেন, সরকারের অনুগ্রহে সেখানে সাধারণত জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ীরাই মনোনীত হতেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের নীতি ছিল সরকারের পদাঙ্কিত পথে চলা। ১৮৮৮ সালে লবণের উপর শুল্কের পরিমাণ যখন বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তখন বিনা দ্বিধায় তাঁরা সরকারকেই সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের বক্তৃতায় বিদ্রূপভরে এঁদের 'গিলাটি করা ফাঁকি', 'মহাড়ম্বর অসার' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হ'ত। এসবের ফলে জাতীয়তাবাদীরা দাবি জানিয়েছিলেন যে মনোনয়নের ভিত্তিতে নয়, আইনসভাগুলির সভ্যপদ লাভ করবে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা—নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাঁদের আরো দাবি হ'ল—আইনসভাগুলির ক্ষমতার সীমা বাড়াতে হবে এবং সভ্যদেরও ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজেট ও দৈনন্দিন শাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রশ্ন করার ও সমালোচনার অধিকার দিতে হবে।

জনসাধারণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে পুরনো ধারাগুলি বদলে সরকার নতুন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট প্রবর্তন করলেন ১৮৯২ সালে। এই আইনের বলে আইনসভাগুলিতে বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়ল—তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন, আইনে শুধু এই ব্যবস্থা রইল। বাজেট সম্পর্কে বলবার অধিকার সভ্যদের দেওয়া হল, ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হ'ল না। বলা বাহুল্য, এ আইন দেশের মানুষকে এতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারল না—তাঁদের মনে হ'ল এ আইনের মাধ্যমে তাঁদের দাবিগুলিকে যেন পরিহাসই করা হচ্ছে। আইনসভার সভ্যদের মধ্যে বেসরকারী নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, এবং বাজেটের উপর কর্তৃত্ব যাতে বেসরকারী ভারতীয় সভ্যদের হাতে থাকে তার জন্য এবার তাঁরা আন্দোলন শুরু করলেন। তবে তাঁদের গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিভূমি যাতে সম্প্রসারিত হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। তাঁদের দাবির তালিকায় সাধারণ মানুষের বা মহিলাদের ভোট দেবার অধিকার কোনো স্থান পায় নি। এ কথা মনে

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন, 1885
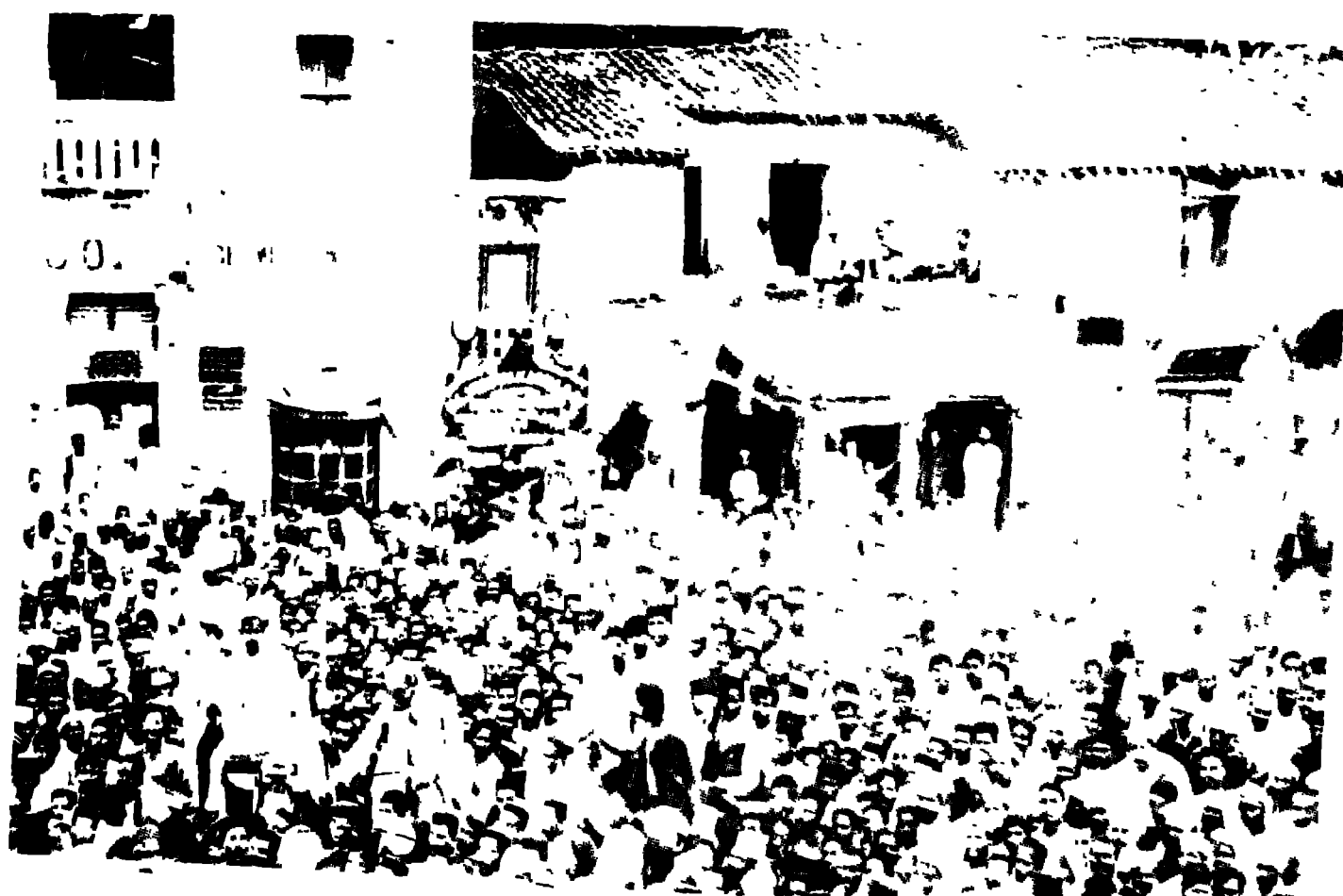
পুণেতে হোম রুল লীগের সমাবেশ

দাদাভাই নৌরজি

এম. জি. রাণাডে

বদরুদ্দিন তৈয়বজী

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে
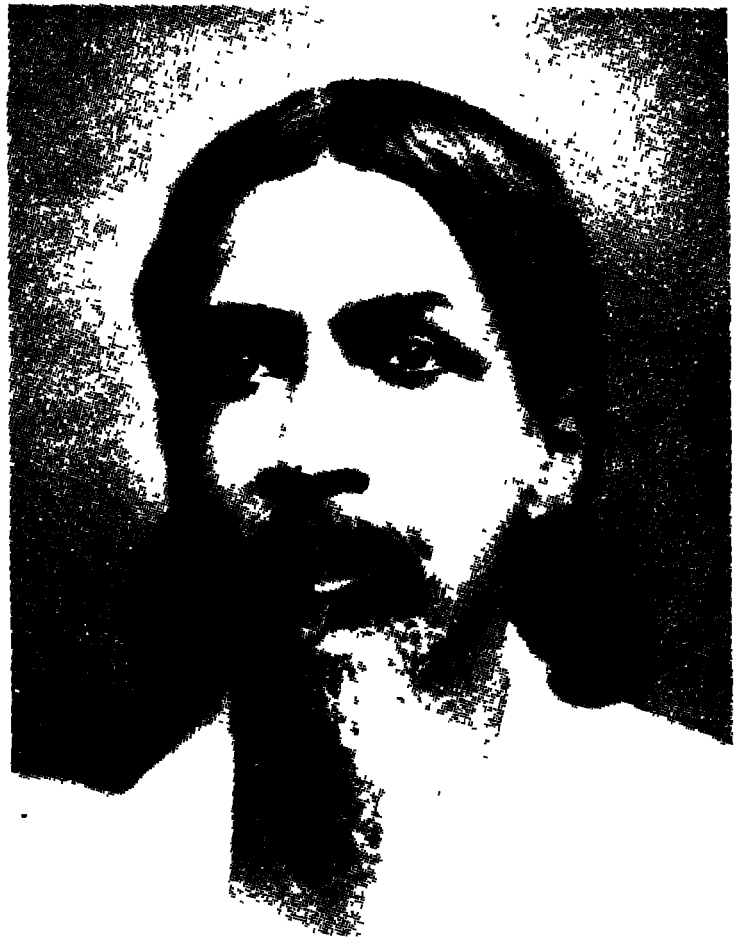
শ্রীঅরবিন্দ

লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল

Proclamation.

Whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

Dated this First day of November
in the year Nineteen Hundred
and Five and given under

বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ ঘোষণাপত্র

কলকাতায় এন.সি.ও.-র স্বেচ্ছাসেবকদের প্যারেড, 1921
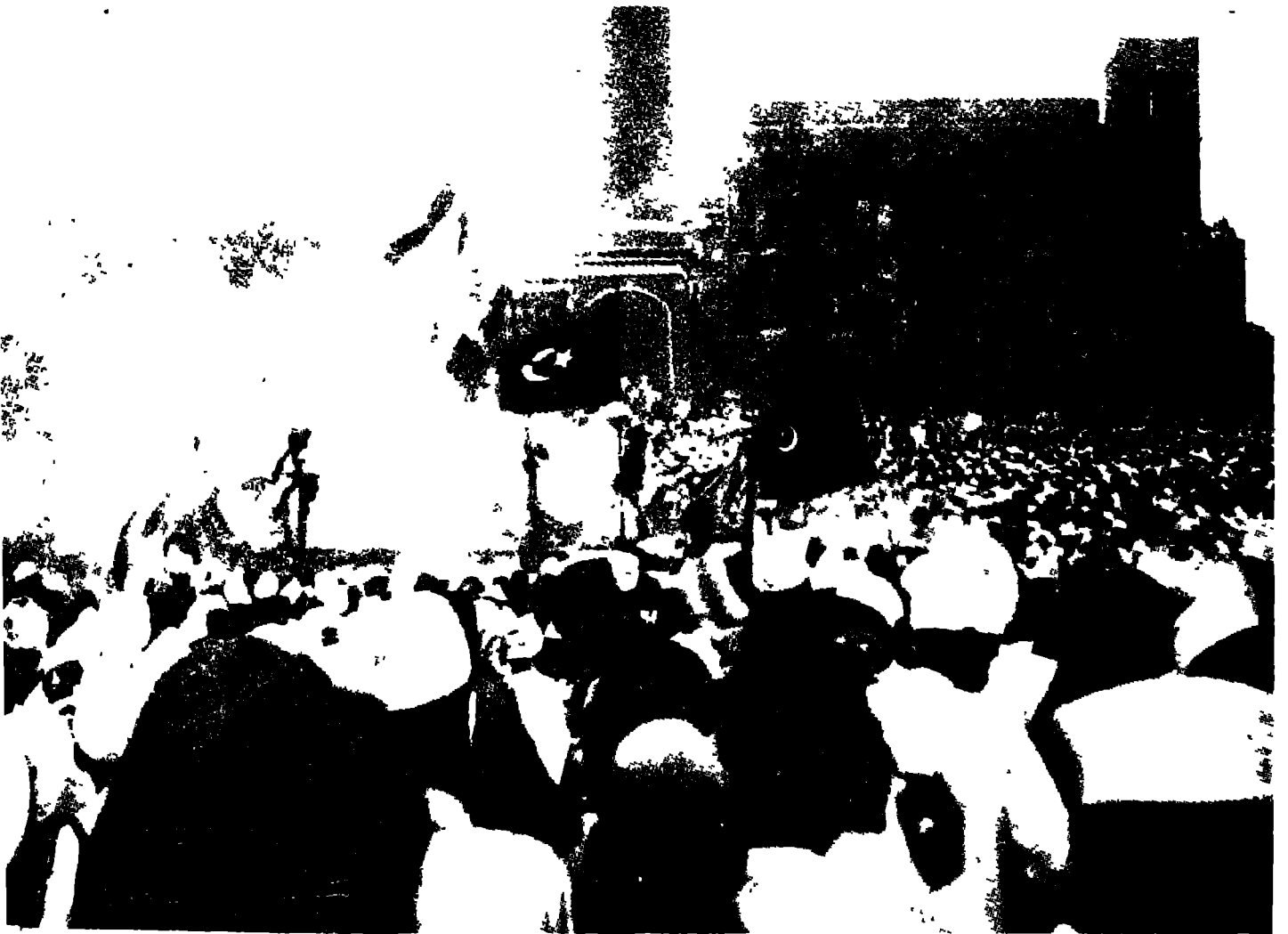
মুম্বাইয়ে বিদেশী কাপড় পোড়ানো হচ্ছে

মোহম্মদ আলী

সি. বিজয়রাঘব চেরিয়ার
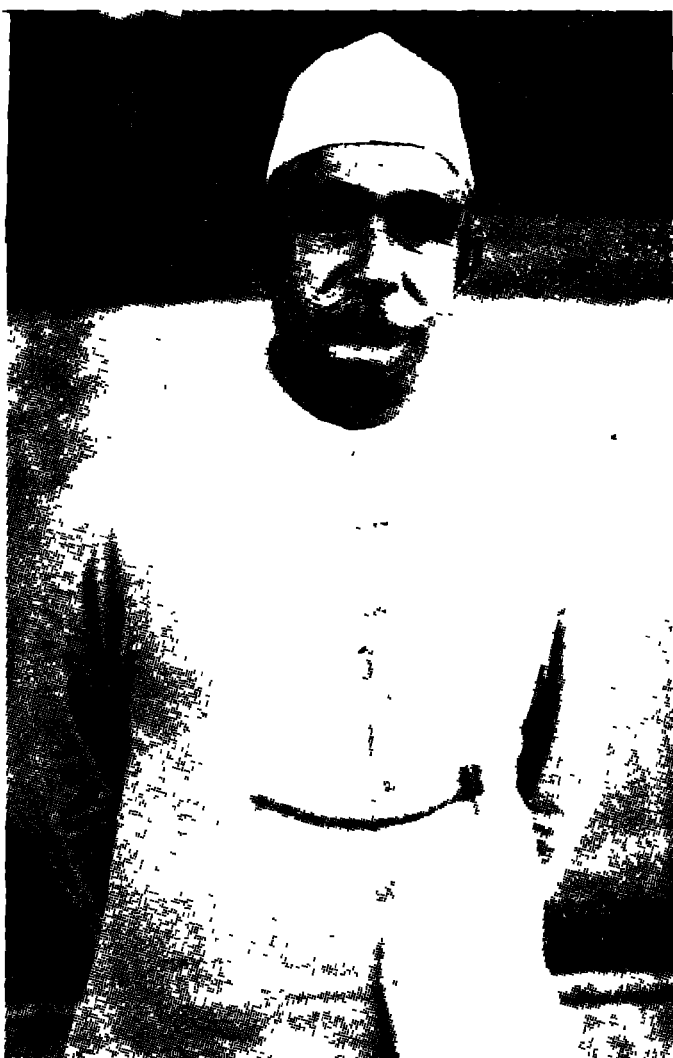
এম. এ. আনসারি

সরোজিনী নাইডু

চিত্তরঞ্জন দাস
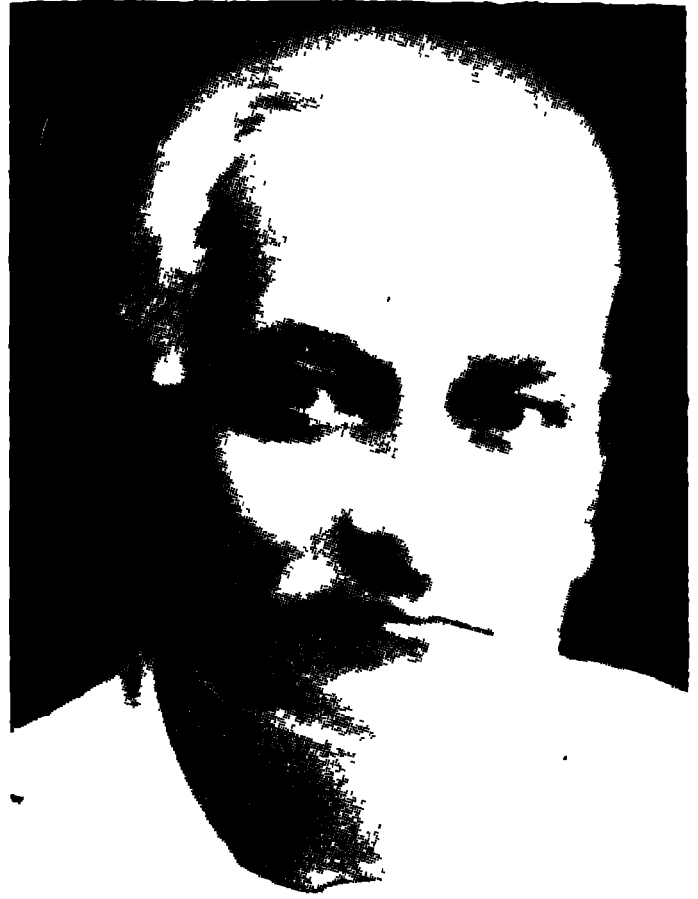
মতিলাল নেহরু

মোহম্মদ আলি জিন্না

মদনমোহন মালব্য

সরদার ভগৎ সিং

সূর্য সেন
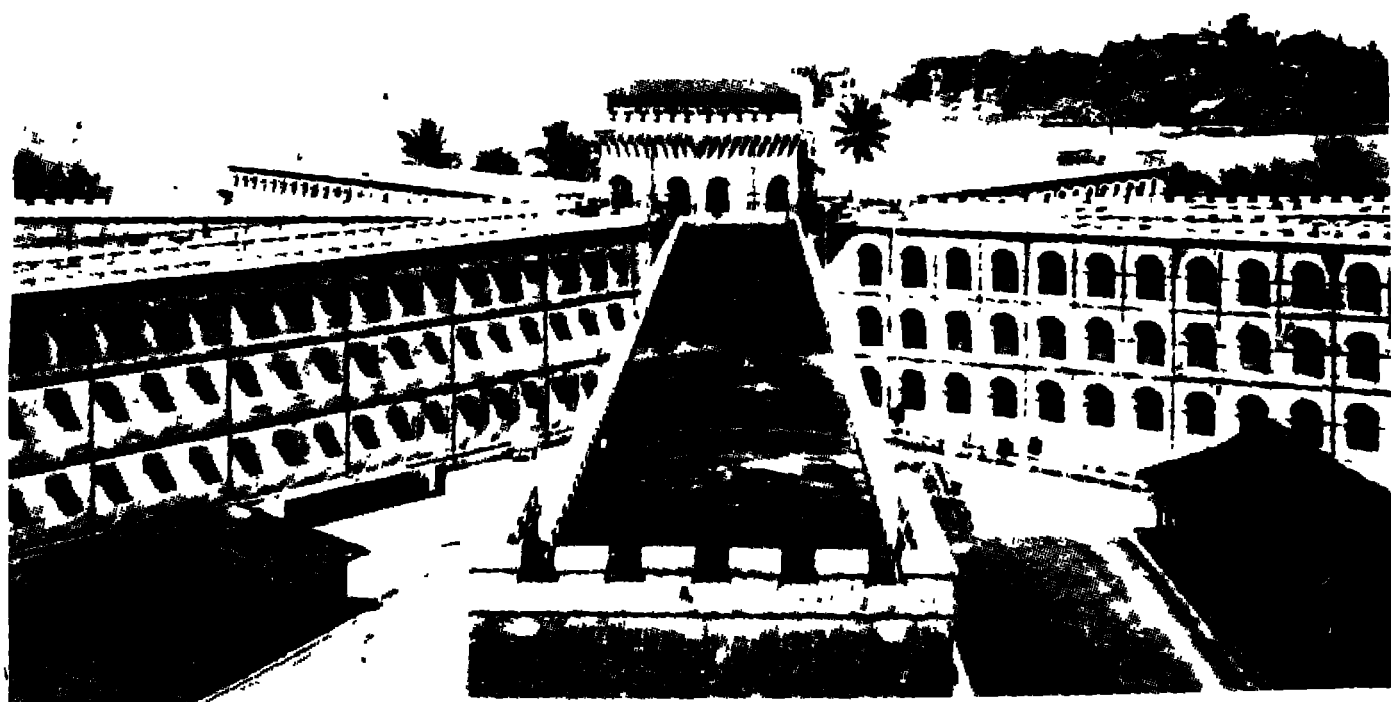
সেলুলার জেল, পোর্ট ব্লেয়ার

করা তাই অসংগত নয় যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা তাঁদের দাবির তালিকা রচনা করেছিলেন, সর্বসাধারণের কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিধি অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল নতুন শতাব্দীর সূচনার সময়। ছোটোখাটো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁরা এখন দাবি করলেন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে তাঁরা চাইলেন আইন প্রণয়ন ও আর্থিক ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব, এই উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলির মতোই, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এই দাবির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল নতুন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক লক্ষ্যের চেহারা। বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকেই—১৯০৪ সালে প্রথম এই দাবি উত্থাপন করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি; ১৯০৫-এ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণে গোপালকৃষ্ণ গোখেল এই দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এই দাবিকে প্রথম বাণীমূর্তি দান করলেন দাদাভাই নৌরজি—'স্বরাজ্য' কথাটির মাধ্যমে। এইসব তথ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আদিপর্বের জাতীয়তাবাদী ও তাঁদের উত্তরসূরীদের মধ্যে রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য ছিল না। প্রকৃত পার্থক্য ছিল দুটি ক্ষেত্রে। এক, নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে; দুই, মুক্তি সংগ্রাম কোন কোন সামাজিক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে সংগঠিত হবে তাই নিয়ে। সহজ করে বললে, আদি জাতীয়তাবাদী ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের গন্তব্য ছিল একই, কিন্তু পথ ছিল ভিন্ন।

রাজনৈতিক মত ও পথ

আদি জাতীয়তাবাদীরা মডারেট বা মধ্যপন্থী আখ্যা অর্জন করেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির জন্য। এই পদ্ধতিকে সংক্ষেপে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন বলে বর্ণনা করা যায়। এ আন্দোলন ছিল সতর্ক, মন্থর—আইন বাঁচিয়ে, শৃঙ্খলা বজায় রেখে তবে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন ছিল এর লক্ষ্য। আন্দোলনের নেতাদের ধারণা ছিল যে তাঁদের প্রধান কর্তব্য জনসাধারণকে আধুনিক রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া এবং জাতীয় রাজনীতি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ জনমত সংগঠন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা কতকগুলি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এক হ'ল জনসভায় উচ্চাঙ্গ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বক্তৃতা ও বিবিধ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের দাবিকে রূপ দেওয়া, আর দ্বিতীয়, সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত সরকারের সমালোচনা করে যাওয়া। আর ছিল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এমন-কি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেও অসংখ্য প্রার্থনাপত্র বা আবেদনপত্র পেশ করা। তথ্য ও যুক্তিতে সমৃদ্ধ এই স্মারকপত্র ও আবেদনপত্রগুলি,

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, সরকারের উদ্দেশ্যেই লেখা হ'ত, এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল জনসাধারণকে সচেতন ও অবহিত করে তোলা। তরুণ গোখেলকে লেখা বিচারপতি রাণাডের একটি চিঠির মধ্যে এই উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। সরকারের কাছে পুনা সার্বজনিক সভা ১৮৯১ সালে সযত্নে লেখা একটি স্মারকপত্র পেশ করেছিলেন, সরকারের তরফ থেকে এর মাত্র দু-ছত্র জবাব এসেছিল। এর ফলে মনঃক্ষুণ্ণ গোখেলকে রাণাডে লিখেছিলেন :

> তুমি জান না আমাদের দেশের ইতিহাসে আমাদের স্থান কী। সরকারকে উদ্দেশ্য করে আমরা আবেদনপত্র পাঠাই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো সেগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে এসব বিষয়ে তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে পারে। কোনো ফলের আশা না রেখে, অনেক বছর ধরে এ কাজ আমাদের করে যেতে হবে। এটা বোঝা দরকার যে আমাদের দেশে এধরনের রাজনীতি সম্পূর্ণ নতুন।

দেশের লোকের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য আদি জাতীয়তাবাদীদের তো ছিলই উপরন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করে সংস্কার ও পরিবর্তনের পথ সুগম করতে। গোড়ার দিকে তাঁদের ধারণা ছিল ভারতে কী ঘটছে ব্রিটেনবাসীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তাই তাঁরা ভেবেছিলেন স্মারকপত্র ও আবেদনপত্র পাঠিয়ে ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়ে ব্রিটিশ জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারলে তাঁদের কাজের সুবিধা হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম সারির অনেক ভারতীয় নেতা ব্রিটেনে গিয়েছিলেন। এমন-কি, জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ কমিটি নামে একটি স্বতন্ত্র কমিটি ১৮৮৯ সালে গঠিত হয়েছিল। ১৮৯০-এ এই কমিটির উদ্যোগে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল 'ইণ্ডিয়া' নাম নিয়ে। দাদাভাই নৌরজি নিজে তাঁর জীবন ও সম্পদের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করলেন ব্রিটেনে—সে দেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবার ভার নিয়ে।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিতে আদি জাতীয়তাবাদীদের এই যে বিশ্বাস এর রূপটি সংকীর্ণ মনে হয় এই কারণে যে এই সীমিত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেও তাঁরা প্রকৃত কোনো সর্বভারতীয় বা অব্যাহত আন্দোলনের ধারা গড়ে তুলতে পারেন নি; যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছিল। সে শুধু সংবাদপত্রের মাধ্যমে। এই ব্যর্থতার একটি কারণ অবশ্য ছিল—সে কারণ অর্থ দৈন্য। ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা জমিদারেরা জাতীয় আন্দোলনের এই পর্বে কোনো অর্থ সাহায্য করেন নি, প্রায় সব রাজনৈতিক নেতাকেই নিজের অকিঞ্চিৎকর আয়ের ওপর নির্ভর করতে হ'ত। শিক্ষক হিসেবে সামান্য যা আয় করতেন তারই ওপর নির্ভর করতেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে; তিলককে আইনের ছাত্রদের জন্য প্রাইভেট কোচিং ক্লাস খুলতে হয়েছিল। এই অর্থ

দৈন্য দিয়ে এ কথাও বোধহয় কিছুটা বোঝা যায়, এই পর্বে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কেন এতটা দুই স্বাধীন বৃত্তিনির্ভর শ্রেণীর—আইনজীবী ও সাংবাদিকের—হাতে ছিল।

জনসাধারণের ভূমিকা

উপরের আলোচনার জের টেনে এ কথা বলা যেতে পারে যে সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডীর ওপর নির্ভর করে থাকাই ছিল আদিপর্বের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা। সর্বসাধারণের কাছে এ আন্দোলনের আহ্বান তখনো পৌঁছায় নি। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ শুধু এর ডাকে তখন সাড়া দিতে শুরু করেছে। বিশেষত আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং মাত্র কয়েকজন ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের মধ্যে।

জনসাধারণের উপর রাজনৈতিক আস্থা আন্দোলনের নেতারা তখনো স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁদের তখনো ধারণা ছিল, দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র ও যোগ্যতা আধুনিক রাজনীতির উপযোগী নয়; পৃথিবীর প্রচণ্ডতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে নেই। সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করার পথে অন্তরায় কী কী তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গোখলে যা বলেছিলেন তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য : "অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্ত আমাদের দেশ। অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পুরনো চিন্তা, পুরনো আবেগকে আঁকড়ে রয়েছে সজোরে। তার সবরকম পরিবর্তনেরই বিরোধী এ কথা বললে কিছু বলা হয় না, পরিবর্তন কী তাই তারা জানে না।"

এ ধারণা কিন্তু মধ্যপন্থী নেতাদের শুধু একটি গভীর ভ্রান্তিরই পরিচয় বহন করে। সাধারণ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পশ্চাৎপরতাই শুধু তাঁদের চোখে পড়েছিল, তাঁরা বুঝতে পারেন নি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুচিরস্থায়ী সংগ্রামে যে বীরত্ব, যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন তা দিতে পারে শুধু সাধারণ মানুষ। তাঁদের এ ধারণা ছিল না যে তাঁদের রাজনৈতিক দাবির পিছনে প্রকৃত শক্তি সঞ্চার করতে পারে একমাত্র দেশের জনতা। আর তাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পশ্চাৎপরতা চিরস্থায়ী নয়; তাদের সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে পারলেই এই পশ্চাৎপরতার মালিন্য ধুয়ে ফেলা যায়। তাঁদের বরং ধারণা ছিল, বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজকে যদি একটা জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, শুধু তা হলেই দেশের সাধারণ মানুষকে চরমপন্থী সংগ্রামের পথে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাঁরা এ কথা বোঝেন নি যে একমাত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। তাঁরা নিজেরা দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন বলে তাদের সম্পর্কে এই ছিল আদি জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও ছিল তাই নিরপেক্ষ। তাঁদের মধ্যপন্থা অবলম্বনের কারণও এই। জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করতে চান নি বা পারেন নি

বলেই তাঁদের মনে হয়েছিল এ দেশের মাটি থেকে বিদেশীর শাসনের মূল উৎপাটিত করার সময় তখনো হয় নি; সরকারী দমননীতির সম্ভাবনাও তাঁদের নিরস্ত রেখেছিল। গোখলের বক্তব্যের মধ্যে এই মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট : "তুমি জান না সরকারের ক্ষমতার উৎস কী প্রচণ্ড। তোমার প্রস্তাব অনুসরণ করে কংগ্রেস যদি কিছু করতে যায়, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সরকারের পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।"

এই মনোভাবের ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থীদের সঙ্গে পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদীদের পার্থক্য। পরবর্তী যুগের নেতাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল জনসাধারণের ওপর, বিশ্বাস ছিল তাদের সংগ্রাম করার ক্ষমতায়। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের যে পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল চরমপন্থী গণসংগ্রামের পথ। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সরকারের ক্ষমতা নেই এ সংগ্রামের 'কণ্ঠরোধ' করার; বরং জনসাধারণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদে তাদের সংকল্পকে আরো দুর্জয় করে তুলবে এ সংগ্রাম।

তবে এই আদিপর্বের জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিভূমি অপরিসর ছিল বলে তাঁদের লক্ষ্যও সংকীর্ণ ছিল এ কথা মনে করা ভুল হবে। শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁরা চেয়েছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের দাবিকে সমর্থন করতে, দেশের মিলিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে।

জাতীয় আন্দোলন ও সরকারের মনোভাব

বলা বাহুল্য, গোড়া থেকেই জাতীয়তাবাদী শক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ছিল বিরূপ। ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করে ভারতীয় প্রেস যখন জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তার করছিল, সরকার তখন ১৮৭৮ সালে তার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হল, রাজপ্রতিনিধি ডাফ্‌রিন তখন তাকে আদৌ সুনজরে দেখেন নি। কংগ্রেস আন্দোলনের দৃষ্টি যাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য হিউম-এর কাছে ডাফ্‌রিন প্রস্তাব রেখেছিলেন কংগ্রেস যাতে রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে সামাজিক সমস্যার দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়।* কংগ্রেস নেতারা অবশ্য এই পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি হন নি।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরূপতা প্রথমে খুব প্রকাশ্য ছিল না।

---

* ডাফ্‌রিনের পরামর্শেই কংগ্রেস সামাজিক দিক থেকে রাজনৈতিক দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন, এই ধারণা বহুপ্রচলিত। এই ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন একান্ত প্রয়োজন। ১৮৯৮-এ একটি বইয়ের ভূমিকায় ডব্লু. সি. ব্যানার্জি প্রথম এই মত প্রচার করেন এবং পরবর্তী লেখকেরা এই মতই অনুসরণ করেছেন। ডাফ্‌রিনের ব্যক্তিগত লেখার সংগ্রহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে এই মত প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ডব্লু. সি. ব্যানার্জির ক্ষীয়মান স্মৃতির জন্য এই ভ্রান্তির সৃষ্টি।

তাঁদের আশা ছিল কংগ্রেসের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু রাজনীতি-সচেতন ভারতীয় শুধু পণ্ডিত-সুলভ আলোচনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখবেন। জাতীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে দীপ্তিমান, তাঁদের আইন সভায় আসন দিয়ে বা বিচারবিভাগ বা অন্যান্য শাসন বিভাগে মোটা মাইনের চাকুরি দিয়ে নিজেদের দলে আনবার চেষ্টা করতেও সরকার কুণ্ঠিত ছিলেন না। কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সমিতি এবং জাতীয়তাবাদী কর্মী ও সংবাদপত্রগুলির কর্মধারার মধ্যে দিয়ে এ কথা অবশ্য অদূর ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হয়েছিল যে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের ধারণা খুবই সীমিত ও ভ্রান্ত। সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে শুরু করেছিল; একই উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাধারণের উপযোগী প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। অসংখ্য জনসভার মাধ্যমেও জাতীয়তাবাদীরা চেষ্টা করছিলেন তাঁদের বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে—যদিও এ গণজাগরণের জন্য এই প্রচেষ্টা ব্রিটিশের কাছে ছিল রাজদ্রোহের সামিল। একই প্রচেষ্টা রূপায়িত হচ্ছিল অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে—সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ, তার শোষণের বীভৎস মুখ উদঘাটিত হচ্ছিল জনসাধারণের কাছে। এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। জর্জ হ্যামিল্টন, যিনি ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, ১৯০০ সালে অভিযোগ করেছিলেন দাদাভাই নৌরজির কাছে; "আপনি প্রচার করেন যে ব্রিটিশ শাসনের আপনি বিশ্বস্ত সমর্থক। অথচ সে শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে অবস্থা, যে ফলাফলের উদ্ভব হয়েছে তাকে তীব্রভাবে নিন্দা করতে আপনি কুণ্ঠিত নন।" এরও আগে, ১৮৮৬ সালে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ডাফ্‌রিন লিখেছিলেন, "এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সংবাদপত্রগুলি যারা পড়ে তাদের দৃঢ় ধারণা জন্মাবে, আমরা সমগ্র মানবজাতির এবং বিশেষ করে ভারতবাসীর শত্রু।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরূপতার প্রকাশভঙ্গী পালটে গিয়েছিল এই সময়ে। কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের এইবার তাঁরা প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করতে শুরু করলেন। জাতীয়তাবাদীদের কখনো 'নেমকহারাম বাবু', কখনো 'রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণ', আবার কখনো 'হিংস্র দুর্বৃত্তের দল' বলে তাঁদের নামে কুৎসা রটাতে লাগলেন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা। কংগ্রেসকে বর্ণনা করা হতে লাগল 'দেশদ্রোহ সৃষ্টির কারখানা বলে'। কংগ্রেসকর্মীদের সম্পর্কে বলা হল যে 'তারা চাকুরি না পেয়ে বা আইনের ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়ে' আন্দোলনে নেমেছেন; তাঁরা আর কারো নয়, শুধু নিজেদেরই প্রতিনিধি। ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় ১৮৮৭ সালে ডাফ্‌রিনের একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায়। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে কংগ্রেস "দেশের জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধি।" জর্জ হ্যামিল্টন কংগ্রেস নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন; তাঁর মতে নেতাদের চরিত্র দুমুখো আর

দেশদ্রোহের বিষে পূর্ণ। দাদাভাই নৌরজি ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করে দেওয়ায় হ্যামিল্টন তাঁর ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে অত্যন্ত নিচু স্তরের কুৎসা রটাতেও তাঁর দ্বিধা হয় নি। তিনি প্রচার করে দিয়েছিলেন যে দাদাভাই-এর বুদ্ধিবিবেচনা গোড়ার দিকে হয়তো কিছু ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডে বাস করার ফলে, বিশেষত উদারপন্থী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্রিটিশ নেতাদের সংসর্গে এসে তার অপমৃত্যু ঘটেছে। ১৯০০ সালে, ভারতে ভাইসরয় হিসেবে থাকার সময়, কার্জন ঘোষণা করেছিলেন, "কংগ্রেসের অবস্থা টলমল, তার পতন নিশ্চিত। ভারতে যতদিন আছি ততদিন আমার অন্যতম উচ্চাশা এই যে কংগ্রেস যাতে শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তার জন্য চেষ্টা করে যাব।" ব্রিটিশপক্ষের কিছু প্রচারক কংগ্রেসের নামে এ অভিযোগ পর্যন্ত করেছিলেন যে তাঁরা রাশিয়ার টাকা খান।

এই অবস্থায়—ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষেধক হিসেবে—ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চাইলেন 'বিভাজন ও শাসনে'র (divide and rule) নীতিকে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে। তাঁরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ যত বাড়বে, তাঁদের সমাপ্তির দিন ততই আসবে ঘনিয়ে। ১৮৯৭ সালে ভাইসরয় এলগিনের কাছে জর্জ হ্যামিল্টন লিখেছিলেন, "আমাদের রাজত্বের বিরুদ্ধে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জনমত যেভাবে বেড়ে উঠছে, তাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশঙ্কিত বোধ করছি।" কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতিষেধক হিসেবে রাজকর্মচারীরা তাই সৈয়দ আহমদ খান, রাজা শিবপ্রসাদ প্রমুখ ব্রিটিশ অনুগতদের সক্রিয় সমর্থন জানাতে শুরু করলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতেও সযত্ন হলেন তাঁরা। সরকারী বিভাগে চাকুরির প্রশ্নকে উপলক্ষ করে তাঁরা চাইলেন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করতে। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশের নীতি ছিল অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের দমন করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো; ১৮৭০-এর পরে কিন্তু তাঁদের চেষ্টা হল এই দুই শ্রেণীর মুসলমানদের কী করে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী করে তোলা যায়। সরকারী চাকুরি প্রশ্ন ছাড়া হিন্দী ও উর্দু ভাষার সঙ্গে জড়িত মানসিকতাকেও তাঁরা ব্যবহার করলেন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে উত্তেজিত করার কাজে। গোঁড়া হিন্দুরা 'গোসংরক্ষণের' যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাকেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হল। 'গোসংরক্ষণ' আন্দোলন সম্পর্কে কিম্বার্লি (ইনি ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) ভাইসরয় ল্যান্সডাউনকে ১৮৯৩-এর ২৫ অগাস্ট যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে ব্রিটিশের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট : "এই আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যেকোনো ধরনের ঐক্য অসম্ভব হয়ে উঠবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি সংগঠনের জন্য কংগ্রেস যে প্রচেষ্টা শুরু করেছে তার মূলে আঘাত করবে" এই আন্দোলন।

'বিভাজন ও শাসনে'র নীতি ব্রিটিশ শুধু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার জন্যই প্রয়োগ করেন নি, অন্যত্রও তা ব্যবহার করেছিলেন। নব্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলিকে উত্তেজিত করে, এক প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশকে ক্ষেপিয়ে তুলে, আর জাতি ও সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিরোধের বীজ রোপণ করে 'শাসন ও বিভাজনে'র চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। জাতীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা বেশি রক্ষণশীল বা মধ্যপন্থী ছিলেন, তাঁদের প্রতি আপাত বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি, তাঁদের আশা ছিল এভাবে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি করে তোলা যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকগুলিতে তাঁরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশান ও অন্যান্য পুরনো প্রতিষ্ঠানের নেতাদের দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে 'চরমপন্থী' কংগ্রেস নেতাদের এক বিরোধী পক্ষ দাঁড় করানো যায়। ১৮৯০-এর দশকে এই নীতি আবার এক নতুন মোড় নিল। এবার চেষ্টা করা হতে লাগল ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, বিচারপতি রাণাডে, গোখলে প্রমুখ প্রবীণ উদারপন্থী ও দাদাভাই নৌরজি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ চরমপন্থীদের মধ্যে কী করে বিভেদ ঘটানো যায়। ১৯০৫-এর কিছু পরে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে যখন মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল, তখন ব্রিটিশের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সংকল্প হ'ল এই দুই দলের মধ্যে স্থায়ী ভাঙন ধরানোর।

তাঁদের শাসননীতির মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'নরম' ও 'গরমে'র সুরও বরাবরই বজায় রেখেছিলেন; তাঁদের এক দিকে ছিল সুখদাক্ষিণ্যের অভয়, অন্য দিকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংহারমূর্তি। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থী ছিলেন তাঁদের নিরস্ত করা হয়েছিল নানা ধরনের অনুগ্রহ দেখিয়ে : সিভিল সার্ভিসে যোগদানের বয়স কম করা হয়েছিল, অন্যান্য সরকারী চাকুরি ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের সুযোগসুবিধা গিয়েছিল অনেক বেড়ে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মপরিধি বাড়িয়ে দিয়ে, কিংবা ১৮৯২-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টের মতো আইন প্রবর্তন করেও মধ্যপন্থীদের বশে রাখতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। অন্য ক্ষেত্রে তাঁদের নীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত; সে নীতি অত্যাচারের, ভয় দেখানোর নীতি। ভারতবাসীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় এলগিন ১৮৯৮ সালে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "অসির সাহায্যে আমরা ভারত জয় করেছি, অসি দিয়েই তাকে শাসন করব।" আমরা আগেই দেখেছি, পশ্চিম ভারতে তিলক ও অন্যান্য সংবাদপত্রসেবীদের গ্রেপ্তার করে সরকার কি ভাবে সবলে জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। ১৮৯৮-তে একাধিক আইনও পাস হ্ল যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করে পুলিশ এবং শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

জাতীয় অভ্যুত্থানের মূল কারণ যে শিক্ষার প্রসার—এ ধারণা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনেকদিন ধরেই ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক উদারনৈতিক ভাবধারা যাতে প্রসারলাভ

করতে না পারে তার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবার সচেষ্ট হলেন। ভাইসরয়ের কাছে ১৮৯৯ সালে জর্জ হ্যামিল্টন যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তাতে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে "শিক্ষা, শিক্ষা সংগঠন ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের মুঠি আরো শক্ত করতে হবে।" এই উদ্দেশ্যে এডুকেশন অ্যাক্ট প্রবর্তিত হল ১৯০৩ সালে। শিক্ষকদের ওপর যাতে কড়া নজর রাখা যায় তার জন্য ব্যবস্থা হল যে সরকারী পরিদর্শকেরা প্রত্যেক স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে সরকার আরো একটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধীনে যেসব শিক্ষায়তন ছিল সরকার এখন থেকে তাদের সাহায্য করতে শুরু করলেন। এর উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষ যে আধুনিক শিক্ষব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যুক্তিনির্ভর, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, তার কণ্ঠরোধ করে সরকার চাইছিলেন ধর্ম ও গোঁড়া নৈতিকতার ভিত্তিতে এক নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সুমহান ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও অভিপ্রায়ের দিক থেকে এ ব্যবস্থা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল : এ শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা না পেত সামনে তাকাবার প্রেরণা, না পেত আধুনিক প্রাণের স্পন্দন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশের এই নীতি থেকে তাদের সাম্রাজ্যবাদের একটা দিক খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বচ্ছভাবে বোঝা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রগতিমূলক যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সামাজিক গোঁড়ামি বা প্রাচীন মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের আগের বিদ্বেষী মনোভাব সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিল এইসময়, কারণ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাঠামোয় খুব ভালোভাবে খাপ খাওয়ানো যেত যে কোনো সামাজিক ও মূল্যবোধের গোঁড়ামিকে। তাঁদের ভয় ছিল শুধু আধুনিক চিন্তাধারার প্রসারকে কেন্দ্র করে।

আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আদি জাতীয়তাবাদীদের স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁদের অনেক উত্তরসূরী মন্তব্য করেছেন যে বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। শাসনতান্ত্রিক যে সব সংস্কারের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার মধ্যে শুধু কয়েকটি মাত্র তাঁরা সরকারকে দিয়ে প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন শুধু ঘৃণা ও বিদ্রূপ। লাজপত রায় পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে লিখেছিলেন, "কুড়ি বছর ধরে যে আন্দোলন তাঁরা করেছিলেন সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সুবিচার আদায়ের

জন্য তা প্রায় বিফলই হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন রুটি, পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো। তাঁদের আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ উদার হন নি, বরং হয়ে উঠেছিলেন আরো প্রতিক্রিয়াশীল, আরো অত্যাচারী। এ আন্দোলনের ডাক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় নি, অনেক আশা নিয়ে যাঁরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বরং তাঁদের অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতিকে সমালোচকেরা ব্যঙ্গ করেছেন "ভীরু এবং উদাসীন" বলে, এবং তার কারণও আছে। সংগ্রামী মনোভাবের চেয়ে সন্ন্যাসী ও ভিখারীর মনোভাবই ছিল এঁদের প্রবল, যা চাইতেন তার জন্য শুধু প্রার্থনা বা আবেদন করাতেই এঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে, অধিকাংশ নেতাকেই কোনো আত্মত্যাগ করতে হয় নি, বা বিশেষ ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হয় নি। তাঁদের সীমিত কর্মসূচীর লক্ষ্যও ছিল শুধু দেশীয় ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ সুগম করা। ভারতের অগ্রগতির আর কোনো পথ তাঁদের চোখে পড়ে নি বলে সাধারণ মানুষকে তাঁরা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে পারেন নি; রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দীপিত করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।

সুতরাং সমালোচকেরা যখন বলেন যে আদি জাতীয়তাবাদীদের প্রকৃত সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমিত তখন সে সমালোচনার যাথার্থ্য মেনে নিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই, ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের রাজনীতির ধারাও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে উঠেছিল। সংস্কার-আন্দোলনের সীমিত ক্ষেত্রেও তাঁরা সারা দেশ জুড়ে কোনো জাগরণ আনতে পারেন নি; দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁদের উপর আস্থা হারিয়েছিল; আর আগেই বলা হয়েছে, তাঁদের রাজনৈতিক প্রচার বা সংগঠন—কোনোটিই সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। ১৯০৫-এর আগেই তাঁদের আন্দোলনের সমস্ত গতিশীলতা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তবু, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এ কথা মনে করা ভ্রান্ত হবে যে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের অবদান কিছুই ছিল না। যদি কল্পনা করতে চেষ্টা করি কী দুস্তর বাধা পেরিয়ে তাঁদের অগ্রসর হতে হয়েছে, তবেই তাঁদের প্রচেষ্টার সার্থকতা আমাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। তাঁদের প্রথম পদক্ষেপের ওপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্থকতার যুগ; একমাত্র তখনই তাঁদের আন্দোলনের ধারা ইতিহাসের বিচারে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। ভারতের রাজনীতিতে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন; তাঁদের যুগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতির অগ্রদূত।

যে সামাজিক ক্ষেত্রে আদি জাতীয়তাবাদীরা নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এঁদের মধ্যে ব্যাপক রাজনীতি চেতনার উদ্‌বোধন ঘটিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদীরা, এ বোধের

সঞ্চার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যে তাঁরা এক জাতি—তাঁরা ভারতীয়। সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যেও এ বোধ বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁদের সকলেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ যে একসূত্রে গাঁথা, সাম্রাজ্যবাদই যে তাঁদের একমাত্র শত্রু—এই চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এক জাতীয়ত্ববোধে। সাধারণের মধ্যে তাঁরা প্রচার করেছিলেন গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার আদর্শ। যে যুগে শাসকেরা প্রচার করতেন যে 'সহৃদয় স্বৈরতন্ত্র' বা 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র'ই ভারতীয়দের উপযোগী একমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা, ঠিক সেই যুগেই কংগ্রেস এবং সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয়দের দীক্ষা দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের মন্ত্রে। তাঁদের উদ্যোগে অসংখ্য জাতীয়তাবাদী কর্মী আধুনিক রাজনীতিকলায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, দেশের সাধারণ মানুষ পরিচিত হতে পেরেছিলেন আধুনিক রাজনীতির তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সঙ্গে।

তাঁদের আর-এক উল্লেখযোগ্য অবদান এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাঁরাই প্রথম নির্মম সমালোচক। তাঁরাই দেখিয়েছিলেন যে এ দেশের প্রত্যেকটি গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারায় মধ্যপন্থী হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের দুরবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করেছিলেন তাঁরা—দেখিয়েছিলেন বিদেশী শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য এ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা।

যে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর। জনসাধারণ যতদিন মনে করে যে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের কল্যাণকামী এবং তার স্থায়িত্ব তাদের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, ততদিনই সে রাষ্ট্রক্ষমতা নিরাপদ। তাদের শুভেচ্ছাই যে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি। আদি জাতীয়তাবাদীদের সাফল্য এইখানে; তাঁদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শাসনের এই নৈতিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের সুফল বা সদভিপ্রায়ে সাধারণ মানুষের আর কোনো আস্থা ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উদঘাটন বিক্ষুব্ধ চিন্তার জগতে একটি প্রাথমিক দায়িত্ব পূরণ করেছিল। চিন্তার জগৎ থেকে এ আলোড়ন রাজনৈতিক জগতেও ছড়িয়ে পড়বে, এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তী যুগের সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তিভূমি ছিল অনেক প্রশস্ত; তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল অনেক বেশি চরম, সে সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন সাধারণ মানুষ, গণ-আন্দোলনের উদ্দীপনা সে সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছিল। তবু, যে ভুলকে অতিক্রম করে পরবর্তী যুগের সংগ্রাম সংগঠন করা সম্ভব হয়েছিল সে ভুল সংশোধনের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন আদি জাতীয়তাবাদীরাই। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের উদ্যোগ ব্যাপকতর আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম অথচ অপরিহার্য পদক্ষেপ। ১৯০৫-এর ১২ জানুয়ারি ডি. ই. ওয়াচাকে একটি চিঠিতে দাদাভাই নৌরজি লিখেছিলেন :

কংগ্রেসের নামে এ কথা রটেছে যে সে মন্থর, গতিময়তার কোনো স্পন্দন তার মধ্যে নেই। নতুন যুগের মানুষেরা তার প্রতি তাই অসন্তুষ্ট, অসহিষ্ণু। কিন্তু এই অসহিষ্ণু মনোভাবকেই কংগ্রেসী উদ্যোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল বলা যেতে পারে—এ তার বিবর্তন ও অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে। (আমাদের যা দায়িত্ব) তা হ'ল প্রয়োজনীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা—সে বিপ্লব অহিংসই হোক বা সহিংসই হোক। বিপ্লব কী রূপ নেবে তা নির্ভর করবে ব্রিটিশ সরকারের বিচক্ষণতা বা বিচক্ষণহীনতার উপর এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ কী ভূমিকা নেয় তার ওপর।

১৮৫৮ থেকে ১৯০৫—এ যুগ ছিল জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের যুগ। আদি জাতীয়তাবাদীরা সে ভিত্তি সযত্নেই স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবোধ কোনো সংকীর্ণ আবেগ বা চকিত উত্তেজনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য কোনো বিমূর্ত আকর্ষণ বা তমসাচ্ছন্ন অতীতপ্রিয়তার ওপরও তাঁদের নির্ভর করতে হয় নি। তাঁদের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত বাস্তব ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে, যার মধ্যে দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ দেশের মানুষ ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে প্রধান স্বার্থের দ্বন্দ্ব কোন্‌খানে। এর ফলেই তাঁদের পক্ষে সর্বোপযোগী একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগে, দেশের মানুষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

তাঁদের অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আদি জাতীয়তাবাদীদের অবদান তাই অনস্বীকার্য। তাঁদের উদ্যোগকে ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগের আন্দোলন সমৃদ্ধতর হয়েছিল। আধুনিক ভারতের নির্মাতা বলে যাঁদের মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদীদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। জাতীয় আন্দোলনের এই পথিকৃৎদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধ্যপন্থীদের অন্যতম শেষ মহান প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে লিখেছিলেন :

> আমাদের ভুললে চলবে না যে দেশের অগ্রগতি এখন যে স্তরে আছে তাতে আমাদের সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। নিরন্তর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে দুঃসহ নিরাশার গ্লানি। ভাগ্যবিধাতা মুক্তি সংগ্রামে আমাদের এই স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কাজ আমরা যখন শেষ করতে পারব, আমাদের দায়িত্বেরও তখন সমাপ্তি হবে। ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁরা দেশকে সেবা করবেন তাঁদের সফল সাধনা দিয়ে; আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে দেশমাতৃকার আরতি করেই আমরা তৃপ্ত হব; কঠিন হলেও এই উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাব যে আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উগ্র স্বাদেশিকতার যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশের মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ, জাতীয় নেতাদের সংস্কার-আন্দোলন—কিছুই ব্রিটিশ শাসকদের বিচলিত করতে পারে নি। ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা ছিল অব্যাহত। দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যুগে কী ঘটছিল তা একবার দেখা দরকার। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ না পেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা ক্রমশ সরকারী চাকুরি বা আইনব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আবার বেশি উদ্যোগী তাঁদের ঝোঁক ছিল সাংবাদিকতার প্রতি। কিন্তু সরকারী চাকুরির ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত—১৯০৩ সালে সারা ভারতে মাত্র ১৬,০০০ ভারতীয় কর্মচারী ছিলেন যাঁদের মাইনে ৭৫ টাকার বেশি। আইনের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল কম, আর সাংবাদিকতা তখনো খুব অনিশ্চিত পেশা। ডিগ্রীধারীদের চেয়ে আবার সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে—মূল সমস্যা তাদের কেন্দ্র করেই। চাকুরির 'যোগ্যতাহীন' এই যুবকদের মধ্যেই হতাশার ভাব সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে অসন্তোষের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল সম্পন্ন পল্লীজীবী এবং সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও, বিক্ষোভের তরঙ্গ স্পর্শ করেছিল শ্রমিক-শ্রেণীকেও। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল অচিরেই। মধ্যপন্থীদের সংস্কার-আন্দোলন মানুষের মনে আর কোনো সাড়া জাগাতে পারছিল না; তাঁদের জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটছিল নতুন এক শ্রেণীর নেতার। তাঁদের দাবি ছিল আরো চরম, তাঁদের জাতীয়তাবাদের চরিত্রও ছিল আরো উগ্র। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা 'চরমপন্থী' বলে পরিচিত। এতদিন মধ্যপন্থীরা নির্ভর করেছিলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর, চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে দিলেন ব্যাপকতর সামাজিক পরিধিতে—নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ, ছাত্রসম্প্রদায়, এমন-কি, মজুর ও কৃষকদের কাছেও তাঁদের ডাক পৌঁছল।

বাংলাদেশে রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাষ্ট্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুংকার প্রমুখ নেতা এই যুগের নতুন চিন্তার দিক্‌দর্শক। দেশমাতৃকার বন্দনায় বঙ্কিম যে স্তুতি রচনা করেন, তার সূচনা 'বন্দে মাতর্‌ম' দিয়ে। এই 'বন্দে মাতরম্‌'

ধ্বনির মধ্যে দিয়েই পরবর্তীকালে স্বদেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের আহ্বান সারা দেশে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য বালগঙ্গাধর তিলক, যিনি পরবর্তীকালে 'লোকমান্য' আখ্যা অর্জন করেন। তিলকের জন্ম ১৮৬৬-তে। রোমের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বের হবার পর দেশের সেবায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। সি. জি. আগারকর-এর সহযোগিতায় তিনি একই সঙ্গে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। একটি ইংরেজিতে, তার নাম 'মারাঠা'; মারাঠীতে প্রকাশিত পত্রিকাটি হ'ল 'কেশরী'। সাংবাদিকতায় তিলকের দক্ষতা ছিল অসাধারণ; সে দক্ষতাকে তিনি কাজে লাগালেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে দলমত সংগঠিত করতে।

১৮৮৯ থেকে তিলক এককভাবে 'কেশরী' সম্পাদনা করতে শুরু করেন। দেশের লোকের কাছে এই পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বার্তা পৌঁছে দিতেন তিলক, তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন নির্ভীক, আত্মত্যাগী হতে, গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসী হতে। জাতীয়তার আদর্শ প্রচারের আর-এক মাধ্যম হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঐতিহ্যাশ্রিত সামাজিক নানা উৎসব। গণেশ উৎসবে তিনি অংশ গ্রহণ তো করতেনই, তাঁর উদ্যোগে একটি নতুন উৎসব—শিবাজী উৎসব—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তিলকের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল কৃষকদের মধ্যেও। তাদের তিনিই প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলেন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদির ফলে ফলন বন্ধ হলে সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে। ভাইসরয় এলগিন যখন ভারতীয় মিলে তৈরি কাপড়ের ওপর শুল্ক বসালেন, তিলক তখন ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিলেন; স্বদেশীর আহ্বান ধ্বনিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে।

ক্রমশ ব্রিটিশ সরকারের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে উঠলেন তিলক। ১৮৯৭-তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল রাজদ্রোহের অপরাধে। বিচারের সময় তিনি অনমনীয় রইলেন, আত্মগর্ব অটুট রেখে গ্রহণ করলেন আঠারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সারা দেশে বিদ্যুৎচমকের শিহরণ এনে দিল, সারা দেশ নতুন জাতীয়তাবাদের প্রতীকরূপে তাঁকে স্বীকার করে নিল

জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বের অভিজ্ঞতা নেতাদের মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও নতুন আত্মসম্মানবোধ এনে দিয়েছিল। তাঁদের মনে এ প্রত্যয় এল যে দেশ পরিচালনার, দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার যোগ্যতা তাঁদেরও আছে। স্বামী বিবেকানন্দ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠেও এই সুর ধ্বনিত : "পৃথিবীতে পাপ যদি কিছু থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ। সবরকমের দুর্বলতাকে বর্জন করো, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতাই মৃত্যু...তোমার শরীর, মন, আধ্যাত্মবোধকে যা দুর্বল করে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করো। দুর্বলতা জীবনহীনতার, অসত্যের লক্ষণ।"

অতীতকে ঘিরে ভারতবাসীর যত দিবাস্বপ্ন সব ভেঙে দিয়ে বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম

তাদের দৃষ্টির মোড় সামনের দিকে ফিরিয়েছেন যাতে শক্তি দিয়ে, কল্পনা দিয়ে ভবিষ্যতের সৌধ গড়ে তোলা যায়। ব্যাকুল আর্তিতে তিনি বলেছিলেন, "হা ঈশ্বর, অতীতের অনাদি বন্ধন থেকে আমাদের দেশ কবে মুক্ত হবে?" নিজে ধর্মনেতা হয়েও বিবেকানন্দ বার বার ঘোষণা করেছেন যে শূন্য উদরে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়; বলেছেন, মানবকল্যাণই হবে ধর্মের অন্যতম মন্ত্র।

বাইরের জগতেও এই সময় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। সে হাওয়া এ দেশে নিয়ে এল চরমপন্থী জাতীয় উন্মাদনার জোয়ার। ১৮৬৮-র পরে এক শক্তিশালী, আধুনিক জাতিরূপে জাপানের অভ্যুত্থান ভারতবাসীর মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করল। পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে জাপান গড়ে ওঠে শিল্পোন্নত, শক্তিশালী সামরিক দেশ হিসেবে। তার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বাধ্যতামূলক; তার শাসনব্যবস্থা ছিল দক্ষ এবং আধুনিক। এশিয়ার অনুন্নত দেশও যে পশ্চিমের সাহায্য ছাড়া, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় চরম উন্নতির শিখরে উঠতে পারে, জাপান নিঃসন্দেহে তার প্রমাণ। ভারতের কাছে জাপান হয়ে উঠল অনুকরণীয় আদর্শ। ১৮৯৬-এ ইথিওপিয়ার হাতে ইটালির এবং ১৯০৫-এ জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে শ্বেত জাতি কোনো অংশে অন্যান্য জাতির চেয়ে বড়ো নয়। আর আয়ার্ল্যাণ্ড, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং চীনে সাধারণ মানুষ যে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেছিল, তার বাণীও শুনেছিল ভারতবাসী। এ দেশের মানুষও বুঝতে পারল যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে নিজের আদর্শের জন্য প্রচণ্ডতম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা যায়।

লোকমান্য তিলক ছাড়া আর যাঁরা চরমপন্থী আন্দোলনের পথিকৃৎ তাঁরা হলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপত রায়। তাঁরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার তিনটি দিক। প্রথম, তাঁরা চাইলেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবাসীরা যে হীন অবস্থায় পতিত হয়েছে তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে, তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। মুক্তির পথ ক্ষুরধারের মতো, মহান আত্মত্যাগ, অপরিসীম ধৈর্য তার পাথেয়। চরমপন্থী নেতাদের প্রযত্ন তাই ছিল সাহস, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করা।

দ্বিতীয়, বিদেশীদের 'সহৃদয় সাহায্য' ছাড়া ভারতবাসী কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, এ হীনম্মন্যতা চরমপন্থীদের ছিল না। বিদেশী শাসনকে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন, স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের ধ্রুব লক্ষ্য। তৃতীয়, তাঁরা জানতেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে গণ-আন্দোলনের পথ ধরে; জনসাধারণের ওপর তাঁদের গভীর আস্থা ছিল।

'বঙ্গভঙ্গ'-বিরোধী আন্দোলন

জাতীয় আন্দোলনের এই পর্বে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঘটল কার্জনের আবির্ভাব; চরমপন্থী

আলোড়নের প্রবাহেও জোয়ার এল। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঠিক যে-যে বিষয়ে এ দেশবাসীরা স্পর্শকাতর ছিলেন, সেগুলিই হ'ল কার্জনের শাসননীতির আক্রমণের লক্ষ্য। স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে তিনি হাত দিলেন। ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পেল। শিক্ষা সংস্কারের নাম করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়ে সেগুলিতে সরকারী কর্তৃত্বের বোঝা আরো বেশি করে চাপানো হ'ল। এর আর-একটি দৃষ্টান্ত কার্জন-কর্তৃক নিযুক্ত ইউনিভার্সিটি কমিশন। কমিশন সরকারের কাছে একাধিক সুপারিশ পেশ করেন। সুপারিশগুলি হ'ল, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দিতে হবে, আইনের ক্লাস বন্ধ করতে হবে, এবং ছাত্রদের ফি অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যদের ওপরও তাঁদের কোপদৃষ্টি পড়েছিল। তাঁরা ঠিক করলেন সিনেট-সদস্যদের কার্যকাল ও সংখ্যা কমিয়ে আনা দরকার। কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার সুপারিশ করেন। মোট কথা, সমস্ত শিক্ষাবিভাগ যাতে সম্পূর্ণভাবে সরকারী কবলে আসে তার ব্যবস্থা করাই ছিল কমিশনের সুপারিশের উদ্দেশ্য।

ভারতীয়দের পক্ষে এইসব সুপারিশের তাৎপর্য ছিল গভীর। আইনের ক্লাস তুলে দেওয়া বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি বন্ধ করে দেওয়ার অর্থই হ'ল অনেক ভারতীয়ের চাকুরি হারানো এবং উচ্চশিক্ষার, বিশেষ করে আইন ব্যবসায়ের পথ বন্ধ হওয়া। আর শিক্ষালাভের সুযোগ আর্থিক দিক দিয়ে দুর্মূল্য হবার ফলে নিম্নবিত্তদের পক্ষে কেরানী বা শিক্ষক হিসেবে চাকুরি লাভের পথও বন্ধ হ'ল। এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী নেতারা কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতা করলেন, কিন্তু কার্জনকে বিশেষ টলানো গেল না। সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন এই সময় তাই জোরালো হয়ে উঠল।

লিটনের দমননীতিকে অনুসরণ করে, গণসমালোচনার হাত থেকে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের বাঁচাবার জন্য, কার্জন প্রবর্তন করলেন ইণ্ডিয়ান অফিসিয়াল সিক্রেটস (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) অ্যাক্ট। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদে আরো মুখর হয়ে উঠল। বৈদেশিক খাতে ভারতের অর্থসম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন কার্জন; দিল্লির দরবারে এবং তিব্বত অভিযানেও তিনি ভারতের অর্থ জলের মতো ব্যয় করেন। আর সেইজন্যই ভূমি রাজস্বের হার কমাতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল।

অবশেষে এল বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের পিছনে সরকারী দোহাই এই যে রাজ্য হিসেবে বাংলাদেশ এত বড়ো যে দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য চালানো অসম্ভব; তা ছাড়া তা আসামের উন্নতিরও অন্তরায়। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে প্রকাশ্য নীতির মধ্যেও সরকার কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে পারেন নি। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য "কলকাতার অনিষ্টকর প্রভাব থেকে" পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিকে

বাঁচানো এবং "মুসলমানেরা যাতে আগের চেয়ে সুবিচার পায়" তার ব্যবস্থা করা। তবে বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল চরমপন্থী বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনকে খর্ব করা। ফ্রেজার ও রিজলি তো চেয়েছিলেন চরমপন্থী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরকে বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিতে।

বলা বাহুল্য, সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে কংগ্রেস বর্ণনা করলেন সম্পূর্ণরূপে "গ্রহণের অযোগ্য" বলে। সরকারের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হল : এক, হয় বাংলাদেশকে কোনো গভর্নরের শাসনাধীনে রাখা হোক, না হয়, বাংলাদেশকে অক্ষত রেখে ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পৃথক করা হোক। বাঙালিবাবুর বাগাড়ম্বর বলে কার্জন প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারের অবিচল নীতির ফলে সন্দেহের কোনো অবকাশই রইল না যে পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের কণ্ঠরোধ করাই বঙ্গভঙ্গের অভীপ্সিত রাজনৈতিক লক্ষ্য।

১৯০৪-এ পূর্ব বাংলা পরিদর্শনের সময় কার্জন তাঁর প্রথম পরিকল্পনাটিকে বিস্তৃত রূপ দিলেন। ঠিক হ'ল যে বাংলাদেশ থেকে পনেরোটি জেলা বাদ দেওয়া হবে, ফলে তার জনসংখ্যা কমে গিয়ে ৫ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়াবে। এর উদ্দেশ্যও স্পষ্ট রিজলির লেখায় : "বাংলার শক্তি তার একতায়। তাকে ভাগ করা হলে তার শক্তিকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল তাকে বিচ্ছিন্ন করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের উৎসকে দুর্বল করে ফেলা।" পরবর্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জও স্বীকার করেন যে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের পিছনে "অন্য সব কারণের চেয়ে জোরালো কারণ ছিল বাঙালিকে আঘাত হানার ইচ্ছা।"

সরকারী সিদ্ধান্তকে বাঙালি মেনে কিন্তু নেয় নি। তাদের স্পর্শকাতরতায়, তাদের গর্বে যে আঘাত পড়ল, তাতে প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হ'ল সকল স্তরের বাঙালি। জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দরিদ্র নগরবাসী—আর সবার উপরে ছাত্রসম্প্রদায়—সবাই সম্মিলিত হলেন প্রতিবাদ-আন্দোলনের ছত্রতলে।

সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনিচ্ছুক সম্মতি লাভ করে কার্জন তার পরিকল্পনাটি প্রকাশ করলেন ১৯০৫ সালে। কিন্তু যে ঐক্যের মূল তিনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তা ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠল। সকল শ্রেণীর বাঙালি, সকল স্তরের জাতীয় নেতারা ঝাঁপ দিলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে। আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে, কিন্তু অচিরেই বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থীরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। শহরাঞ্চল এ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হলেও ক্রমে পল্লী অঞ্চলেও তার আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

আন্দোলনের সূচনা কলকাতায়, ১৯০৫-এর ৭ আগস্ট। টাউন হলের এক বিশাল

জনসভায় প্রস্তাব নেওয়া হ'ল যে ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করা হবে। বাংলাদেশ যেদিন ভাগ হ'ল সেই ১৬ অক্টোবর সারা দেশে উদ্‌যাপিত হ'ল শোকদিবস হিসেবে। সারা দেশে পালিত হ'ল সাধারণ ধর্মঘট। দলে দলে লোক উপবাসী দেহে, নগ্নপদে মিছিল বের করলেন, গঙ্গাসলিলে করলেন পুণ্যাবগাহন। কলকাতার আকাশ-বাতাস শ্লোগানে, স্বদেশী গানে আলোড়িত হয়ে উঠল। হিন্দু মুসলমানের হাতে, মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে পরালেন সকল বাঙালির ভ্রাতৃত্ববন্ধনের রাখি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে একই সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠল বাঙালির ক্রোধ ও বেদনা—তাঁর গানের প্রতিটি মূর্ছনায় স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম বাঙ্ময় হয়ে উঠল। আত্মত্যাগ ও আত্মোৎস্বর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি প্রতিরোধের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।

স্বদেশপ্রেমের আগুন অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল বরিশাল, মৈমনসিংহের মতো মফঃস্বল জেলাগুলিতেও। বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে গোখেল বললেন, বঙ্গভঙ্গ "নিষ্ঠুর অবিচারেরই" পরিচায়ক; "বর্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসনের নিকৃষ্টতম দিকগুলি বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমলাতন্ত্র মনে করে বিচক্ষণতায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ জনমতের প্রতি তার ঘৃণা অপরিসীম, মানুষের সযত্নলালিত আবেগ-অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।...শাসিতের স্বার্থের চেয়ে শাসনযন্ত্রের স্বার্থ তার কাছে অনেক বড়ো।"

প্রতিরোধ ও সংগ্রামে পদ্ধতি হিসেবে স্বদেশী এবং বয়কটের আদর্শ হয়তো সম্পূর্ণ অভিনব ছিল না। ১৯০৫-এর আগে আমেরিকা, আয়র্ল্যাণ্ড ও চীনের সংগ্রামীরাও এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এর আগে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতিকল্পে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশীভাবাদর্শ প্রচার করেছিলেন মহারাষ্ট্রের গোপালরাও দেশমুখ, জি. ভি. যোশী ও এম. জি. রানাডে এবং বাংলাদেশের রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুর পরিবার। ১৮৭০-এর দশকে ব্রিটিশ জনমতকে জাগ্রত করার উপায় হিসেবে ভোলানাথ চন্দ্র 'বয়কটের' উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। ১৮৯৬-এ তিলক পরিচালনা করেন একটি সার্বিক বয়কট আন্দোলন। এই ধারণা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বয়কট দুইই অপরিহার্য, একটি ছাড়া অপরটির সাফল্য অসম্ভব।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার স্বদেশী ও বয়কটের ভাবাদর্শকে এক নতুন তাৎপর্য দান করল। এর ফলে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের অন্তর্বিরোধও প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। বোম্বাই-এর মধ্যপন্থীরা 'স্বদেশী' ভাবধারাকে স্বাগত জানালেও 'বয়কটের' বিরোধী ছিলেন। গোখেল-এর মতে 'বয়কট' কথাটির মধ্যে "অপরের প্রতি প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা" নিহিত, 'বয়কট' "নিজেদের মধ্যেই অপ্রয়োজনীয় অন্তর্বিরোধ জাগিয়ে তোলে।" সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মনে করতেন যে শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'বয়কট' হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর আশা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ হলে 'বয়কট'ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। লাজপত রায় অবশ্য তাঁর চরমপন্থী দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত দিতে পারলে তবেই ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের কাছে বয়কটের তাৎপর্য ছিল আরো অনেক বেশি ব্যাপক। তাঁরা জানতেন বয়কটের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্রিটিশ উৎপাদন কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারের ওপর আঘাত হানা সম্ভব, তেমনি সম্ভব সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলা। আর 'স্বরাজ' লাভের লক্ষ্যে পৌঁছতে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার শিক্ষা দেশবাসীর পক্ষে অপরিহার্য, তারও মাধ্যম বয়কট। সাময়িকভাবে হলেও, এই অন্তর্বিরোধ অবশ্য ভেসে গেল বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে। বিক্ষিপ্ত, ভীরু যত শক্তি ছিল সকলকে সংহত করে এ আন্দোলন এক শক্তিশালী স্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল। যেসব কংগ্রেসী নেতা এতদিন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনসভা সংগঠনে কিংবা সংবাদপত্রে নিবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশের সুবিচারের আশায় দিন গুনছিলেন, তাঁদের বিশ্বাসের ভিত এতদিনে টলল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা। সংবাদপত্রগুলি সমালোচনায় নির্ভীকতর হয়ে উঠল। ছাত্ররা শিখল বিদ্রোহ করতে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের দিকে বাড়িয়ে দিল সহযোগিতার হাত। এ আন্দোলন প্রতিটি মানুষকে শেখালো কী করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয়। শেখালো দেশসেবীর সম্মান অর্জন করতে গেলে অত্যাচারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়হীন চিত্তে কি ভাবে লাঠির আঘাত, কারাবাস, এমন-কি, ফাঁসির মঞ্চ বরণ করতে হয়।

বঙ্গভঙ্গ ও সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মূর্ত হল বারাণসী অধিবেশনে। বাংলার আন্দোলনকে 'স্বদেশী' ও বয়কটের প্রতি কংগ্রেস পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে 'বয়কট' তাঁদের অনুমোদন না পেলেও, লাজপত রায়ের মত ছিল যে অন্য সকলেও বাংলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক। তিলক 'স্বদেশী' 'বয়কট' ও 'জাতীয় শিক্ষাগঠনের' (National Education) উপর জোর দিলেন, কারণ তাঁর মতে 'স্বরাজ'ই এদের প্রধান লক্ষ্য।

ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হাজার হাজার জনসভার মাধ্যমে 'স্বদেশী' ও 'বয়কটের' ডাক এই সময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকাশ্যভাবে শুরু হ'ল ব্রিটিশ পণ্যের বহ্ন্যুৎসব; যেসব দোকানে বিদেশী পণ্য বিক্রি হ'ত সেগুলিতে পিকেটিং শুরু করলেন রাজনৈতির স্বেচ্ছাসেবীরা। তার সঙ্গে স্বদেশী জিনিস উৎপাদন ও বিক্রিকে কেন্দ্র করে দেখা দিল তুমুল উৎসাহ। ময়রারা স্থির করল বিদেশী চিনি আর ব্যবহার করবে না। ধোপা প্রতিজ্ঞা করল বিদেশী কাপড় আর কাচবে না। বিদেশী উপকরণ দিয়ে পুজো করতে পুরোহিত হল নারাজ। দাক্ষিণাত্য ও বাংলার

মেয়েরা ভেঙে ফেলল বিদেশী চুড়ি আর কাচের বাসন। ছাত্রেরা বিদেশী কাগজের ব্যবহার ছেড়ে দিল। বিদেশী পণ্যের ব্যবসা করে এমন লোকের সংস্রব ত্যাগ করলেন ডাক্তার ও উকিলেরা। পিকেটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো হ'ল সমাজচ্যুত করার পুরনো প্রথাকেও। বরিশালের মতো কিছু কিছু জায়গায় পুলিশের শাস্তির ভয় অগ্রাহ্য করে ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় খুলে দিলেন বিদেশী লবণ ও বিদেশী কাপড়ের ভাণ্ডার; সেগুলি ধ্বংস করা হ'ল।

এ আন্দোলন কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও নিয়ে এল নতুন প্রেরণা। অসংখ্য স্বদেশী কাপড়ের মিল, দেশলাই ও সাবান, চীনা-মাটি ও চামড়া ইত্যাদি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল চারদিকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সময় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করলেন তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একটি স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সব রকম সরকারী বা বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র স্বদেশী চাঁদার ভিত্তিতে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি শিল্পমূলধন গড়ে তুললেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড়ো বড়ো জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠা করলেন একাধিক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি। স্বদেশী উদ্যোগে স্টীমার পরিবহন পর্যন্ত চালু হ'ল।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলন আনল এক নতুন প্রাণের জোয়ার। জন্ম নিল জাতীয়তাবোধের আবেগে-আদর্শে সিক্ত নতুন কবিতা, নতুন গদ্য, নতুন ধরনের সাংবাদিক রচনা। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস স্বদেশপ্রেমের যে গানগুলি রচনা করলেন, সাহিত্যের দরবারে তাদের চিরদিনের আসন পাতা রইল। আজও বাংলাদেশ সে গানে মুখরিত। রাজনৈতিক সাংবাদিকতার যে ঐতিহ্য স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল তার ফসল হ'ল মুক্তি, স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার আদর্শ।

'বয়কট' ও 'স্বদেশী' ভাবধারাকে পশ্চিম ভারতে বহন করে নিয়ে গেলেন তিলক। তাঁর পরিচালনায় পুনায় বিদেশী কাপড়ের এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব হ'ল। স্বদেশী বস্ত্র প্রচারিণী সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে একাধিক কোঅপারেটিভ ভাণ্ডার তিনি চালু করলেন। বোম্বাই-এর মিল মালিকদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন সস্তায় ধুতি সরবরাহ করার জন্য। তাঁরই উদ্যোগে পুনায় স্থাপিত হ'ল স্বদেশী উইভিং কোম্পানি। সুদূর পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ। অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাঞ্জাবও ছিল সরকারী আমদানি নীতির বলি। বিদেশ থেকে আনা চিনির পরিমাণ এখানে এত বেশি ছিল যে তার নিজস্ব ইক্ষু ও চিনি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। বিদেশী চিনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন তাই তীব্র হয়ে উঠল। রাওয়ালপিণ্ডির ব্যবসায়ীরা প্রতিজ্ঞা করল তারা আর বিদেশী চিনির ব্যবসা করবে না; মূলতানে মন্দিরের পূজারীরা সংকল্প নিল বিদেশী চিনিতে দেবতার নৈবেদ্য আর সাজানো হবে না। আস্তে আস্তে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল হরিদ্বার, দিল্লি, কাংড়া ও জম্মুতে। দিল্লিতে

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ হায়দর রেজা। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল সুদূর দক্ষিণেও। মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে তুতিকোরিন-এ স্বদেশী স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করলেন চিদাম্বরম্ পিল্লাই।

উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশ

ভারতবাসী জাতীয় শিক্ষায় স্বয়ং শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এই ছিল 'স্বদেশী'র মূল সুর। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখার্জি ১৮৯৮ সালে প্রথম তৈরি করেন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা। এতদিন ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ দেশের উপরে চালিয়েছিলেন তা ছিল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সে শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল না কোনো প্রাণের স্পর্শ। ভারত-সংস্কৃতি ও ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল পাঠ্য বিষয়গুলি; সেগুলি কণ্ঠস্থ করার নিরানন্দ দায়িত্ব ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করেই ব্রিটিশের শিক্ষাব্যবস্থা তৃপ্ত ছিল। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ার ফলে ছাত্রেরা না পেত শেখার আনন্দ, না পেত স্বাধীন চিন্তার বা সৃজনকর্মী রচনার প্রেরণা। জাতীয় শিক্ষার প্রথম পথনির্দেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় দুটি ঘটনা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। এক, কার্জনের ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট; আর দুই, কার্লাইল-এর সার্কুলার যাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছাত্ররা যেন রাজনৈতিক বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে না পারে।

এই দমননীতির ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯০৬-এ প্রতিষ্ঠিত হ'ল বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ। অরবিন্দ তার অধ্যক্ষ হলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে যথোপযুক্ত স্থান দেওয়া হ'ল, কিন্তু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হ'ল ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর। ন্যাশনাল কলেজের লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং শিল্পদ্যোগী রূপে গড়ে তোলা। তবে তার চেয়েও বড়ো লক্ষ্য ছিল তাদের স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বাধীনতার বিকাশোপযোগী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এর জন্য স্থির হ'ল যে ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলিই হবে শিক্ষার মুখ্য মাধ্যম। এতদিনের অনাদৃত প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল এই সময়ে। নেতারা বৃত্তি দিয়ে অনেক ছাত্রকে জাপানে পাঠালেন যাতে তারা প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতি লাভ করতে পারে। ক্রমে ক্রমে সারাদেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করলেন আত্মনির্ভরতা বা আত্মশক্তির মন্ত্র। পল্লীসমাজের সার্বিক পুনর্জাগরণ সে আত্মশক্তির উৎস। বরিশাল অঞ্চলে 'আত্মশক্তির' ভাবধারাকে স্বীয় কর্মোদ্যোগের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। নমঃশূদ্র প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের উপর যে সামাজিক

বিধিনিষেধ আরোপিত হয় তার বেড়া ভেঙে ফেলে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টায় অশ্বিনীকুমার ছিলেন উৎসর্গিতপ্রাণ। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পানাসক্তি প্রভৃতি নিন্দনীয় সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে তিনি শুরু করলেন অক্লান্ত সংগ্রাম।

তবে সাধারণভাবে দেখতে গেলে চরমপন্থীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক লেখেন, "জাতি হিসেবে আমরা পল্লবিত বৃক্ষ। স্বরাজ তার মূল কাণ্ড; 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' তার শাখা-প্রশাখা।"

স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য সীমিত ছিল না, লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পরিধিকে আরো প্রসারিত ক'রে, তাকে সার্বিকভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিরোধের রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শুধু ব্রিটিশ পণ্য বা স্কুলকলেজ 'বয়কট' করার মধ্যে যে আন্দোলন সীমিত ছিল, তা ছড়িয়ে পড়ল আইনআদালত, মিউনিসিপ্যালিটি এবং আইনসভায়—সরকারের সঙ্গে সকল সংস্রব বর্জন করার নেশায় উগ্র হয়ে উঠল আন্দোলনের গতি। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশের ভূয়ো মর্যাদার মূলে আঘাত দেওয়াই তাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গের পথ। ব্রিটিশ বাণিজ্যের শোষণলোলুপ মুখ যদি সংগঠিত অসহযোগিতা দিয়ে বন্ধ করা যায়, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারী হাত যদি পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তবেই তাদের শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দেওয়া সম্ভব।

কৃষক ও মজুর-শ্রেণীকে নিজেদের দলভুক্ত করে চরমপন্থীরা কংগ্রেসে আধিপত্য লাভের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন। জনসাধারণের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে; সূক্ষ্ম রাজনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে 'স্বদেশী'র মর্মকথা তাদের অনেক বেশি নাড়া দেয়। তারা তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিল 'স্বদেশী'র ডাকে। চরমপন্থী নেতারা যদি কৃষকদের আহ্বান করতেন 'খাজনাবন্ধে'র সংগ্রামে, যদি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রেরণা জোগাতেন, তা হলে আরো উৎসাহ নিয়ে তারা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করত। চরমপন্থী নেতারা সে পথ নেন নি। তা সত্ত্বেও আন্দোলনে কৃষক ও মজুর-শ্রেণীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিহারে চম্পারণের নীলচাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এই সময়ে। আসাম ও মৈমনসিংহেও জেগে উঠল তীব্র বিক্ষোভ। বরিশালের মুসলমান চাষীরা যে আন্দোলন শুরু করল তার পুরোভাগে রইলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাংলাদেশে শুরু হ'ল একের পর এক ধর্মঘট। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং ক্লাইভ জুট মিল্‌স-এ কাজের চাকা থেমে গেল। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল আরো নানা কারখানায় এবং প্রেসে। কলকাতা বন্দর অচল হয়ে রইল কিছুদিনের জন্য। বোম্বাই-এর শ্রমিকদের কাছে তিলক ধর্মঘটের ডাক দিলেন, তাঁর গ্রেপ্তারের পরে সেখানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মাদ্রাজে তুতিকোরিন কোরাল মিলে ধর্মঘট সফল করে তুললেন চিদাম্বরম পিল্লাই।

সংগ্রামের প্রধান দায়িত্ব অবশ্য পড়ল দেশের যুবসম্প্রদায়ের উপর। স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় তাদের উদ্দীপ্ত করে তুলল সন্ধ্যা, যুগান্তর, কেশরী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি। যৌবনের বেহিসাবী উন্মাদনায় দলে দলে তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামের জোয়ারে। এতদিন তীব্র নৈরাশ্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল যে ছাত্র, শিক্ষক বা কেরানীর দল, তারাই এখন বাংলার প্রতিটি শহরে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলল। মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে লাল সার্ট—এই সাজে সজ্জিত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সরকারী স্কুল, কলেজ এবং অফিস বর্জন করে বেরিয়ে এল; কণ্ঠে তাদের স্বদেশী গান আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দোকানে পিকেটিং এবং স্বদেশী পণ্য বিক্রির ব্যাপারে তারাই ছিল উদ্যোক্তা। সরকারী রোষের বলিও হ'ল তারাই। যেসব স্কুল এবং কলেজের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিল, সরকার তাদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অধিকারও তারা হারাল। তাদের ছাত্ররা হারাল সরকারী বৃত্তি বা সরকারী চাকুরি লাভের সুযোগ। আর সারা পূর্ব বাংলা এবং আসাম জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলেন সরকার। ছাত্রদের ভাগ্যে জুটল জরিমানা, বহিষ্কার, এমন-কি, নিদারুণ শারীরিক প্রহার। চোদ্দ বছরের অসহায় বালককে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বাধে নি। এ শাস্তি শুধু বাংলার ছেলেদের অদৃষ্টেই জোটে নি, সুদূর দক্ষিণে অমরাবতী এবং কোলাপুরে ছাত্রদের একই সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই দমননীতির অনিবার্য ফল ক্রোধ এবং সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মহিলারা পর্দা ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়ে এলেন মিছিলে যোগ দিতে, কিংবা পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করতে। মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনে কতটা সক্রিয় ছিলেন তার অন্য পরিচয় আরো অনেক পাওয়া যায়। বয়কটের চিন্তা যাঁদের মাথায় প্রথম আসে পাটনার লিয়াকৎ হোসেন তাঁদের অন্যতম। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ধর্মঘটের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। বরিশালের যে বৃহৎ সম্মেলন পুলিশ নির্মমভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। জমিদার এবং আইনজীবী হিসেবে খ্যাত আবদুল হালিম গজনাভি স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; ব্রিটেনে তৈরি চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করেন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগে অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন আবুল কালাম আজাদ। হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর এত যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল যে মুসলমানদের তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখেন। তবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হ'ল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা।

সরকারের নির্মম দমননীতি সংগ্রামের গতিকে রোধ করতে পারল না, বরং

বরিশাল সম্মেলনে পুলিশের নিষ্ঠুর বর্বরতা চরমপন্থীদের সংগ্রামের সংকল্পকে আরো উগ্র করে তুলল। ১৯০৬-এ কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হ'ল, তাতে দাদাভাই নৌরজী চরমপন্থীদের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করলেন; তিনি মেনে নিলেন যে "যুক্ত রাজ্য বা অন্যান্য উপনিবেশের অনুরূপ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজই" কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু চরমপন্থীরা স্বরাজ সম্পর্কে নিজেদের ব্যাখ্যাতেই আস্থা রাখতেন বেশি।

সরকারের দমননীতির ফলে সংগ্রামের উত্তেজনা এই সময়ে চরমে পৌঁছল। পাঞ্জাবের লাজপত রায় ও অজিত সিংকে পাঠানো হ'ল দ্বীপান্তরে, রাষ্ট্রবিরোধী রচনা প্রকাশের অপরাধে 'সন্ধ্যা' এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা দুটিকে দাঁড় করানো হ'ল বিচারের কাঠগড়ায়। সন্ধ্যার নির্ভীক সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বিচারাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করলেন। বিপিনচন্দ্র পালও এই সময় ছিলেন কারান্তরালে।

লাজপত রায়ের কারামুক্তি কিংবা আশু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আশ্বাসও এই পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারল না। দুটি কারণে তিলক ও অরবিন্দের নেতৃত্বাধীনে চরমপন্থীরা স্থির করলেন তাঁরা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করবেন। প্রথম কারণ কংগ্রেসের অধিবেশন পুনা থেকে সুরাটে স্থানান্তর। দ্বিতীয় কারণ, তিলকের প্রার্থিত্ব অগ্রাহ্য করে রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন। বয়কটের প্রস্তাব সম্পর্কে মধ্যপন্থীরা আবার যে মনোভাব গ্রহণ করলেন বারুদের স্তূপে তা স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। সুরাট কংগ্রেস শেষ হ'ল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিবাদমান যে দুই দলের সৃষ্টি হ'ল, স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে তা যথেষ্টভাবে ব্যাহত করল।

চরমপন্থী হলেও তিলক তখনো ছিলেন সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সমর্থক, কিন্তু অরবিন্দ গ্রহণ করলেন 'রাশিয়া'র পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয় আক্রমণাত্মক প্রতিরোধের নীতি। এ প্রতিরোধের চেহারা কী ছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় মজঃফরপুরের বোমা ছোঁড়ার ঘটনায়। মানিকতলায় সন্ত্রাসবাসীদের গোপন আস্তানা আবিষ্কার হওয়ার ফলেও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির চেহারা কিছুটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তিলক এবার এ রাজনীতিকে সমর্থন জানালেন কেশরীর মাধ্যমে, তিনি মেনে নিলেন যে "দেশের শাসকদের চরিত্র যদি হয় রুশ সরকারের মতো, তা হলে দেশের লোকের পক্ষেও রুশ পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।" এ সমর্থন সরকারের কাছে ছিল রাজদ্রোহের সামিল, ছ বছরের মেয়াদে তিলক দেশান্তরে মান্দালয় জেলে অবরুদ্ধ রইলেন। 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক পরাঞ্জাপের ভাগ্যে জুটল উনিশ মাসের কারাদণ্ড। বাংলাদেশের নয় জন রাজনৈতিক নেতাকে দেশান্তরে নির্বাসিত করা হ'ল। মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও হলেন কারারুদ্ধ। সরকারী দমননীতির নির্মম খড়্গ নেমে এল সংবাদপত্র, জনসভা, বৈপ্লবিক সমিতি—সবকিছুর ওপর। ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগ করে অরবিন্দ এই সময় পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ

করলেন, এবং রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মের পথ গ্রহণ করলেন। ফলে যে প্রকাশ্য সংগ্রামের উন্মাদনায় সারা দেশ এতদিন আলোড়িত ছিল, তার গতি সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চরমপন্থীরা সূচনা করেছিলেন এক গৌরবময় অধ্যায়ের। সংগ্রামের লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল স্বচ্ছ। জনসাধারণকে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন, সংগ্রামের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁরা টেনে আনতে পেরেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে এবং ছাত্রসম্প্রদায়কে। দেশের তরুণেরা, এমন-কি, মহিলারাও তাঁদের সংগ্রামী আহ্বানে সাড়া দেন। রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন অনেক অভিনব পদ্ধতি।

পুরনো অনেক ত্রুটি থেকে চরমপন্থীরাও অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। জনতার সংগ্রামকে সংঘটিত করার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে চরমপন্থীরা সামগ্রিক বিচারে ব্যর্থ হল। তাঁরাও সংগ্রামের আন্তরিক আহ্বানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি—শ্রমিক, চাষীদের কাছেও। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগের আদর্শ তাঁদের কাছেও শুধু ভাববিলাস হয়েই রইল। তাঁদের নেতৃত্বেও এমন কোনো সম্ভাবনাময় জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠল না যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়। তিলক প্রমুখ নেতারাও মনে করতেন যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি একমাত্র ধনতান্ত্রিক পথেই সম্ভব, তাঁদের দৃষ্টিও ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। চরমপন্থীরা তাঁদের পূর্বসূরী মধ্যপন্থীদের চেয়ে একটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপর ছিলেন। এ দেশ যে বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এ সত্যটি তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের ভাবাদর্শে ছিল উচ্চ বর্ণ এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব জাতীয় ঐক্যবোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস পরিণতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল, চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ রদ করা গেল না, বাংলাদেশ বিভক্তই রইল। বরং সরকারের দমননীতি ক্রমে আরো উগ্র, আরো চরম রূপ ধারণ করল।

দেশের বেপরোয়া তরুণ সমাজের মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন এতদিন ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের আগেই

চরমপন্থী নেতা তিলক তরুণদের মনে সন্ত্রাসবাদের বীজ রোপণ করেন। সন্ত্রাসমূলক রাজনীতি বিচ্ছিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই। ১৮৯৭ সালে পুনার দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে দুজন অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজকর্মচারী নিহত হল। পরবর্তীকালে, বিপ্লবের নতুন খসড়া রচনা করেন অরবিন্দ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবলীর সূচনা, দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে তা বিপ্লবের অদম্য স্পৃহা জাগিয়ে তুলল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে তাঁদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সংস্কার-আন্দোলন, এমন-কি, চরমপন্থী সংগ্রামেও তাঁদের আর কোনো আস্থা ছিল না; তাঁরা চাইলেন বাহুবলে ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে উৎখাত করতে। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে বরিশাল সম্মেলন যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, যুগান্তর পত্রিকা তখন—১৯০৬-এর ২২ এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে—আস্থা প্রকাশ করে লেখে : "দেশের মুক্তির উপায় দেশের লোকেরই হাতে। দেশের ৩০ কোটি মানুষ যদি তাদের ৬০ কোটি হাত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে তবেই বন্ধ হবে এ অত্যাচার। একমাত্র শক্তি দিয়েই শক্তির প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব।"

তরুণ সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু জনতার শক্তির উপর নির্ভর করে সারা দেশব্যাপী সহিংস বিপ্লব সংগঠন করার চিন্তা করেন নি। তাঁদের সঙ্গে মিল ছিল আইরিশ সন্ত্রাসবাদী এবং রুশ নিহিলিস্টদের। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শুধু অত্যাচারী ভারত-বিরোধী কিছু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে হত্যা করে শাসকসম্প্রদায়ের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করা। তাঁরা ভেবেছিলেন এর মাধ্যমে দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলে তাঁরা ব্রিটিশকে এ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করবেন। সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে এবং মহারাষ্ট্রে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। সন্ত্রাসমূলক রাজনীতিতে তরুণদের দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে তুলতে গেলে সব রকমের গোপনীয়তা রক্ষা করা ছিল অপরিহার্য। গুপ্ত সমিতিগুলির বাইরের চেহারা এমন ছিল যে তারা যেন সাধারণ শরীরচর্চার কেন্দ্র কিংবা সাধারণ ক্লাব। এই সমিতিগুলির মধ্যে কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার যুগান্তর এবং মহারাষ্ট্রে সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'মিত্র মেলা' বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠল। ভি. ডি. সাভারকরের দেশত্যাগের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর যে অভিনব ভারত সোসাইটি স্থাপন করলেন সারা পশ্চিম ভারত জুড়ে তার অনেকগুলি শাখা গড়ে উঠল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি সত্যি করে প্রথম আকৃষ্ট হ'ল মজঃফরপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে। মজঃফরপুরের জেলা-বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী যে বোমা ছুঁড়লেন, তার আঘাতে প্রাণ হারালেন দুই নির্দোষ মহিলা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন আর প্রফুল্ল চাকী আত্মসমর্পণের চেয়ে আত্মহত্যার পথই শ্রেয় বলে বেছে নিলেন।

আলিপুর আদালতে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন অরবিন্দ,

তাঁর ভাই বারীন এবং অন্যান্য অনেকে। মামলা চলার সময়েই জেলের মধ্যে সরকারী সাক্ষীকে হত্যা করলেন সন্ত্রাসবাদীরা; সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তল্লাসী করার এবং বিচারের কাঠগড়ায় তাঁদের দাঁড় করাবার ভার যেসব পুলিশ অফিসারের উপর পড়েছিল তাঁরাও একে একে নিহত হলেন। মামলার বিচারে অরবিন্দ ছাড়া পেলেন, কিন্তু তাঁর ভাই বারীন ঘোষ সহ অন্য চারজনকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হ'ল। অন্য কয়েকজনের অদৃষ্টে জুটল সুদীর্ঘ কারাবাস। ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করলেন। রাজসাক্ষীকে হত্যার অপরাধে সত্যেন বসু ও কানাই দত্তও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন।

নাসিক, পুনা এবং বোম্বাই বোমা তৈরির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সন্ত্রাসবাদীরা ভাইসরয়ের জীবননাশের চেষ্টা করলেন। এ ছাড়া একটি বিদায় সভায় নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হ'ল। এই ঘটনার কিছু আগে অমানুষিকভাবে ভারতীয় তরুণদের দ্বীপান্তর এবং ফাঁসি দেওয়ার প্রতিবাদে সাভারকরের এক অনুগামী এম. এল. ধিংরা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের পদস্থ কর্মচারী কার্জন-ওয়াইলিকে হত্যা করেন। তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগে তিনি লেখেন, "কি ভাবে মরতে হয় সে শিক্ষাই ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষা। আর সে শিক্ষা দেবার একমাত্র পথ হ'ল এককভাবে মৃত্যু বরণ করা।"

সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'ল মাদ্রাজেও। বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা মাদ্রাজবাসীদের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালল। চিদাম্বরম পিল্লাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে তুতিকোরিন এবং তিনেভেলিতে যে দাঙ্গা শুরু হ'ল তাতে বেপরোয়া জনতার ওপর গুলি চালাল পুলিশ। তিনেভেলিতে গুলি চালানোর আদেশ দিয়েছিলেন অ্যাশ; ভারতমঠ অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য বঞ্চি আয়ারের হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হ'ল। পলায়নে ব্যর্থ হয়ে আয়ার আত্মহত্যা করলেন বন্দুকের গুলিতে। তাঁর নয় জন সহকর্মী বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন।

এই সময়ে পাঞ্জাবেও একাধিক গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হয়। একের পর এক দুর্ভিক্ষ, জলকর ও ভূমি রাজস্বের ক্রমবর্ধমান হার—সব মিলিয়ে পাঞ্জাবে যে বিক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করে তোলে, তা গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক রূপ নেয়। পাঞ্জাবে খালগুলির সংলগ্ন অঞ্চলে যাঁরা বাস করেছিলেন তাঁরা সবসময় সন্ত্রস্ত থাকতেন কখন সরকার তাঁদের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করেন। এখানে বেগার খাটানোর প্রথা তখনো চালু; সাধারণ মানুষের মনে তীব্র অসন্তোষ জমে ওঠে। এই অসন্তোষকে আশ্রয় করে গুপ্ত সমিতিগুলি পাঞ্জাবে ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সময় যে আলোড়ন চলছিল তার প্রতিক্রিয়া পাঞ্জাবীদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলল। সিপাহী বিদ্রোহের অষ্টপঞ্চাশৎ বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক প্রচারকার্য শুরু হয় তাতে সৈন্যবাহিনীর শিখ

রেজিমেণ্টকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছিল।

ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রথম শুরু হ'ল লাহোরে। লাজপত রায়ের পাঞ্জাবী পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারী মামলাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিণ্ডিতেও শুরু হ'ল দাঙ্গা। অজিত সিং ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ। যোগ্য সহযোগী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন আগা হায়দর এবং সৈয়দ হায়দর রিজা-কে। লাজপত রায় এবং অজিত সিংকে দেশান্তরে নির্বাসিত করার ফলে এ আন্দোলনের গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলা এবং পাঞ্জাবের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন রাসবিহারী বসু। তিনি ছিলেন দেরাদুনে একজন সামান্য কেরানী। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯২১-র ১২ ডিসেম্বর যখন দিল্লিতে প্রবেশ করছেন তখন তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়া হয়। এই আক্রমণের দ্বারা সন্ত্রাসবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে একই সঙ্গে দমন ও সংস্কারের দ্বৈত নীতির মধ্যে দিয়ে শাসকবর্গের যে ভণ্ডামির প্রকাশ তা মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে যে বোমাটি ছোঁড়া হয়েছিল তা বাংলাদেশে তৈরি। রাসবিহারী বসুর লিবার্টি, যুগান্তর প্রভৃতি প্রচার পুস্তিকাগুলি ছিল ভারতীয় প্রেসের বিপ্লবী ঐতিহ্যের বাহক।

কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী নেতা বিদেশে পাড়ি দিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিপ্লবের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটেনবিরোধী দেশগুলির সাহায্য লাভ। তাঁরা ভেবেছিলেন এই দেশগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে গোপনে সেগুলি ভারতে পাঠাতে পারবেন তাঁদের সহকর্মীদের কাছে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ভি. ডি. সাভারকর, হরদয়াল প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁদের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন লণ্ডনেই। ইওরোপে যাঁরা বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাদাম কামা ও অজিত সিং-এর নাম উল্লেখ্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা যেমন উজ্জ্বল, তেমনই প্রেরণার উদ্দীপক। মৃত্যুভয় জয় করে অনুদ্বিগ্ন চিত্তে যে ভাবে তাঁরা বেপরোয়া কাজ আর দুঃসাহসী পরিকল্পনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতে দেশবাসীর মনে তাঁদের জন্য স্থায়ী আসন পাতা আছে। কিন্তু তাঁদের সকল আদর্শ সকল আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বীরোচিত হলেও তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল বিচ্ছিন্ন, কিছু লোকের জীবননাশের চেষ্টার মধ্যেও সীমিত। ফলে সাধারণ মানুষকে এ সংগ্রামের অংশীদার করে তোলা সম্ভব হয় নি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ক্ষমতার শীর্ষে, তার পক্ষে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা মোটেই কঠিন হয় নি। একের পর এক ষড়যন্ত্রের মামলা সাজিয়ে, কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে আর নির্মম আইনের আঘাতে সরকার সন্ত্রাসবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁদের দমননীতিতে শক্তি জুগিয়েছিল একাধিক নতুন আইন—

ইনসাইটমেণ্ট টু অফেনসেস অ্যাক্ট নামক সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইন, ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট, এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট এবং ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট। তা ছাড়া সন্ত্রাসবাদীদের নিজেদেরই কোনো সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল না। তাঁদের বিপ্লবের পথে চালিত করার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও গড়ে ওঠে নি। আগেই বলা হয়েছে, তাঁদের কর্মক্ষেত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে নি। তাঁদের বৈপ্লবিক কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরি ছিল; সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করে তাঁরা দলে টানতে পারেন নি। গুপ্ত সমিতিগুলিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের লোকদেরই আধিপত্য ছিল; চাষী বা শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থীরা তাঁদের সম্পূর্ণ বর্জন করে চলতেন; চরমপন্থীরাও তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

সন্ত্রাসবাদীদের সার্বিক আত্মত্যাগ কিন্তু বিফলে যায় নি। দেশবাসীর মনে এ কথা বারবার গুঞ্জরিত হয়েছে, "আমাদের মনুষ্যত্বের গর্ব তাঁরা আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন।"

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার

চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কোনো প্রভাব সরকারী শাসননীতির ওপর পড়ে নি এ কথা মনে করা ভুল হবে। বাধ্য হয়ে সরকারকে চিন্তা করতে হয়েছিল নানা ধরনের আপসের কথা, তবে সে আপসের মধ্যেও তাঁরা বিভাজন ও শাসনের নীতি পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করেন। একদিকে নিষ্ঠুর দমননীতি দিয়ে যেমন তাঁরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন, অন্য দিকে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে উস্কানি দিয়ে দেশের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাইছিলেন দুরারোগ্য বিভেদ। কিছু কিছু সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ যাতে পাকা করা যায় সেদিকেও তাঁদের সযত্ন দৃষ্টি ছিল।

মিণ্টো ছিলেন 'বিভাজন ও শাসনে'র নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী। ১৯০৫-এর ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে কিছু মুসলমান নেতা সিমলায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হবে, এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে ১৯০৯-এ মর্লে-মিণ্টো সংস্কার যখন প্রবর্তিত হ'ল, মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ছাড়া সে সংস্কার আর কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের কতকগুলি ধারা এখানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই সংস্কারের ফলে স্থির হ'ল যে এখন থেকে গভর্নর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং প্রত্যেকটি প্রাদেশিক এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন করে ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হবেন। এই দুই শ্রেণীর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হলেও

তাদের মৌলিক চরিত্র অপরিবর্তিতই রইল। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সরকারী সদস্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ রইলেন, ৬০ জনের মধ্যে মাত্র ২৭ জন বাছাই করা নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবেন এই স্থির হ'ল। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে অবশ্য বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বেড়ে গেল, কিন্তু সেখানেও যাঁরা মনোনীত সদস্য ছিলেন তাঁরা নির্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে হাত মেলাতেন সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেই।

কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্য নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হ'ল তিন রকম ভাবে : ১. সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী : এতে ছিলেন প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলির বেসরকারী সদস্যেরা। ২. শ্রেণীভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডলী : এতে ছিলেন মুসলমান এবং ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়। ৩. বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী : এই শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বাচিত হতেন স্থানীয় সমিতি, ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির দ্বারা। মহিলাদের কোনো ভোটের অধিকার ছিল না। আর এই সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্য থেকেও প্রাদেশিক গভর্নর কিংবা গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা করলে যে-কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বলে বাদ দিতে পারতেন।

আইনসভাগুলির ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। কোনো বিষয়ে যে সদস্য একবার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন একমাত্র তাঁরই অধিকার ছিল সম্পূরক প্রশ্ন করার। সেনাবাহিনী, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের বা প্রস্তাব গ্রহণের কোনো অধিকার আইনসভাগুলিকে দেওয়া হয় নি। সমগ্র বাজেট সম্পর্কে আলোচনা বা ভোট গ্রহণের কোনো অধিকারও আইনসভাগুলির ছিল না। শুধু স্বতন্ত্রভাবে বাজেটের কিছু অংশ আলোচনার মধ্যে সে অধিকার সীমিত ছিল।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তিত হবার আগে মধ্যপন্থীরা সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসায় রাজি ছিলেন, কিন্তু এবার তাঁদেরও সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হ'ল। আসলে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো অভিপ্রায়ই মর্লের ছিল না। ভোটের অধিকার দেওয়া হ'ল মুষ্টিমেয় লোককে। তার ওপর এই সীমিত নির্বাচকমণ্ডলীকেও বাতিল করার যথেচ্ছ ক্ষমতা রইল সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারী সদস্যদের আধিপত্যই বজায় রইল। প্রাদেশিক সভাগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল শুধু নামেই, কাজে নয়। বাজেটও ছিল পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে: আইনসভাগুলিকে শুধু আলোচনা ও বিতর্কের সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ক্ষুব্ধ হলেও মধ্যপন্থীদের পক্ষে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। মধ্যপন্থীদের সম্পর্কে কংগ্রেসের এতদিন যেটুকু আস্থা ছিল, এখন তাও সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হ'ল। দল হিসেবে কংগ্রেস সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে আদৌ অনুমোদন করতে পারেন নি; মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের ফলে চরমপন্থীরা এবার মধ্যপন্থী মনোভাবকে তীব্র আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা। জাতি, ধর্ম, ভাষা-নির্বিশেষে যে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠছিল ভারতবাসীদের মধ্যে, তারও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এই সংস্কার। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে সরকার জাতীয় সংহতি অর্জনের দুস্তর পথকে দুস্তরতর করে তুললেন।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তাকে শান্ত করার জন্য ১৯১১-তে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ রদ হ'ল। নতুন ব্যবস্থায় বিহার এবং উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের অংশ রইল না; আসামও স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হ'ল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হ'ল দিল্লিতে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাঙালির উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হ'ল, কিন্তু বিক্ষোভের মূল কারণগুলি অপসৃত হ'ল না। প্রেস আইনের (১৯১০) মধ্য দিয়ে কিংবা সংশোধিত ফৌজদারী আইনের আওতায় বিশেষ বিচারপদ্ধতি প্রবর্তন করে সরকার যে দমননীতি বজায় রেখেছিলেন তাকে সহ্য করে যাওয়া চরমপন্থীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা ও প্রসার

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল, মুসলমানদের মধ্যে তার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটে নি। হিন্দু এবং পার্শী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এ চেতনাকে নিজেদের মধ্যে যতটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, মুসলমান নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ততটা পারেন নি।

ব্রিটিশ ভারতে এসে বৈদেশিক প্রভুত্ব স্থাপন করার আগে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ এদেশে বাস করতেন মোটামুটি সদ্ভাবের সঙ্গে। ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধের বোধ অবশ্য তাঁদের মধ্যে ছিল। তবে ভারতীয় সমাজ তখনো ছিল মূলত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। সমাজে ধনী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন দরিদ্র; শিক্ষিতের পাশাপাশি ছিলেন অশিক্ষিত; শাসকের সঙ্গে শাসিতও ছিলেন সমাজের অংশ ব্রিটিশ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বে মুঘল যুগেও একই অবস্থা ছিল। ১৮৫৭-তে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন যখন জ্বলে উঠেছিল, তখন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন একই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে। বিদেশী শাসকের অত্যাচার হিন্দু মুসলমান কাউকেই রেহাই দেয় নি।

বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষ করে কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাঁদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানদেরই এবং নেতৃত্বও এসেছে তাঁদের কাছ থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে বিদ্রোহের সময় ও বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে শুধু দিল্লিতেই অন্তত ২৭,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। পরেও, বহুদিন ধরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের দেখতেন গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে।

জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের পর মুসলমানদের সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এল। ১৭৮০-র দশকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট। ব্রিটিশের অন্যান্য সকল নীতির মতো এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত। ব্রিটিশের কাছে এ কথা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে জাতীয় আন্দোলনকে যদি বেড়ে ওঠবার সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে তার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি আরো সুদৃঢ় হবে এবং সাম্রাজ্য অটুট রাখার সমস্যা তখন কঠিনতর হয়ে উঠবে।

কোনো ঐক্যবদ্ধ জাতিকেই দীর্ঘকাল অধীনতাপাশে বদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। উদীয়মান জাতীয়তাবাদের গতি সম্ভব হলে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেবার জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁদের সবরকমের দমননীতি প্রয়োগ করেন; সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ, বিবাদ এবং অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ রোপণ করতে চেষ্টা করেন। 'বিভাজন ও শাসনে'র নীতির সূত্রপাত হ'ল এ থেকেই। ধর্মের ভিত্তিতে এ দেশের মানুষকে দুটি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগিয়ে তোলা ব্রিটিশেরই রাজনৈতিক অবদান। সংখ্যালঘু মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করে তাঁদের তাঁরা হাতে রাখতে চাইলেন। জমিদার, ভূস্বামী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—এঁদের সবাইকে নিজেদের দলে আনতেও তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ ছাড়া অন্য ধরনের বিরোধ সৃষ্টিতেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ছিলেন অদ্বিতীয়। বারবার বাঙালী আধিপত্যের কথা তুলে তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন এ দেশে আঞ্চলিক বিরোধের সৃষ্টি করা যায় কিনা। জাতিভেদ প্রথাকেও তাঁরা নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে, উঁচু জাতের বিরুদ্ধে নিচু জাতকে উত্তেজিত করে সামাজিক স্তরেও নানা বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা। আইন আদালতে উর্দুর বদলে হিন্দী প্রবর্তনের দাবিকে সমর্থন করে উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক তিক্ততা সৃষ্টি করে তুললেন তাঁরা। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগত দাবিগুলিকে, সমাজকে গণতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে তোলার অসুবিধাগুলিকে সরকার ব্যবহার করলেন শুধু বিভেদ সৃষ্টির কাজে।

ভারতের সামাজিক গঠন খুবই জটিল। তার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে ভালো আর মন্দ প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে ছিল; বহু যত্ন, বহু ধৈর্য ছাড়া তাদের আলাদা করা ছিল অসম্ভব। বিদেশী শাসকেরা সমাজ গঠনের এই জটিলতাকে ব্যবহার করলেন শুধু নিজেদের স্বার্থে।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব যাঁর নামের সঙ্গে জড়িত, তিনি স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। মহান শিক্ষাব্রতী ও সমাজসংস্কারক রূপে তাঁর জীবনের সূচনা। কোরানের শিক্ষাকে তিনি আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করেন; তাঁর শিক্ষায়

সেবার মূল্য ছিল অপরিসীম। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামের রক্ষণশীল নেতাদের সঙ্গে তাঁর তীব্র দ্বন্দ্বের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের এই পর্বে সৈয়দ আহমেদ ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতায় বিশ্বাসী। তিনি যখন আলিগড়ে মহোমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন, তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই অর্থ সাহায্য পেলেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে তিনি মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তিনি অনেক মুসলমান জমিদারের সমর্থন অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে তাঁদের নিয়ে তাঁর উদ্‌বেগবোধ গভীর হয়ে উঠল। এইসঙ্গে ব্রিটিশও পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছিলেন। ফলে এখন সৈয়দ আহমেদ প্রচার করতে শুরু করলেন যে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থে কোনো মিল নেই, বরং তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এখন থেকে তিনি পুরোপুরি ব্রিটিশরাজের অনুগত হয়ে উঠলেন।

১৮৮৫-তে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন থেকেই তিনি তার বিরোধিতা শুরু করেন। শুধু তাই নয়, বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়ে তিনি কংগ্রেসের পাল্টা আন্দোলন পর্যন্ত শুরু করলেন। তাঁর অনুগামীদের তিনি বোঝাতেন যে ব্রিটিশ যদি এদেশ ছেড়ে চলে যায় তা হলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর আধিপত্য এবং অত্যাচার শুরু করবে। যদিও বদরুদ্দিন তায়বজীর মতো মুসলমান নেতারা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলমানেরা যোগদান করুক, সৈয়দ আহমেদ নিজে এর বিরোধী ছিলেন।

তথ্য দিয়ে বিচার করলে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে সৈয়দ আহমেদ এবং তাঁর মতো নেতাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্ম আলাদা হলেও, তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ একই। বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের জীবনচর্যাও একই ধরনের হয়ে ওঠে। বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমানের মধ্যে যে মিল, বাঙালী মুসলমান এবং পাঞ্জাবী মুসলমানের মধ্যে, ধর্মের অভিন্নতা সত্ত্বেও, সে মিল নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা, হিন্দু এবং মুসলমান একই শাসকগোষ্ঠীর হাতে সমানভাবে নির্যাতিত, সমানভাবে শোষিত। সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৪-তে নিজেই লিখেছিলেন :

> তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? চিতা হোক, আর কবরই হোক, মৃত্যুর পর তো সে একই ঠাঁই, মাটির আশ্রয়। একই মাটিতে তোমাদের চলার পথ, একই মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমরা নিশ্বাস নাও। মনে রেখো, 'হিন্দু' আর 'মুসলমান' এ শব্দ দুটিতে শুধু ধর্মের পার্থক্যই বোঝায়, আর কিছু-নয়। এদেশে যারাই বাস করে, তারা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, এমন-কি, খৃস্টান হোক—সকলে একই জাতি। তাদের সকলকে মিলতে হবে দেশের মঙ্গলের জন্য, সে মঙ্গলে তাদের সকলেরই মঙ্গল।

এই ধরনের উক্তি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ব্যাপকভাবে কেন দেখা দিয়েছিল তা নিশ্চয়ই অনুধাবনের যোগ্য।

বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আপেক্ষিক অনগ্রসরতা এর জন্য কিছুটা দায়ী। প্রধানত জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীই ছিলেন মুসলমান সমাজের মাথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার সত্তর বছর এঁরা ছিলেন ব্রিটিশ-বিরোধী, রক্ষণশীল এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন' ফলে সারা দেশে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমানই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যে পাশ্চাত্য চিন্তায় বিজ্ঞান, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা প্রসারলাভ করতে পারে নি, তাঁরা ঐতিহ্যনির্ভর এবং পশ্চাদ্মুখীই রয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমেদ খান, নবাব আবদুল লতিফ, বদরুদ্দিন তায়বজী এবং অন্যান্যদের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করল, কিন্তু হিন্দু, পার্শী এবং খৃস্টানদের তুলনায় শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কমই রয়ে গেল।

বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। একদিকে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোগী পুরুষের অভাব—এই দুই কারণে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা মুসলমান জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, হিন্দুই হোন বা মুসলমানই হোন, ব্যক্তিগত স্বার্থে জমিদার এবং ভূস্বামীরা ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অনুগত সমর্থক। তবু, হিন্দুসমাজে আধুনিক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি শ্রেণীর অভ্যুত্থানের ফলে ভূস্বামী সম্প্রদায়কে তাঁদের নেতৃত্বের আসন হারাতে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঠিক এর বিপরীত ঘটেছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা মুসলমানদের পক্ষে আরো একটি ক্ষতির কারণ হয়েছিল। সরকারী চাকুরি কিংবা পেশার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ছিল অপরিহার্য; এ ক্ষেত্রেও তাই মুসলমানেরা অমুসলমানদের চেয়ে পিছনে পড়েছিলেন। তা ছাড়া ১৮৫৭-র বিদ্রোহের জন্য সরকার মুসলমানদেরই প্রধানত দায়ী বলে মনে করতেন; তাই ১৮৫৮-র পর থেকে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরা ইচ্ছা করে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারলাভ করার পর শিক্ষিত মুসলমানরা দেখতে পেলেন যে ব্যবসায় এবং পেশার ক্ষেত্রে তাঁদের খুব একটা সুযোগ নেই; একমাত্র বিকল্প যা তা সরকারী চাকুরি।

তা ছাড়া ভারতের মতো অনুন্নত উপনিবেশের অধিবাসী হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের চাকুরির সুযোগ ছিল এমনিতেই কম। এ অবস্থায় ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এবং তাঁদের অনুগত মুসলমান নেতাদের পক্ষে শিক্ষিত হিন্দুর বিরুদ্ধে শিক্ষিত মুসলমানকে

উত্তেজিত করে তোলা আদৌ কঠিন ছিল না। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দানের দাবি তুললেন সৈয়দ আহমেদ খান এবং অন্যান্যরা। তাঁরা প্রচার করতে শুরু করলেন যে শিক্ষিত মুসলমানরা যদি ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তা হলে সরকারী চাকুরি কিংবা অন্যানা অনুগ্রহ দিয়ে সরকার তাঁদের পুরস্কৃত করবেন। অবশ্য এ ধরনের যুক্তি যে কিছু রাজানুগত হিন্দু বা পার্শীও উত্থাপন করেন নি তা নয়, তবে সংখ্যায় তাঁরা বরাবরই ছিলেন অল্প। ফলে সারা দেশে স্বাধীন ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি যখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন, মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তায় তখনো রয়ে গেল রাজভক্ত ভূস্বামী বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রভাব। এ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছিল একমাত্র বোম্বাইয়ে। সেখানকার মুসলমানরা গোড়া থেকেই শিক্ষা এবং বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ফলে বদরুদ্দিন তায়বজী, আর. এম. সায়ানি, এ. ভিমজি, তরুণ ব্যারিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ অনেক প্রতিভাবান মুসলমান সেখানে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবেও আধুনিক ভাবধারার প্রসারের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী এক শ্রেণীর মুসলমানের; নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজানুগতদের একচেটিয়া অধিকার তাঁরা ভেঙে দিতে পেরেছিলেন। জওহরলাল নেহরু রচিত 'দি ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে এই দিকটির সারমর্ম পরিস্ফুট হয় :

> যে সময়ের ব্যবধানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তা এক বংশপর্যায়ের অথবা তার কিছু বেশি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে এ ব্যবধানের বহিঃপ্রকাশ আজও দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যবধান জন্ম দিয়েছে এক ভয়ত্রস্ত মনোভাবের।

এই যুগে সাম্প্রদায়িক বোধ কেন ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা প্রথম শুরু করেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা। পরবর্তীকালে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা যখন নিজেদের দেশের ইতিহাস লিখতে শুরু করলেন, তখন তাঁরাও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন, সে পথ বর্জন করতে পারলেন না। ইতিহাস চর্চার এই ধারা সাম্প্রদায়িক বোধের অন্যতম উৎস। এই ইতিহাসে লেখা হ'ল যে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগ হিন্দুযুগ, আর মধ্যযুগ মুসলমান যুগ। মধ্যযুগে তুর্কী, আফগান, মুঘল— অনেক রাজবংশই এদেশে রাজত্ব করেছেন, অথচ তাঁদের রাজত্বের গুণাগুণ বা চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে তাঁদের সবাইকে উল্লেখ করা হ'ল মুসলমান বলে; তাঁদের যুগকে বলা হ'ল মুসলমান যুগ। এর থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে শাসকদের সবাই ছিলেন মুসলমান আর হিন্দুদের সবাই শাসিতের দলে। অথচ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের মতো হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়, দলপতি এবং জমিদারেরাও ছিলেন।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ মানুষকে তাঁরা দেখতেন ঘৃণা আর অবজ্ঞার চোখে, মনে করতেন তারা নিকৃষ্ট জীব—শুধু নিজের স্বার্থেই তাদের ব্যবহার করা যায়। উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ মানুষ ছিল সমান দরিদ্র, সমানভাবে করভার-প্রপীড়িত। এই যুগের ঐতিহাসিকেরা বোঝেন নি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হ'ত শাসক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা—তাতে ধর্মের কোনো স্থান ছিল না। তাঁরা বোঝেন নি এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে অন্য দেশের ইতিহাসের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। শাসক সম্প্রদায় বা তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষ ধর্মের কথা মাঝে মাঝে বলতেন না এমন নয়, কিন্তু তা শুধু নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে ধর্মের, এমন-কি, সাম্প্রদায়িকতারও কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে, এ সত্যের উপরও কোনো গুরুত্ব ব্রিটিশ কিংবা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ঐতিহাসিকেরা দেন নি। ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, কিন্তু তার সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। আর সে বৈচিত্র্যও ধর্মভিত্তিক নয়, সামাজিক শ্রেণীবিভেদ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে সে বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। তাই ঐতিহাসিকেরা যখন হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান সংস্কৃতির তথাকথিত পার্থক্যের কথা প্রচার করতে শুরু করলেন, তখন ইতিহাসকে আশ্রয় করে সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলও কিছুটা একই ধরনের হয়েছিল। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে ধর্ম-আন্দোলনের অবদান অনেক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের অনেক দুর্নীতি দূর হয়েছিল এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে; দূর হয়েছিল অনেক অযৌক্তিক, জ্ঞানবিমুখ চিন্তার জঞ্জাল। যুক্তিনির্ভর, মানবতাবাদী চিন্তার প্রসারের ফলে মহত্তর আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল ভারতবাসীর মনে।

কিন্তু একই সঙ্গে অনেকগুলি আন্দোলনের মধ্যেই হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শীদের মধ্যে, এমন-কি, উঁচু জাতের হিন্দু এবং নিচুজাতের হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে ধর্মের সংখ্যা এত বেশি, ধর্মের ওপর বেশি গুরুত্ব দিলে বিভেদ আসতে বাধ্য।

তা ছাড়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ধর্মান্দোলনগুলি শুধু ধর্ম ও দর্শনের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিল। অথচ ভারতের সকল মানুষের পক্ষে এইগুলিকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে নেওয়া সম্ভব নয়। কলা, বাস্তুশিল্প, সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ভূমিকা সমান উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া হিন্দু সংস্কারবাদীরা অতীত ভারতের জয়গান গাইতে গিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন শুধু

প্রাচীন যুগের প্রতি। স্বামী বিবেকানন্দের মতো উদারচেতা পুরুষও শুধু এই অর্থেই ভারত আত্মা বা ভারতের অতীত গৌরবের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। একই ভাবে মুসলমান সংস্কারকরাও তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের গৌরবময় অতীতকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের মধ্যে। এইভাবে ধর্মসংস্কারকদের কার্যকলাপের ফলে এদেশ দুই স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত—এমন একটা ধারণা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া কিছু কিছু আন্দোলনের লক্ষ্য গঠনমূলক সংস্কারের মধ্যে সীমিত ছিল না, অন্য ধর্মের প্রতি জেহাদ ঘোষণাও শুরু হয়েছিল তাদের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের পেছনে এর দায়িত্ব অনেকখানি।

রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক; এই দৃষ্টিভঙ্গী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক সন্ত্রাসকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অনেক। নিজেদের আচরণ এবং মনোভাব দিয়ে তাঁদের বোঝানো দরকার যে তাঁদের কাছ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নেই। তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের নিরাপত্তা বিধান করবেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব ব্যাপারেই তাঁরা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করবেন, ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

ঠিক এই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন আদি যুগের জাতীয়তাবাদীরা। জনসাধারণের কাছে এই আশ্বাস তাঁরা রাখতে পেরেছিলেন যে তাদের ধর্মে ও সমাজজীবনে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে একটি সম্মিলিত জাতিরূপে গড়ে তোলা। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেস এমন সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন যে কংগ্রেসে অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধি যদি কোনো প্রস্তাবকে মুসলমান সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন তা হলে সে প্রস্তাব কেউ অনুমোদন করবেন না। রাজনীতি যে ধর্ম-বা সম্প্রদায়-নির্ভর হওয়া উচিত নয়, জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা প্রচার করে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আধুনিক করে গড়ে তোলার কাজে এইভাবে ব্রতী হয়েছিলেন আদি জাতীয়তাবাদীরা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী যুগের অনেক নেতা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ভাবধারার প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিলেন না। উগ্রপন্থীদের যুগে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হ'ল গণজাগরণের অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার। কিন্তু চরমপন্থীদের কিছু কিছু কার্যকলাপে যে জাতীয় ঐক্যবোধে ফাটল ধরিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদের পুনরুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল এ কথা স্বীকার করা প্রয়োজন। যে রাজনৈতিক প্রচারকার্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁরা উদ্দীপ্ত করতেন, তা আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না; তা সংগঠিত হয় হিন্দু ধর্মকে অবলম্বন করে। চরমপন্থীরা ভারত-সংস্কৃতির যে ভাবমূর্তি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন তার থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েছিলেন, তাতে ছিল শুধু প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই প্রাধান্য। তাঁদের ধ্যানে,

তাঁদের ধারণায় ভারত-সংস্কৃতি যে আর্য-ঐতিহ্যবাহী হিন্দু ধর্মেরই নামান্তর, ভারতীয় জাতি বলতে বোঝায় হিন্দুদেরই—এর আভাস খুব অস্পষ্ট ছিল না। এই প্রসঙ্গে শিবাজী এবং গণপতি উৎসবে তিলকের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যায় অরবিন্দের—যিনি জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিলেন ধর্ম হিসেবে। যাঁর আধো-অতীন্দ্রিয়, আধো-আধ্যাত্মিক চেতনায় ভারতবর্ষ পরিগ্রহ করেছিল মাতৃকা-রূপ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল গঙ্গাসলিলে পুণ্যাবগাহনের মধ্য দিয়ে। কালীমূর্তিকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীদের সংগ্রামের শপথ নিতে হ'ত। এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান স্পষ্টত ধর্মীয়; তাদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুত্বই প্রকট। বলা বাহুল্য, সব ভারতীয়ের পক্ষে এ রাজনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষই বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। আর হিন্দু ধর্মের ভাবপ্রতিমা ও আচার-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে কোনো আন্দোলন গড়ে উঠলে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা যে তাকে নিজেদের বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির বিরোধী বলে মনে করবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া প্রাচীন ভারত ও ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রশংসা তথাকথিত নিচু জাতের কাছেও খুব গ্রহণীয় হওয়ার কথা নয়। বিভেদমূলক যে জাতিপ্রথার অত্যাচার যুগ যুগ ধরে তাদের সহ্য করে আসতে হয়েছে, তার উৎপত্তি তো প্রাচীন যুগেই।

রাণা প্রতাপ বা শিবাজীকে যদি 'জাতীয় বীর' বলে গণ্য করা হয়, তা হলে ধরে নেওয়া হয় যে মুঘল শাসকেরা পুরোপুরি বিদেশী, জাতীয়তাবিরোধী শক্তিই তাঁদের মধ্যে রূপ পেয়েছিল। অথচ রাণা প্রতাপ বা শিবাজীর মতোই ভারতীয় ছিলেন আকবর এবং ঔরংজেব। তাঁরা সবাই সমানভাবে শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি। যে পারস্পরিক সংঘর্ষে তাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তা তাঁদের যুগের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিচায়ক মাত্র। যে ইতিহাসে রাণা প্রতাপ ও শিবাজীকে 'জাতীয়' বীর বলে গণ্য করা হয় আর আকবর ও ঔরংজেবকে বলা হয় 'বিদেশী', সে ইতিহাস আধুনিক সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন; শুধু ইতিহাস হিসেবেই তা নিকৃষ্ট নয়, জাতীয় সংহতিরও তা অন্তরায়।

চরমপন্থীরা মুসলমান-বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন এ কথা মনে করা অবশ্য ভুল হবে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই—বিশেষ করে তিলক—হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন দেখতেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন আধুনিক ও প্রগতি চিন্তার প্রতিনিধি। সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ইয়োরোপীয় সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে; তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তবু, উগ্রপন্থীদের চিন্তায় ও রাজনীতিতে হিন্দুত্ব যে অন্তত কিছুটা ফুটে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য। তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়তো ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু তাঁদের বাহ্য আচরণে তা স্পষ্ট নয়। ব্রিটিশ ও তাঁদের সমর্থকেরা এই ব্যাপারটিকে কাজে লাগাল অত্যন্ত চতুরভাবে। শিক্ষিত মুসলমানদের

মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন, এমন-কি, বিদ্বেষী হয়ে পড়লেন, সহজেই তাঁরা স্বতন্ত্রতাকামী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন। এ-সব সত্ত্বেও কিন্তু ব্যারিস্টার আবদুল রসুল, হসরৎ মোহনি প্রমুখ অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। মহম্মদ আলি জিন্না জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠেন।

ভারতবর্ষ দরিদ্র, অনগ্রসর দেশ; সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সক্রিয় নীতি হ'ল তাকে আরো অনুন্নত করে তোলা। স্বাভাবিকভাবেই এদেশে কর্মসংস্থাপনের সুযোগ ছিল শুধু শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সারা দেশে চাকুরির সংখ্যা ছিল নিতান্তই সীমিত, তাদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের যজ্ঞে ব্রতী হন দূরদর্শী অনেক ভারতীয়; কিন্তু দেশে ব্রিটিশের মধ্যে তো বটেই ভারতীয়দের মধ্যেও কায়েমী স্বার্থের অভাব ছিল না। সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, জাতিগত, আঞ্চলিক—যত রকমের বিভেদবোধ থাকতে পারে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেগুলিতে তাঁরা উস্কানি দিতে লাগলেন। নিজের নিজের দল বা সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং চাকুরি জোগাড় করার পালা এই সময় শুরু হয়ে গেল। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংকীর্ণমনা, সংকীর্ণদৃষ্টি লোকের অভাব ছিল না; তাঁরা এবার 'হিন্দু জাতীয়তা' এবং 'মুসলমান জাতীয়তা'র কথা বলতে শুরু করলেন। জাতীয়তাবোধকে যে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিয়ে খণ্ড খণ্ড করা যায় না, সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতির যে অন্য কোনো পথ নেই এ বোধ তাঁদের রইল না।

সাম্প্রদায়িকতা মতবাদকে প্রথম সংঘবদ্ধ রূপ দেন আগা খাঁ, ঢাকার নবাব এবং নবাব মোহসীন-উল-মুল্‌ক। ১৯০৬ সালে তাঁদের উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ স্থাপিত হ'ল। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার যে কাজ আগে শুরু হয়েছিল, মুসলিম লীগ স্থাপনের ফলে তা শুধু ব্যাহত হ'ল না, পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ল। এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থপরতা এবং মুসলমান জমিদার এবং উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেন। সরকারের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ ও স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী আদায়ের দাবিতেও তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

ব্রিটিশও এতদিন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'বিশেষ স্বার্থ' রক্ষা তাঁদেরই কাজ। মুসলিম লীগ তাঁদের রাজানুগত্যের পরিচয় দিতে লাগলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দাবির বিরোধিতা ক'রে। বাংলাদেশে আবার ব্রিটিশরাজের প্রতি বিশ্বস্ত বড়ো বড়ো জমিদাররাই ছিলেন লীগ নেতা; তাঁরা বাঙালী নন, এসেছিলেন বাংলাদেশের বাইরে থেকে। ফলে

বাঙালী মুসলমান প্রজাদের সম্পর্কে তাঁদের প্রায় কোনো সহানুভূতিই ছিল না।

আধুনিক মনোভাবাপন্ন, শিক্ষিত অনেক মুসলিম তরুণ কিন্তু মুসলিম লীগের ফাঁকি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। মুসলিম লীগকে তাঁরা সকল শ্রেণীর মুসলমানের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধি বলে স্বীকারও করতেন না। মুসলমানদের স্বার্থ যে অন্যান্য ভারতীয়দের স্বার্থের থেকে আলাদা, মুসলিম লীগের এ দাবি সমর্থন করার মতো কোনো যুক্তিও তাঁরা খুঁজে পান নি। বরং উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দিকেই তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশি। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, মজহর-উল-হক প্রমুখ নেতারা এই সময়ে যে আহরার আন্দোলন শুরু করলেন তাকে চরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বলে গণ্য করা যায়। ঐতিহ্যাশ্রয়ী অনেক মুসলমান পণ্ডিতের মধ্যেও এ সময়ে স্বদেশপ্রেম বিকাশলাভ করছিল. সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন না হয়ে এঁরাও বেছে নিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলমান সমাজে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তুরস্ককে কেন্দ্র করে। এই সময় প্রথমে ইটালী ও পরে বলকান শক্তিগুলির সঙ্গে তুরস্ককে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মুসলিম দেশগুলির মধ্যে তুরস্ক তখন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ তীর্থস্থানগুলিও ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের ইমাম অর্থাৎ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন মুঘল সম্রাট; কিন্তু পরে মুঘল সম্রাটের পদচ্যুতি ও অটোমান বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের ওপর রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান চাপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ক্রমশ তুরস্কের স্বার্থরক্ষার নীতি অবলম্বন করতে লাগলেন, দেখাতে চাইলেন যে তাঁরা মুসলমান সমাজের কল্যাণকামী। তুরস্কের সুলতানকে সমস্ত মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের খলিফা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে যাতে একটি সর্ব ঐস্লামিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতেও ব্রিটিশ উৎসাহ জোগাতে লাগলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্যান্য শক্তির মতো সেই ব্রিটিশের হাতেও যখন তুরস্কের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিপন্ন হল, ভারতীয়দের মধ্যে তখন স্বাভাবিকভাবেই শুরু হ'ল তীব্র প্রতিক্রিয়া। অত্যন্ত দ্রুতভাবে ব্রিটিশবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা সঞ্চারিত হল মুসলমানদের মনে।

কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন নামে অভিহিত এই আন্দোলনকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ মনে করা ভুল হবে। খিলাফৎ আন্দোলনের উত্তেজনা শিক্ষিত, বেপরোয়া এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে। সাধারণ মানুষের অবদমিত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্র তুলে ধরেন নি, বিপন্ন তুরস্ক এবং তার খলিফাকে বাঁচানোই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সংস্কৃতি, যে

বীরগাথা যে পুরাণের নাম নিয়ে তাঁরা সংগ্রাম গড়ে তোলেন, তাদের সবই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে; প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। সংগ্রামের রাজনৈতিক আবেদনও গড়ে ওঠে ধর্মীয় আবেগকে আশ্রয় করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাই কোনো ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা গড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি; শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনও জাতীয়তাবাদের বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই যুগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য হিন্দুরা কোনো সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বা সংগঠন গড়ে তোলেন নি সত্য, তবে হিন্দুদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক চিন্তা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নি এ কথা মনে করা ভুল হবে। হিন্দুদের মধ্যে আলাদা করে কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের উৎপত্তি হয় নি কেন তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে ব্যাপক জাতীয়তাবাদী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সে সাম্প্রদায়িকতা আশ্রয় পেয়েছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে এ সুযোগ ছিল না, তার কর্মক্ষেত্র ছিল জাতীয় আন্দোলনের বাইরে।

কোনো কোনো হিন্দুনেতা এ সময়ে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' কথা প্রচার করতে শুরু করেন। মুসলমানদের তাঁরা গণ্য করতে লাগলেন 'বিদেশী' বলে। হিন্দু স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন তাঁরা। এমন-কি, আইনসভায় এবং চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের 'স্বত্ব' সংরক্ষণের দাবিও করা হতে লাগল। এইভাবে শুরু হ'ল হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়াকে আশ্রয় করে উভয় সম্প্রদায়ের বিভেদবোধ পুষ্ট হয়ে উঠল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ : জাতীয়তাবাদীদের প্রথম প্রতিক্রিয়া

১৯১৪-তে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে বিশ্বরাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হ'ল। ভারতের মত নিয়ে ব্রিটিশ এ যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের অর্থসম্পদ, ভারতের মানুষকে যখন যুদ্ধের কাজে লাগানো হতে লাগল তখনো ভারতের জনমতের উপর নির্ভর করার কোনো দায়িত্বই ব্রিটিশ অনুভব করেন নি। যুদ্ধে ভারত স্বেচ্ছায় যোগ দেয় নি, তা বলে তার অবদান কিছু কম ছিল না। ফ্রান্স থেকে চীন পর্যন্ত প্রসারিত বিভিন্ন সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করছিলেন দশ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সৈন্য—যুদ্ধে হয় আহত, নয় নিহত হয়েছিলেন প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত একজন। যুদ্ধে মোট ব্যয় হয়েছিল ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশি, আর তার ফলে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ অন্তত ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। এ ঋণের প্রায় সবটুকু বোঝাই বইতে হয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষকে।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে ভারতীয় নেতারা ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করলেও এ কথা মনে করা ভুল হবে যে জনমত সর্বতোভাবে ব্রিটেনের অনুকূল ছিল। কোনো যুদ্ধে জার্মানরা জয়ী হলে মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী দুপক্ষই উল্লসিত হতেন। কংগ্রেসও এ কথা কখনো গোপন করেন নি যে তাঁদের আনুগত্যের মূল্য হিসেবে তাঁরা চান রাজনৈতিক সংস্কার। ভারতীয়রা যাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় তার জন্য গান্ধীজি নিজে সক্রিয় ছিলেন; তাঁর আশা ছিল ভারতীয় সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারেরা স্বরাজের দাবি মেনে নেবেন।

১৯১৮-তে তিনি ঘোষণা করেন, "...স্বায়ত্তশাসনের (Home-rule) সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছাড়া ভারতের মানুষকে আর কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যাবে না। এবং সে প্রতিশ্রুতি যত শীঘ্র পালন করা হয় ততই মঙ্গল।"

ব্রিটিশ পক্ষ বা মিত্রপক্ষ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেরকম গালভরা প্রচার শুরু করেছিলেন, তা অবশ্য অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল। লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন : "মিত্রপক্ষ মুক্তির দূত, মুক্তি ছাড়া তাদের যুদ্ধের আর কোনো লক্ষ্য নেই।" আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের 'চৌদ্দ দফা' প্রস্তাবের মধ্য দিয়েও এই তথাকথিত মহান আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ, উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক বাজারের অধিকার নিয়েই শুরু হয়েছে এ যুদ্ধ—এ দেশের অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যে উৎসাহ নিয়ে ভারতীয়েরা মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেছিলেন, সে উৎসাহ অবশ্য বেশিদিন বজায় থাকে নি। তাঁরা বুঝতে পারেন যে ব্রিটিশ তাঁদের সহযোগিতার কোনো মূল্য শেষ পর্যন্ত দেবেন না। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থীদের প্রভাব যে ক্রমশ হ্রাস পাবে, সংস্কার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা দেখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পর্যন্ত সে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন।

মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আপসের সম্ভাবনা দেখা দিল ফিরোজশাহ মেহতা ও জি. কে. গোখলের মৃত্যুর পর। তিলকও এই সময় মান্দালয় থেকে ফিরে এলেন।

১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসল শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের পরামর্শে তাতে স্থির হল কংগ্রেসের সদস্যপদলাভের দ্বার চরমপন্থীদের কাছে প্রায় অবারিত করে দেওয়া হবে।

শ্রীমতী বেসান্ত ইতিমধ্যেই রাজনীতিক্ষেত্রে নেত্রী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর, একাধিক সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থেকেও ভারত যাতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করতে পারে তার চেষ্টাতেও তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব ছিল না। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৬-র সেপ্টেম্বরে তিনি স্থাপন করলেন হোমরুল লীগ। আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের পন্থা অনুসরণ করে

এবং থিয়োলজিক্যাল সোসাইটির অর্থসাহায্যে সারা দেশে তিনি হোম-রুল লীগের একাধিক শাখাও প্রতিষ্ঠা করলেন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। তিলক ও তাঁর হোম-রুল লীগ যোগ দিলেন অ্যানি বেসান্তের আন্দোলনে। তিলকের পুনরাবির্ভাব রাজনীতির ক্ষেত্রে আবার নিয়ে এল নতুন প্রাণের স্পন্দন। তাঁর সহজ, সরল বক্তৃতায়, তাঁর তীক্ষ্ণ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিলক দেশবাসীর সামনে আবার তুলে ধরলেন স্বদেশপ্রেম, ভয়হীনতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ। তিলক তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমিত রাখলেন মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে। অসংখ্য অনুগামীর সাহায্যে শ্রীমতী বেসান্ত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলন সংগঠিত করে তুললেন। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনকে এ সময়ে দুর্বিষহ করে তুলেছিল; ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে তাদের দুরবস্থার আর অন্ত ছিল না। দেশের দরিদ্র মানুষ তাই 'হোম-রুলে'র ডাকে সহজেই সাড়া দিলেন। মহিলারাও দলে দলে সাড়া দিলেন এ আন্দোলনে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রয়াস

বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস-সংগঠনে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিলেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাতে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। জার্মানির সাহায্যের উপর ভরসা করে তাঁরা চাইলেন যুদ্ধের পরিস্থিতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে লাগাতে।

সরকারী দমননীতির ফলে বিপ্লবীদের দলে এর আগে ভাঙন দেখা দিলেও ১৯১২ থেকে তাঁরা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে দ্বিতীয়বার শক্তির পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন করে দল সংগঠন করতে শুরু করেন। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপে এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই বিপ্লবীরা কারাদণ্ড অথবা ফাঁসির মঞ্চকে এড়াতে দেশত্যাগ করেন নি, তাঁদের বিদেশ-যাত্রার পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল, তাঁরা ইয়োরোপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে প্রচারকার্য চালাবেন। তা ছাড়া স্বদেশে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহও ছিল তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। বিদেশে ভারতীয় ছাত্র, ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে থেকে তাঁরা সংগঠনের জন্য নতুন নতুন সদস্য বেছে নিতেন। যেসব দেশে বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল, সেখানে প্রগতিশীল বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হলেন তাঁরা। বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হ'ল, তাঁদের প্রথম কাজ হ'ল বিদেশস্থিত ভারতীয় সৈন্যদল এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্রিটিশ শাসনের যাঁরাই বিরোধী ছিলেন, তাঁদের সকলকে দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগলেন বিপ্লবীরা। জার্মানির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ ও জনবল সরবরাহ করার পরিকল্পনা রচিত হ'ল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে এইভাবে

বিপ্লবীরা কাজে লাগাতে চাইলেন, জার্মানদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবার ইচ্ছা তাঁদের আদৌ ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবী সাভারকর এই সময় গ্রেফতার হলেন। তাঁর পলায়নের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। লণ্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। তাঁরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন।

লণ্ডন থেকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে প্যারিস ও পরে জার্মানিতে পাড়ি দেন। জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের অর্থসাহায্যে ভারতীয়দের নিয়ে বার্লিনে একটি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সেটি ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটি নামে পরিচিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ এই কমিটির সম্পাদক হলেন। বার্লিন কমিটি বাগদাদ, ইস্তানবুল, পারস্য, কাবুল প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধি পাঠাতে শুরু করলেন। বিদেশস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের এবং যুদ্ধবন্দীদের বার্লিন কমিটি বেছে নিয়েছিলেন নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে। তাঁদের উদ্যোগেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা বরকতউল্লা এবং মৌলানা ওবেদুল্লা কাবুলে যান এবং সেখানে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করেন। এঁদের মধ্যে মৌলানা ওবেদুল্লার পূর্বজীবন খুবই চমকপ্রদ।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতেও ভারতীয় বিপ্লবের কেন্দ্র সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে যেসব ভারতীয় বসবাস করতেন বিদেশাগতদের সম্পর্কে আমেরিকান আইনের কড়াকড়ির ফলে তাঁরা, তিক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচারের ভার নিয়েছিলেন তারকনাথ দাস।

লালা হরদয়াল এই সময় প্যারিস থেকে আমেরিকায় এসে পৌঁছলেন। হরদয়াল না শিখ নেতা সোহন সিং ভকনা, কে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে গদর পার্টির নাম গৃহীত হয়েছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা গদর থেকে। 'গদরের' অর্থ বিদ্রোহ, পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯১৩-র ১ নভেম্বর থেকে। গদর পার্টির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল প্রধানত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। তাঁদের মুখ্য কর্মসূচী ছিল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক রচনা প্রকাশ এবং রাজকর্মচারী হত্যা। গদর পার্টির প্রধান কর্মকেন্দ্র সানফ্রানসিস্কোতে স্থাপিত হ'ল, তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল আমেরিকার সারা উপকূলঅঞ্চলে এবং দূর প্রাচ্যে। সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে একই সঙ্গে কী করে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবেন এঁরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। গদর পার্টির বৈপ্লবিক উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যায় গদর পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে :

> বীর সৈনিক চাই। ভারতে গদরের (বিদ্রোহের) আগুন জ্বালিয়ে তোলার জন্য বীর সৈনিক চাই। বেতন · মৃত্যু: পুরস্কার · শহীদত্ব, বৃত্তি : স্বাধীনতা; সমরাঙ্গন : ভারতবর্ষ।

কোমাগাতামারু নামে জাহাজের যাত্রীদের কেন্দ্র করে এই সময় যে ঘটনা ঘটে, তাতেও গদর পার্টির কর্মাচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়। জনৈক গুরুদিৎ সিং জাহাজটি ভাড়া করে একদল বাস্তুত্যাগীকে কানাডায় নিয়ে যান। জাহাজ কানাডায় পৌঁছল, কিন্তু যাত্রীদের

ঠাঁই হল না সে দেশে। দুমাস ধরে অবর্ণনীয় কষ্ট অনিশ্চয়তা ভোগের পর তাঁদের বাধ্য করা হ'ল দেশে ফিরতে। কোমাগাতামারু কলিকাতা বন্দরে পৌঁছ্বার পর সরকার তাঁদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু ট্রেনে চড়বেন না বলে তাঁরা পণ করে বসলেন। এর ফলে দাঙ্গা শুরু হ'ল; কুড়ি থেকে চল্লিশ জন যাত্রী প্রাণ হারালেন, আহত হলেন অনেক বেশি সংখ্যক যাত্রী। তোসামারু নামক জাহাজের যাত্রীরাও একই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন।

এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ বিদেশবাসী পাঞ্জাবীদের মনে জোগাল বিদ্রোহের ইন্ধন। তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরে এলেন, অত্যাচারিতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শুরু করলেন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি। জার্মানি থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েও তাঁরা দমলেন না; সরাসরি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের এক নতুন যুগ শুরু হয়েছিল এই সময়। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ নতুন সন্ত্রাসবাদী নেতাদের নেতৃত্বে চিহ্নিত বিপ্লবের এই যুগ। এঁদের পরিকল্পনা হ'ল প্রথমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে তুলবেন, তারপর পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত পুলিশ লাইন এবং ট্রেজারি যুগপৎ আক্রমণ করবেন, সবশেষে জার্মান অস্ত্রের সহায়তায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

১৯১৫-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল এই গণ-অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট দিন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্যোক্তা ভি. জি. পিংলে মীরাটের ক্যাভালরি লাইন্‌স-এ বোমা সমেত ধরা পড়লেন; বিদ্রোহী সৈন্যদলগুলি ভেঙে দেওয়া হ'ল, আর ষড়যন্ত্রীদের অনেকেই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন অথবা নির্বাসিত হলেন আন্দামানে। রাসবিহীরী বসু দেশত্যাগ করে পাড়ি দিলেন জাপানে।

বিক্ষিপ্ত হত্যাকাণ্ডের পথ বর্জন করে অনেক বেশি ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা রচনা করেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনি ও তাঁর চার বাঙালী সহকর্মী জার্মান অস্ত্রের আশায় অপেক্ষা করছিলেন। পুলিশ তাঁদের সন্ধান পায়। যে অসম সাহসের সঙ্গে তাঁরা পুরো এক ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র পুলিশের মুখোমুখি হলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বালাশোরের বুড়িবালামের তীরে এই যুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করে ট্রেঞ্চে প্রাণ হারালেন যতীন্দ্রনাথ।

বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন এই বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির ব্যর্থতার অনেক কারণ লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে বার্লিন কমিটি বা গদর পার্টির সংযোগ তত ঘনিষ্ঠ ছিল না, দেশের মধ্যেও বিপ্লবীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আশানুরূপভাবে স্থাপিত হয় নি। আমেরিকায় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ভারত সরকার গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁদের অনুরোধে আমেরিকান সরকার কড়া নজর রাখতে

শুরু করেন যাতে বিপ্লবীরা জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্র না পাঠাতে পারেন। বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ার পর আমেরিকায় ভারতীয়দের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। সানফ্রানসিস্‌কোর গদর নেতাদের বিচারের পর আমেরিকার মাটিতে বিপ্লবকেন্দ্র গড়ে তোলার শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল।

লক্ষ্মৌ চুক্তি

অবস্থার চাপে পড়ে ভারত সরকার এই সময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগও ১৯১৬-র লক্ষ্মৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

১৯০৮-এর পরে লক্ষ্মৌয়ে আবার প্রথম কংগ্রেসের সম্মিলিত অধিবেশন বসল। হোম-রুল আন্দোলনের উত্তেজনায় কংগ্রেস তখন সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। মুসলিম লীগেরও চরিত্রবদল ঘটছিল ইতিমধ্যে। সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব ও আলিগড় স্কুলের সংকীর্ণ রাজনীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ফলে লীগের দৃষ্টিভঙ্গীও চরমপন্থী হয়ে উঠতে শুরু করে। মৌলানা আজাদ, আনসারি, আজমল খান প্রমুখ মুসলমান নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেসের মিলবার সম্ভাবনা কিছুটা দেখা দিয়েছিল। এরপর যখন আজাদের 'আল-হিলাল' এবং মোহম্মদ আলির 'কমরেড' পত্রিকা দুটির প্রকাশ' সরকার জোর করে বন্ধ করে দিলেন এবং তাঁদের দুজনকেই অন্তরীণ করে রাখলেন তখন সে ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার আগ্রহ দেখা দিল। এ আগ্রহের ফল লক্ষ্মৌ চুক্তি।

তিলক অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে একমাত্র হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্য লাভ করতে পারে; ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যা করা সম্ভব, মুষ্টিমেয় চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে তা কখনোই করা সম্ভব নয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে তাঁর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে তাঁর আগ্রহ এত আন্তরিক ছিল। যে লক্ষ্মৌ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী বা রায়তি সুবিধার দাবিকে মেনে নিতে তিনি দ্বিধা করলেন না।

লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রধান ধারাগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভায় কতজন করে মুসলমান সদস্য থাকবেন চুক্তিতে তা নির্ধারিত হল। তা ছাড়া স্থির হল যে কেন্দ্রীয় বা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। আইনসভায় যে কোনো ধর্মের প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ যদি কোনো প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তা হলে সে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হবার অধিকার আইনসভার রইল না। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যৌথভাবে কতকগুলি দাবি পেশ করলেন সরকারের কাছে; প্রথম, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল তুলে দিতে হবে; দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে

মোট সদস্যসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ হবেন নির্বাচিত সদস্য; তৃতীয়, প্রাদেশিক বিষয়গুলিতে সরকার কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবেন না; চতুর্থ, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ চুক্তি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক হলেও, গান্ধীজির উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে ও চুক্তি ধনী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে ধনী শিক্ষিত মুসলমানের চুক্তি। হিন্দু বা মুসলিম সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ চুক্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে জোর দেওয়া হয়েছিল হিন্দু ও মুসলিমের তথাকথিত স্বতন্ত্র স্বার্থের উপর; হিন্দু এবং মুসলমানের রাজনৈতিক অস্তিত্ব পৃথক—এরকম ভ্রান্ত ধারণাকে পরোক্ষভাবে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এ চুক্তিতে, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের সামাজিক সত্তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা। ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের বিকাশে লক্ষ্ণৌ চুক্তির কোনো অবদান নেই, বরং ভবিষ্যৎ সাম্প্রদায়িকতার পথ এতে খোলাই রইল। ভারতের মৌলিক ঐক্যকে বিসর্জন দিয়ে যে আপসের নীতি গৃহীত হ'ল, তার চাপে লক্ষ্ণৌ চুক্তির পুরো কাঠামোই একসময় ভেঙে পড়েছিল।

তৎকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল মিলিত হতে পেরেছিল। তাঁদের সম্মিলিত দাবি সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ভারত সরকারের সামনে। তরুণ নেতাদের এ সময় আকৃষ্ট করেছিল হোম-রুল লীগগুলির কর্মধারা। তাঁদের আন্দোলনও সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের বিক্ষোভও কিছু কম ছিল না।

এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সামনে পড়ে সরকার আবার তাঁদের দুমুখো শাসননীতির শরণাপন্ন হলেন। একই সঙ্গে সংস্কার প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়ে এবং নির্মম দমননীতি অবলম্বন করে তাঁরা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চাইলেন। সংস্কারের নীতি যাতে অবিলম্বে ঘোষণা করা যায় ভাইসরয় চেম্‌সফোর্ড সেজন্য সেক্রেটারি অফ স্টেটকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন, কিন্তু তৎকালীন হোম মেম্বারের মত হল, 'এই নতুন বন্যাকে ভালো করে বাঁধ দিয়ে রুখতে হবে।' ফলে হোম-রুল লীগগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হল, সরকারের হাতে শ্রীমতী বেসান্ত গ্রেফতার হলেন। ভাইসরয়ের কাছে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে কংগ্রেস শ্রীমতী বেসান্তকে নির্বাচিত করলেন কলকাতা অধিবেশনের (১৯১৭) সভানেত্রী হিসেবে। মাদ্রাজে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে'র যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেস তা গ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু হোম-রুলের দাবিকে তাঁরা পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবি হল, ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে, এবং শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মর্যাদা দিতে হবে কংগ্রেস এবং লীগের যুক্ত পরিকল্পনাটিকে।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

ঐ দাবিগুলি সম্পর্কে সরকার কী নীতি অবলম্বন করবেন সেক্রেটারি অফ স্টেট মণ্টেগু ১৯১৭-র ২০ অগাস্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন।

যে রকম দেরিতে মণ্টেগুর সংস্কারনীতি ঘোষিত হল, তার তুলনায় প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলেন যে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির অন্তিম লক্ষ্য ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন। কিন্তু জাতীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে না দিয়ে বরং শাসনকার্যের প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগ করা এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যেই মণ্টেগুর সংস্কার নীতির লক্ষ্য সীমিত রইল।

মণ্টেগুর ঘোষণা থেকে এ কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবার কোনো অভিপ্রায় ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। কখন কতটুকু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ভারতবাসীরা পাবে, কখন তাদের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা যাবে তা তখনো পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ সরকার আগে বিচার করে দেখবেন ভারতীয়েরা শাসনকার্যের দায়িত্ব নেবার কতটা উপযুক্ত, বা ব্রিটিশের সঙ্গে কী ধরনের এবং কতটা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তবেই হয়তো ভারতীয়দের অধিকারের সীমা কিছুটা বাড়বে। অর্থাৎ, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পুরোপুরি ব্রিটিশেরই হাতে রয়েছে। সংস্কারের ধুয়া শুধু মধ্যপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য, যাতে তাঁরা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মিলতে না পারেন।

সরকারী প্রতিক্রিয়ার চেহারা আরো স্পষ্ট তাঁদের দমননীতির মধ্যে। মুখে সংস্কারের নাম করে তলে তলে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকারী তৎপরতার অন্ত ছিল না। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের (Criminal Law Amendment Act) বলে যে কোনো ষড়যন্ত্রকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার এবং বিশেষ বিশেষ ট্রাইবুন্যালের সাহায্যে যেমন খুশি বিচার করার অধিকার সরকার হাতে তুলে নিলেন। শুধু মাত্র সন্দেহের বশে সাধারণ মানুষকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণ করা হতে লাগল, আর অন্তরীণ থাকার সময় তাঁদের ভাগ্যে জুটল অবর্ণনীয় অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখার পণ করে যে কোনো মূল্য দিতে, যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন ব্রিটিশ সরকার : জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদীদের বিভ্রান্ত করার উপায় হিসেবে তাঁরা সংস্কারের পথকে বেছে নিলেন। অথচ শাসিতের ওপর তাঁদের বজ্রমুষ্টি রইল একই রকম অকম্পিত, একই রকম নিষ্ঠুর।

চতুর্থ অধ্যায়

'স্বরাজ' লাভের সংগ্রাম

ঝড়ের সংকেত : যুদ্ধপর্বের প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে। জাতীয় আন্দোলনে এই যুগে সঞ্চারিত হয় তীব্র গতিবেগ; বলা যেতে পারে, আন্দোলনের শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এ সময়ে।

যুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতাকে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুতরাং আশা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন না হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ভারতবাসীকে যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা হবে। জাতীয়তাবাদীরা প্রত্যাশায় দিন গুনছিলেন। এবং একই সঙ্গে, প্রত্যাশা পূর্ণ না হলে, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তার সমুচিত জবাব দেবার প্রস্তুতিও তাঁদের ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই ধরনের ক্ষীণ আশার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে। যুদ্ধের সময় বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন বর্ধিত চাহিদার অন্তত কিছুটা ভারতকেই মেটাতে হয় নিজের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ক'রে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। উপযুক্ত প্রেরণা ও সুযোগ পেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কতটা অগ্রগতি লাভ করতে পারে তার সম্ভাবনা তৎকালীন এই সমৃদ্ধির মধ্যে পরিস্ফুট। ভারতীয় শিল্পপতিরাও পেয়েছিলেন প্রভূত মুনাফা ও সমৃদ্ধির সাময়িক স্বাদ। ১৯৬১-তে একটি শিল্প কমিশন সুপারিশ করেন যে শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের আরো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত এবং শিল্পোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় শিল্পপতিরা আশা করেছিলেন যে সরকারী শিল্পনীতিতে গুরুতর কিছু পরিবর্তন আসন্ন।

কিন্তু এই-সব আশা এবং সাগ্রহ প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ নির্দ্বিধ ছিল না, তাদের সঙ্গে মিশে ছিল আশঙ্কা আর উদ্‌বেগ। কৃষিজ পণ্যের দাম এইসময় বাড়ে নি, অথচ শিল্পপণ্যের দাম প্রায় আকাশ ছুঁয়েছিল। বিশেষ করে ইস্পাত এবং তুলাজাত পণ্যের মুনাফার পরিমাণ ছিল অভাবিত রকম বেশি। পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে ভারতীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ তার ফলভোগী

হবে এমন কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান ম্যুনিশনস্ বোর্ড (Indian Munitions Board) ভারত থেকে যুদ্ধোপকরণ কেনার উদ্যোগী হলেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি; যন্ত্রোৎপাদনের উপযোগী শিল্প দেশে প্রায় ছিলই না। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, পরিবহনোপযোগী জাহাজের অভাব—এ-সবের জন্যও পণ্য রপ্তানির পথ কোনো সময়েই খুব সুগম হতে পারে নি।

যুদ্ধের শেষের দিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেমে এল মন্দা। বন্ধ কারখানা, কর্মসংস্থানের অভাব সবই এই শিল্প-সংকটের স্বাভাবিক পরিণতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ইতিমধ্যেই প্রায় আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২০-র মধ্যে কলকাতায় পাইকারী মূল্যহার বেড়েছিল ১০০ শতাংশেরও ওপর; আর খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৯৩ শতাংশ। অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতিও এর থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা কোন্ চরমে পৌঁছেছিল তা সহজেই অনুমেয়। খাজনা এবং করের গুরুভার কৃষকসমাজকে নিষ্পিষ্ট করছিল, শিল্পপতিরা পর্যন্ত সংরক্ষণ-নীতি (Protection) ও রাষ্ট্র সাহায্যের প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিলেন সরকারের দিকে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্‌বেগ প্রায় সর্বজনীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি প্রশ্নই প্রায় সকলের মনে দানা বেঁধে উঠছিল · যুদ্ধে জিতলে ব্রিটেন কি ভারতীয় অর্থনীতির দাবিগুলি পূরণ করতে প্রস্তুত হবে?

সংক্ষেপে এই ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থা। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপের দিকে মোড় নিল। দ্রব্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধের সময় বৈদেশিক পণ্য আমদানির পথ রুদ্ধ হয়েছিল, সে পথ আবার গেল খুলে। বৈদেশিক পুঁজিও প্রভূত পরিমাণে এদেশে খাটানো হতে লাগল। দেশীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগে ক্রমশ ভাটা পড়তে শুরু করল। আর ভারতীয় শিল্পগুলির এত বেশি পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ল যে সেগুলি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মোহভঙ্গের মাত্রা কিছু কম ছিল না। যুদ্ধ চলার সময় জনসমর্থন লাভের আশায় ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি সমানে প্রচার করত যে এ যুদ্ধ গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে সব দেশের, সকল মানুষের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রক্ষায় তাঁরা চুক্তিবদ্ধ। যুদ্ধের সময় এ আশ্বাসবাণী এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিটি দেশে জুগিয়েছিল মহান জাতীয়তাবাদী প্রেরণা। যুদ্ধ শেষ হ'ল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না।

১৯১৯-এর শান্তিচুক্তি যখন রচিত হ'ল তখন দেখা গেল যে মিত্রপক্ষের বহুঘোষিত যুদ্ধনীতি বা প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চোদ্দ-দফা' প্রস্তাব কোনোটিই সে চুক্তিতে স্থান পায় নি। ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে সহায়তা করার ফলে

জার্মানদের প্রতি ভারতীয় মনোভাব কিছুটা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, অথচ দেখা গেল মিত্রশক্তি ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানদের মাথার ওপর প্রতিশোধের খড়্গ তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের যে ভারী বোঝা মিত্রশক্তি জার্মানির উপর জোর করে চাপালেন তাকেও ভারতীয়রা খুব প্রসন্ন মনে নিতে পারেন নি। তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি মিত্রশক্তির আচরণও ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শান্তিচুক্তিগুলিতে ভারতীয়দের মর্মাহত হবার আরো অনেক কারণ ছিল। চুক্তির মাধ্যমে বিজিত শক্তিগুলির উপনিবেশ অঞ্চল ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল বিজেতাদের মধ্যে। মধ্য ইয়োরোপের জাতিগুলি বঞ্চিতই রইল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে। আর সর্বোপরি, লয়েড জর্জের যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মিত্রশক্তি সিদ্ধান্ত নিলেন যে অটোমান বা তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হবে। মিত্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট হয়ে গ্রীক ও ইটালীয় সৈন্যবাহিনী যখন তুরস্কে অবতীর্ণ হ'ল তখন মনে হ'ল অটোমান সাম্রাজ্য ও খলিফার অবলুপ্তি আসন্ন। সারা পৃথিবীর মুসলমান সমাজের একটি বৃহৎ অংশ খলিফাকে নিজেদের ধর্মগুরু বলে মনে করতেন। তাঁদের আশঙ্কা হ'ল, খলিফার পদমর্যাদা যদি ক্ষুণ্ণ হয় তা হলে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় যে-সব দেশের মুসলমানেরা বাস করেন তাঁদের অবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই আশঙ্কা থেকেই খিলাফত আন্দোলনের জন্ম।

বিশ্ব-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনাও ঘটল এই সময়ে। হোমরুল আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন ভারতের রাজনীতিকে সবে আলোড়িত করতে শুরু করেছে। এমন সময়—১৯১৭-র নভেম্বরে—জার-শাসিত রাশিয়ায় জ্বলে উঠল বিপ্লবের আগুন, বলশেভিকদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

মিত্রশক্তিগুলির ঘোষণা ও কাজের মধ্যে যে বিরোধ যুদ্ধান্তিক যুগে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল, এশিয়ায় তাঁদের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব ত্যাগের মাধ্যমে সে বিরোধকে সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে নির্মূল করে ভারতবাসীর মনে সোভিয়েট রাশিয়া গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন। জার-শাসিত সমস্ত উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাঁরা ফিরিয়ে দিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত সব এশীয় জাতিরা পেলেন সমান মর্যাদা। স্বদেশের অন্তর্বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হস্তক্ষেপ সব-কিছুকে অগ্রাহ্য করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়ার সাধারণ মানুষ—রাশিয়ার বিপ্লবে ঘোষিত হয়েছিল সাধারণ মানুষেরই মাহাত্ম্য। তাদের শক্তি এবং তেজ ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত সব মানুষের কাছে নিয়ে এল জীবনের আশ্বাস। যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকদের মাধ্যমে বিপ্লবের খবর ছড়িয়ে পড়ল সুদূর গ্রামাঞ্চলে। ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের যে-সব নির্দেশ লেনিন জারি করলেন বুদ্ধিজীবীদের মনেও তা জোগাল নতুন প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দিল্লি অধিবেশনে কংগ্রেস সংকল্প নিলেন যে

ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারেই তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না, ভারতের জনগণের অধিকারকেও পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে।

প্রেরণা এল আয়ার্ল্যাণ্ড থেকেও। সিন ফেইন পার্টি এ সময় ঘোষণা করলেন আইরিশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা; মাইকেল কলিন্স-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আইরিশ গেরিলাদের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ল। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যে দমননীতি অবলম্বন করলেন ভারতবাসীকে তা স্মরণ করিয়ে দিল কুখ্যাত রাওলাট বিলের কথা। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীও ভারতবাসীকে বিরূপ করে তুলছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। বিশ্বযুদ্ধের সময় জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের ন্যাশনালিস্ট পার্টি প্রভূত শক্তি অর্জন করেছিল। ১৯১৯-এ জগলুল পাশাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করার ফলে যে গণঅভ্যুত্থান শুরু হ'ল ব্রিটিশ তাকে নির্মমভাবে দমন করলেন। ১৯২০-র মার্চে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। প্রায় একই সময়ে তুরস্কের মুস্তাফা কামাল পাশা যুদ্ধ ঘোষণা করেন তুরস্ক দখলকারী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে; তাঁর নেতৃত্বে তুরস্কে অস্থায়ী সরকারও গঠিত হ'ল।

দূর প্রাচ্যে চীনেও অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সানটুং নামে যে অঞ্চলটিতে আগে জার্মানরা বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন মিত্রশক্তির অনুগ্রহে জাপান সেটি নিজের দখলে রাখার অধিকার পেল। ফলে ৪ মের আন্দোলনের (May Fourth Movement) মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সম্প্রদায় জাপানী পণ্যের বয়কট শুরু করলেন। ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করতেও অসম্মত হল চীন।

এই-সব নতুন শক্তির অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সামনে নতুন এক চ্যালেঞ্জ দেখা দিল। গণশক্তির ওপর নির্ভর করে জাতীয় সংগ্রামও এক নতুন রূপ নিতে শুরু করে। সরকারের দোমনা ভাবের কিন্তু অবসান হল না। কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে অবশ্য ভারতবাসীদের খুশি করার চেষ্টা চলছিল। ১৯১৭-র ২০ অগাস্ট মণ্টেগু যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন তার ফলে হোম-রুল বন্দীরা মুক্তি পেলেন, সৈনাবাহিনীতে কমিশন্‌ড স্তরে ভারতীয়দের নিযুক্ত হবার যে বাধা এতদিন ছিল তা তুলে নেওয়া হল, সেক্রেটারি অফ স্টেট স্বয়ং ভারত পরিদর্শনে এলেন। এ-সবের মাধ্যমে মণ্টেগু মধ্যপন্থীদের শান্ত করতে পারলেন ঠিকই, কিন্তু চরমপন্থীদের অসন্তোষ প্রশমিত হল না।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যে খসড়া সরকার রচনা করলেন জাতীয়তাবাদীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিল সম্পূর্ণ অসার। এ পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'দ্বৈরাজ্য'— যার মাধ্যমে, সরকার প্রদেশগুলিতে দ্বি-আঙ্গিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। স্থির হল যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বহীন বিষয়গুলির দায়িত্ব প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য থেকে মনোনীত মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে রাজস্ব, পুলিশ, সাধারণ শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়গুলি সংরক্ষিত থাকবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের জন্য। অর্থাৎ এ বিষয়ে আমলাতন্ত্রেরই কায়েমী অধিকার অব্যাহত থাকবে, আর তাঁরা শুধু ভারত সরকার কিংবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেই নিজেদের কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন। অন্য দিকে মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের জন্য দায়ী থাকবেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাজে, তবে প্রদেশপাল বা গর্ভনর তাঁদের পরামর্শ আদৌ গ্রহণ নাও করতে পারেন। গর্ভনর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের দুটি কক্ষেরই সভাপতিত্ব করবেন, তবে সবসময়ে যে যুক্ত অধিবেশন হবে তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন আগে যেমন ছিল তেমনিই থাকবে, তবে গর্ভনর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আর-একজন ভারতীয় নিযুক্ত হবেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আগে যেমন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়ী ছিল এখনো তাই থাকবে। কেন্দ্রে দুকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হবে; তার মধ্যে নিম্নতর কক্ষের বেশির ভাগ সভ্য নির্বাচিত হবেন, আর উচ্চতর কক্ষে থাকবে সরকারী সভ্যের প্রাধান্য। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিও আয়তনে বেড়ে যাবে, এবং ব্যাপকতর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অধিকাংশ সদস্য আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত হবেন। রাজস্ব সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু কিছু ক্ষমতাও প্রদেশগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকি ক্ষমতা অবশ্য থাকবে ভারত সরকারের হাতে। এ পরিকল্পনায় আরো স্থির হল যে পাঞ্জাবে শিখেদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হবে।

এই সংস্কার প্রকল্পে এমন কোনো ব্যবস্থা রইল না যার সাহায্যে গভর্নর জেনারেল বা তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অথচ প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা রইল সর্বপ্রসারী। তার ওপর ভোটাধিকারকেও এত সীমিত রাখা হল যে তার মাধ্যমে কোনো গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যই সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। ১৯২০-তে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নতর কক্ষের জন্য ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৯,০৯,৮৭৪ আর উচ্চতর কক্ষের জন্য ১৭,৩৬৪।

১৯১৮-র ৮ জুলাই প্রস্তাবিত সংস্কারের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল তাকে কেন্দ্র করে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে শুরু হ'ল তীব্র সংঘর্ষ। মধ্যপন্থীরা রিপোর্টটিকে স্বাগত জানালেন; আর চরমপন্থী তিলক ঘোষণা করলেন যে রিপোর্টটি 'সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য।' ১৯১৮-র অগাস্টে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন বসল তাতে প্রস্তাবটিকে বর্ণনা করা হল 'নৈরাশ্যজনক ও অসন্তোষজনক' বলে; কংগ্রেস দাবি জানালেন যে প্রদেশগুলিতে প্রায় পুরোপুরি স্বাধিকার প্রবর্তিত হোক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা হোক অন্তত কিছুটা পরিমাণে নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকতে। রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতের স্বাধীনতার দাবিও এই অধিবেশনে কংগ্রেস জানালেন।

মধ্যপন্থীরা কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিতে সম্মত হন নি। তাঁদের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক হ্রাস পেয়েছিল, ১৯১৮-র নভেম্বর থেকে তাঁরা আলাদাভাবে

মিলিত হতে লাগলেন। পরের বছর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে তাঁরা ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুললেন, কিন্তু দেশের মধ্যে মধ্যপন্থীদের প্রভাব তখন প্রায় অস্তমিত।

সংস্কার প্রস্তাবটিকে গান্ধীজি প্রথমে খুব খারাপ চোখে দেখেন নি। কিন্তু সরকারী নীতির এক চরম ভ্রান্তি এই সময় প্রকাশ পেল জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৮-র অন্তর্বর্তীকালীন বৈপ্লবিক আন্দোলনের পর্যালোচনা করার জন্য যে রাওলাট কমিটি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা সরকারকে পরামর্শ দেন যে সরকারবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে যাঁদের সন্দেহ করা হবে তাঁদের বিনাবিচারে যেমন খুশি গ্রেফতার এবং অন্তরীণ করা এবং তাঁদের গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তাঁদের পরামর্শ জুরি ছাড়াই রাজনৈতিক কেসগুলি বিচার করার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া হল, আর তাঁর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল করবার কোনো সুযোগ রাখা হল না। সরকারবিরোধী যে-কোনো প্রচার পুস্তিকা কাছে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতে লাগল।

রাওলাট কমিটির এই প্রস্তাবগুলি গান্ধীজির চোখ খুলে দিয়েছিল, তাঁর উক্তির মধ্যেই তাঁর উপলব্ধি প্রতিফলিত : 'আমলাতন্ত্র যে আমাদের কণ্ঠরোধ করার নীতি জিইয়েই রাখতে চান এ প্রস্তাবগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি মনে করি এই বিলগুলি আমাদের সামনে এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে।'

গান্ধীজির অভ্যুদয়

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতারূপে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক চমকপ্রদ কাহিনী। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে তিনি বীরের মতো যে সংগ্রাম করেছিলেন তার খ্যাতি ভারতে এসে পৌঁছেছিল—সংগ্রাম-কৌশল হিসেবে তাঁর সত্যাগ্রহ যথেষ্ট সুফল অর্জন করেছিল দক্ষিণ-আফ্রিকার আন্দোলনে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা তাঁর চরিত্র ও সংগঠনক্ষমতা সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তবে ১৯১৫-তে যখন তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন কংগ্রেস মহলে তিনি তখনো কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন নি; দেশের সাধারণ মানুষ তখনো তাঁকে চেনে না। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ তরুণদের তাঁকে মনে হয়েছিল 'রাজনীতির সম্পর্কবিহীন, ভিন্ন গোত্রের, ভীষণ দূরের মানুষ' ব'লে।

তবে এই দূরত্ব তাঁর কাছে আশীর্বাদস্বরূপই হয়েছিল। মধ্যপন্থী, এমন-কি, কিছুটা পরিমাণে চরমপন্থীদের সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের যেমন মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে সেরকম হবার অবকাশ ঘটে নি। তাঁর অনাড়ম্বর স্বভাব, সাধুসুলভ মাধুর্য, ইংরেজির চেয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, ধর্মগ্রন্থে আসক্তি সব-কিছু দেশের মানুষের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল, অচিরেই তিনি তাদের হৃদয় জয়

করে নিলেন। দেশের মাটিতেই তাঁর শিকড় ছিল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, তাই হ'ল তাঁর বিপুল শক্তির উৎস।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গান্ধীজি যে স্বকীয় কর্মদর্শন গড়ে তুলেছিলেন সে কর্মদর্শন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের প্রদান উপাদন দুটি : সত্য এবং অহিংসা। গান্ধীজি বলতেন সত্যাগ্রহ হল আত্মার শক্তি অথবা প্রেমের শক্তি—এবং সে শক্তির উৎস সত্য এবং অহিংসা। সত্যের মর্যাদা রক্ষা করতে তিনি প্রতিপক্ষকে আঘাত করায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি মনে করতেন নিজে দুঃখ বরণের মধ্যে দিয়েই সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই আচরণের মধ্যে দিয়েই যে অমঙ্গলকারী তার বিবেক জাগ্রত করা সম্ভব। তিনি বলতেন, সকল সত্যাগ্রহী হতে গেলে ভয়, ঘৃণা এবং মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে তাঁর দর্শনের পার্থক্য ছিল, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যি হিংসা ত্যাগ করতে হবে সুবিধার কথা ভেবে নয়, নীতি এবং বিশ্বাসের নির্দেশে। তিনি মনে করতেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুর্বলের অস্ত্র, আর সত্যাগ্রহ হল সবলের হাতিয়ার।

গান্ধীজির বীজমন্ত্র ছিল স্বদেশী। তিনি বলতেন, স্বদেশী হল 'আমাদের মধ্যেকার সেই শক্তি যা দূরের জিনিসকে দূরে রেখে আমাদের একান্ত কাছের জিনিসের ব্যবহারে ও সেবায় আমাদের আগ্রহী করে।' কায়িক শ্রম (তাঁর ভাষায় 'রুটি-শ্রম') ও চরকার ওপর তিনি কেন এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা স্বদেশী সম্পর্কে তাঁর এই ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যাবে।

আফ্রিকায় সত্যাগ্রহকে সফল করে তুলতে পেরেছিলেন গান্ধীজি, তাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্যাগ্রহের শক্তি পরীক্ষার বাসনা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি স্মরণীয়, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী, তবে প্রতিকার হিসেবে সত্যাগ্রহও যে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।' বিহারে চম্পারণ, গুজরাটে আমেদাবাদ এবং জইবার সত্যাগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন তিনি।

দেশের অন্যান্য রাজনীতিবিদরা তখন শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত বিতর্কে মগ্ন। গান্ধীজি এগিয়ে এলেন বিহারের চম্পারণবাসী কৃষকদের ডাকে। তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার চাপে পড়ে চম্পারণের কৃষকেরা মোট জমির ৩/২০ অংশে নীল চাষ করতে বাধ্য হত, উৎপন্ন নীল তাদের বেচতে হত ব্রিটিশ নীলকরদের বাঁধা দামে। নীলকরদের বেআইনি শোষণ আর নির্যাতনেরও কোনো সীমা ছিল না। কারারুদ্ধ হবার ভয়কে অগ্রাহ্য করে গান্ধীজী নীলচাষীদের সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ অনুসন্ধান চালালেন, তারপর কৃষকদের সুচিরস্থায়ী দুর্দশার তর্কাতীত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করলেন সরকারের কাছে। সরকার এর ফলে বাধ্য হলেন একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করতে। অনুসন্ধান কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন গান্ধীজি স্বয়ং।

চম্পারণে গান্ধীজির উদ্যোগের ফল শুধু তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ নয়; যুগ যুগ সঞ্চিত জড়ত্ব ও তন্দ্রা থেকে গ্রামগুলি জেগে উঠল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহর-উল-হক, মহাদেব দেশাই, জে. বি. কৃপালনি প্রমুখ অনেক তরুণ জাতীয়তাবাদী গান্ধীজির সঙ্গে চম্পারণে কাজ করেছিলেন; তাঁর আদর্শবাদ এবং একই সঙ্গে তাঁর নির্ভীক, গতিশীল ও গভীরভাবে বাস্তবানুগ রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তাঁদের সকলকে প্রভাবিত করেছিল।

গুজরাটের কইরা জেলাতেও একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হল। ১৯১৮-তে এই জেলাটিতে আশানুরূপ ফলন হয় নি, কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা ভূমিরাজস্বের পরিমাণ এতটুকু কমাতে রাজি হলেন না। গান্ধীজির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে কৃষকেরা সত্যাগ্রহ শুরু করল। তাদের যত কষ্টই হোক, তারা স্থির করল খাজনা দেবে না। এমন-কি, খাজনা দেবার সামর্থ্য যাদের ছিল তারাও জোরজুলুম ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয় তুচ্ছ করে নীতির নির্দেশে খাজনা না দেবার সংকল্প নিল। সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে কৃষকদের সঙ্গে একটা রফায় আসতে রাজি হলেন। এই আন্দোলনে গান্ধীজির অন্যতম প্রধান সহকর্মী ছিলেন ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। এই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন আমেদাবাদের একজন দৃঢ়চেতা প্রতিপত্তিশালী ব্যারিস্টার। কইরা সত্যাগ্রহের সাফল্যে তিনি এত অভিভূত হন যে ক্রমে তিনি গান্ধীজির অন্যতম প্রধান অনুগামী হয়ে ওঠেন।

১৯১৮-তেই গান্ধীজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আমেদাবাদের মিল-মজুরদের প্রতি। মিল মালিকেরা মজুরদের বেতন বাড়াতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের নিয়ে শুরু করলেন ধর্মঘট। মজুরদের সংকল্প আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসছিল; তখন তাদের সাহস দেবার জন্য তিনি উপবাস আরম্ভ করলেন। এর ফল হল অভাবিত। সারা ভারতের দৃষ্টি আমেদাবাদ ধর্মঘটের ওপর গিয়ে পড়ল; আমেদাবাদের মিল-মজুরেরা ঐক্যবোধের মধ্যে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল। বিপদ আশঙ্কা করে উপবাসের চতুর্থ দিনে মিল-মালিকেরা নতি স্বীকার করল, এবং রাজি হল মজুরদের বেতন শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়ে দিতে।

সত্যাগ্রহের এই প্রথম পরীক্ষা গান্ধীজিকে জনগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিল; গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে যেমন, শহরাঞ্চলের মজুরদের সঙ্গেও তেমনি, তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল। এই যোগাযোগ জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির অন্যতম মহৎ অবদান। তাঁর আগেও স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্যে যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক ছিল। তাঁর আগেও নেতারা গভীর অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ করতেন। প্রচুর পরিশ্রমে আহৃত অর্থনৈতিক তথ্য সাজাতেন নিশ্ছিদ্র যুক্তির আকারে। তবু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গান্ধীজির আবির্ভাবের আগে শহরাঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি। জনগণের দাবিকে তাঁরা সমর্থন করতেন

না তা নয়, তবু সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল তাঁদেরই হাতে। গান্ধীজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, জনসাধারণ সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠল। তিনিই বোধ হয় একমাত্র নেতা যিনি গ্রামাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তিনি এমনভাবে গড়ে তোলেন যে গ্রামবাসীরা তাঁকে আপন বলে মনে করত, তাঁর ভাষা সহজেই তারা বুঝত। ধীরে ধীরে গ্রাম-ভারতের অগণিত মানুষের কাছে তিনি দরিদ্র ও নিপীড়িতের প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন। তাঁর মধ্যে মূর্ত হল প্রকৃত ভারতীয়ের রূপ— সে রূপের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহের অবকাশ নেই

গান্ধীজির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল আরো তিনটি বিষয় : হিন্দুমুসলিম ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মহিলাদের মর্যাদাবৃদ্ধি। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের তিনি উল্লেখ করতেন হরিজন ব'লে। তাঁর স্বপ্নের ভারত সম্পর্কে গান্ধীজি একবার লেখেন :

> আমি এমন ভারত গড়ে তোলার কাজে প্রয়াসী হব, যাকে দরিদ্রতম ব্যক্তিও নিজের দেশ বলে মনে করবে আর যাকে গড়ে তোলার কাজে তারও অবদান ব্যর্থ হবে না। সে ভারতে কোনো উঁচু বা নিচু শ্রেণী থাকবে না, সব সম্প্রদায়ই বাস করবে পূর্ণ ঐক্যবোধের মর্যাদায়।...সে ভারতে থাকবে না অস্পৃশ্যতার অভিশাপ.. মহিলারা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবেন...সেই আমার স্বপ্নের ভারত।

ভারতবাসীদের সার্বিক বিরোধিতা সত্ত্বেও রাওলাট বিল প্রবর্তিত হল; গান্ধীজির পক্ষে আর ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন এর বিরোধিতা করবেন সত্যাগ্রহ দিয়ে। এবার তাঁর আন্দোলনের পরিসীমা আর আঞ্চলিক নয়, তার লক্ষ্যও সীমিত নয়। সত্যাগ্রহ সভা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দমনমূলক আইন অমান্যের শপথ কী ভাবে নেওয়া যায় তার উপায় বার করলেন তিনি। ১৯১৯-এর ৬ এপ্রিল সারা দেশে সাধারণ হরতাল ডাকা হল; স্থির হল হরতালের পর শুরু হবে আইন অমান্য আন্দোলন। হরতালটি অভূতপূর্বভাবে সফল হ'ল, কিন্তু দিল্লিতে জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেকে হতাহত হলেন। গান্ধীজি দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, পথে তাঁকে থামিয়ে জোর করে বোম্বাই-এ ফেরত পাঠানো হল। জনস্রোতের ওপর পুলিশের আবার লাঠি চালনার ফলে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হল দাঙ্গা।

১৩ এপ্রিল ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। যুদ্ধ-ঋণের ব্যাপারে এবং সৈন্যনিয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নর ও'ডায়ার যে রূঢ় পদ্ধতি গ্রহণ করতেন তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাঞ্জাববাসীদের মধ্যে এ সময় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। খিলাফৎ প্রচার কার্যের ফলে মুসলমানদের মধ্যেও উত্তেজনা কিছু কম ছিল না। অযথা ভয় পেয়ে সরকার আদেশ দিলেন প্রধান দুই নেতা ডা: সত্য পাল ও ডা: সৈফুদ্দিন

কিচলুকে গ্রেফতার করতে। এই গ্রেফতার কেন্দ্র করে অমৃতসরে জনতার তাণ্ডব শুরু হল। পুলিশ গুলি বর্ষণ শুরু করার পর কয়েকজন কর্মচারী নিহত হলেন, সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন দুজন ব্রিটিশ মহিলা। জেনারেল ডায়ার সারা পাঞ্জাবকে আতঙ্কে হতবাক্ করে দেবেন স্থির করেছিলেন; তাই পরদিন সমস্ত ভয় তুচ্ছ করে জনতা যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিক-ঘেরা উদ্যানে সমবেত হল, কোনোরকম সতর্কবাণী উচ্চারণ না করেই ডায়ার তাঁর সৈন্যবাহিনীকে গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। যতক্ষণ না তাঁর সমস্ত রসদ ফুরিয়ে গেল ততক্ষণ তিনি থামলেন না; জালিয়ানওয়ালাবাগ ছেড়ে যাবার সময় তিনি পিছনে ফেলে রেখে গেলেন এক হাজার মৃত ও কয়েকহাজার আহতের স্তূপ। যে হত্যাকাণ্ডকে মণ্টেগু পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন, 'প্রতিরোধক হত্যাকাণ্ড' ব'লে এখানেই তার শেষ নয়। এরও ওপর জারি হল একাধিক অপমানকর হুকুম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কার্ফু জারি হল; জনসাধারণকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হতে লাগল, আর যে জায়গাটিতে দুই ব্রিটিশ মহিলার ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল লোকজনেকে সেখানে বাধ্য করা হল হামাগুড়ি দিয়ে যেতে। প্রতিদিন ষোল মাইল হেঁটে ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরা দিয়ে আসতে বাধ্য হল। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের বন্দী করে রাখা হল খাঁচার মধ্যে। সরকারের হাতে একাধিক ব্যক্তি বন্দী হলেন জামিন হিসেবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবাধে লুণ্ঠন অথবা বাজেয়াপ্ত হতে লাগল। আর ঐক্যপ্রচেষ্টার ফল কী নিদারুণ হবে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য জোড়ায় জোড়ায় হিন্দু-মুসলমানদের হাতে হাতকড়ি পরানো হতে লাগল। জারি হল সামরিক আইন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন; ধিক্কারের ভাষা মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর লেখনীতে :

> আমরা এমন একটি সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যখন অপমানের হাত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অসমঞ্জস সম্মানের অভিজ্ঞান আমাদের লজ্জাকেই দিয়েছে অনাবৃত করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই বিশেষ সম্মানের সবরকম ভার থেকে মুক্ত হয়ে আমার সেই স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে, যে তার তথাকথিত তুচ্ছতার দায়ে অমানুষিক অবমাননার ভারে নত।

পাঞ্জাবের ট্র্যাজেডি গান্ধীজিকে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে নিয়ে এল। সরকার লর্ড হাণ্টারের পরিচালনায় একটি সরকারী অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, কংগ্রেস সে কমিটিকে বয়কট করলেন। আগের যুগের অনেক মধ্যপন্থী এসে যোগ দিলেন গান্ধীজির দলে।

১৯১৯ সালে অমৃতসরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসল তাতে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা গেল। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ চাইলেন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে। আর তিলক ছিলেন প্রতিবেদনশীল সহযোগিতার সমর্থক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা আপস রফা হ'ল।

কংগ্রেস স্থির করলেন যে প্রস্তাবিত সংস্কারকে এমনভাবে কাজে লাগাবেন, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। চিত্তরঞ্জন অবশ্য তাঁর মনোভাব আদৌ গোপন রাখেন নি; তিনি আদৌ 'বিরোধিতার বিপক্ষে ছিলেন না। রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যদি স্পষ্ট এবং পুরোদস্তুর বিরোধিতার প্রয়োজন হয়' তা হলে তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি—এই আন্দোলনকে অবলম্বন করেই তিনি অচিরে সরকারের বিরুদ্ধে শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়েই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। তিনি মনে করতেন যে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে এই ঐক্যের ভিত্তি আদৌ যথোপযুক্তভাবে স্থাপিত হয় নি। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁর মনে হচ্ছিল যে খিলাফৎ বিষয়ে তাঁদের দাবি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। তাঁদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। ভার্সাই চুক্তির ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন স্বভাবতই খিলাফৎ আন্দোলনের তীব্রতা গেল বেড়ে। ভারতের মুসলমান সমাজ স্থির করলেন তাঁরা ব্রিটেনকে বাধ্য করবেন তাঁদের তুরস্ক নীতি পরিবর্তন করতে। মৌলানা আজাদ, হাকিম আজমল খান এবং হসরৎ মোহনির নেতৃত্বে একটি খিলাফৎ কমিটিও গঠিত হল। গান্ধীজির মনে হল, এই সুবর্ণ সুযোগ : 'হিন্দু এবং মুসলমানের ঐক্যসাধনের এমন সুযোগ একশো বছরেও আর আসবে না।' তিনি স্থির করলেন এ আন্দোলনকে সাহায্য করবেন। গান্ধীজি অবশ্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে অত্যন্ত সরলভাবে, হৃদয়ের মিলন বলে ভাবতেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি লিখেছিলেন, 'মুসলমানকে যদি আমি আমার ভাই বলে মনে করি তা হলে তার বিপদ উপস্থিত হলে এবং ন্যায় তার দিকে আছে বুঝতে পারলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমার কর্তব্য।'

১৯১৯-এর নভেম্বরে গান্ধীজি খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়কে উপলক্ষ করে যে-সব প্রকাশ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, খিলাফৎ সম্মেলন মুসলমান সমাজকে সে-সব উৎসবে যোগদান থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। সম্মেলন সরকারকে ভয় দেখালেন যে তুরস্কের প্রতি যদি ন্যায়বিচার না দেখানো হয়, তা হলে তাঁরা বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন। মৌলানা আজাদ, আক্রাম খান, ফজলুল হক প্রমুখ নেতা খিলাফৎ আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সমর্থনে সারা বাংলাদেশ পরিক্রমা শুরু করলেন। এইভাবে উত্তর-ভারত পরিক্রমা করে জনমত প্রভাবিত করার ভার নিলেন দেওবন্দ গোষ্ঠীর মৌলানা এবং লক্ষ্ণৌ-এর উলেমারা। কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে এবং মুসলিম লীগও এই আন্দোলনের প্রতি জানালেন অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯২০-র গোড়ার দিকে হিন্দু ও মুসলমানের একটি মিলিত প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। ভাইসরয়

অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁদের আশা ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিলেও আর-একটি প্রতিনিধিদলকে অচিরেই পাঠানো হল ইংলণ্ডে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নিরাবেগ জবাবে জানালেন যে পরাজিত ক্রীশ্চান শক্তিগুলির প্রতি যেরকম আচরণ করা হবে, তুরস্কেরও তার চেয়ে ভালো কিছু প্রত্যাশা করার কোনো কারণ নেই। সেভরস-এর সন্ধির শর্তগুলি জানা গেল মে মাসের মাঝামাঝি। কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এর ওপর তুরস্কের অধিকার এই শর্তগুলির ফলে অব্যাহত রইল। কিন্তু তার আয়তন এবং জনসংখ্যা হ্রাস পেল প্রভূত পরিমাণে। গান্ধীজি এবার স্থির করলেন খিলাফৎ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন। আন্দোলন শুরু হল ১ অগাস্ট।

আন্দোলনটিকে সফল করে তুলতে গেলে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল অপরিহার্য। কংগ্রেসের সমর্থন অর্জন করতে গান্ধীজিকে অবশ্য কম বেগ পেতে হয় নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আবেদনের মাধ্যমে তিনি মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী দুদলেরই নেতা ও সমর্থকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে তিনি নিপুণভাবে মিশ্রণ ঘটালেন মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী ভাবাদর্শের : মধ্যপন্থীদের মতো তিনিও চাইলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকেই ভারত স্বরাজ লাভ করবে, আর স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি গ্রহণ করলেন চরমপন্থী পথ, অসহযোগ। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা পর্যন্ত তাঁকে একবার সুযোগ দেবার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। গুজরাট এবং বিহার কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই তাঁকে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯২০-র অগাস্টে তিলক পরলোকগমন করেন। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির কর্মপন্থার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার উৎসটুকুও স্তব্ধ হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন যে তাঁর মানসিক দ্বিধা পুরোপুরি বর্জন করে ফেলতে পেরেছিলেন তা নয়, তবে আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের জন্য গান্ধীজির আহ্বান তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। ১৯২০-র ৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল এবং সমস্ত বিষয়টি তন্ন তন্ন করে বিচার করে দেখা হল উত্তেজিত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। গান্ধীজি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলি বয়কট করার প্রস্তাব আনলেন, তাঁর বিরোধিতা করে চিত্তরঞ্জন বললেন, 'এই সংস্কারগুলিকে ভারতবাসীর কাছে ব্রিটিশ সরকারের দান বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকারের হাত মুচড়ে এদের বের করে আনতে হয়েছে। আমি চাই কাউন্সিলগুলিকে স্বরাজ লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। আমাদের হাতের মুঠোয় যে অস্ত্র আছে, তাকে ব্যবহার করতে হবে পূর্ণ, অখণ্ড স্বরাজলাভের কাজে।' সরকারকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে কাউন্সিলে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁর ছিল না; কাউন্সিলের মধ্যে দিয়ে সরকারকে বিব্রত কবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর নীতি। এও একধরনের অসহযোগ, তবে এ অসহযোগ বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে।

আরো কতকগুলি মত প্রকাশিত হল কলকাতা অধিবেশনে। লাজপত রায় মত

প্রকাশ করলেন স্কুল বয়কটের বিপক্ষে। বিপিনচন্দ্র পাল পরামর্শ দিলেন, আন্দোলনের আয়োজন করা হোক সতর্কতার সঙ্গে। মতিলাল নেহরু অবশ্য পরিস্থিতি গান্ধীজির অনুকূলে এনে দিলেন এবং আর-এক দফা আপস রফা হল। স্থির হল স্কুল এবং কোর্ট কাছারি ক্রমে ক্রমে বয়কট করা হবে কিন্তু নির্বাচনের প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করে নেবেন এবং ভোটাররা ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন। রাজনৈতিক দাবির তালিকায় স্বরাজের স্থান আগের মতোই থাকবে। আর আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে। সরকারী সংস্কারের আওতায় প্রথম যে নির্বাচন হতে চলেছিল তাতে অংশ গ্রহণ করা থেকে এইভাবে বিরত হলেন কংগ্রেস। নাগপুরে যখন অধিবেশন বসল, চিত্তরঞ্জন ধরে নিলেন যে প্রসঙ্গটি ইতিমধ্যেই অচল হয়ে গেছে।

দুটি কারণে গান্ধীজির পক্ষ এসময়ে খুব সবল হয়ে উঠেছিল। এক, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থেকে হত্যাকাণ্ডের সমকালীন পাঞ্জাব গভর্নর ও ডায়ারকে মুক্তি দান, আর দুই, ভারতকে পুর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন সরকার গঠনের অধিকার দিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অসম্মতি। চিত্তরঞ্জন বুঝতে পারলেন যে বাংলার প্রতিনিধিরাও হয়তো তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে চাইবেন না। মহম্মদ আলির মধ্যস্থতায় এবারের আপস সম্ভব হল। চিত্তরঞ্জনই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবে বলা হল যে সরকারের সঙ্গে সকল প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত সংস্রব বর্জন করা থেকে শুরু করে কর বন্ধ করা পর্যন্ত যত রকম পরিকল্পনা আন্দোলনের তালিকাভুক্ত, কংগ্রেসের নির্ধারিত সময়ে তাদের কার্যকর করা হোক। কর্মসূচীটিকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে কতকগুলি বিষয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হল, যেমন : কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ, আইন ব্যবসা বর্জন, শিক্ষাব্যবস্থার স্বদেশীকরণ, অর্থনৈতিক বয়কট, জাতীয় কর্মোপযোগিতার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন, এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় তহবিল সংগঠন।

অধিবেশনে স্বরাজ্যের প্রস্তাবিত লক্ষ্যের বিরোধিতা করলেন মালব্য ও জিন্না, কেননা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকবে কিনা প্রস্তাবের মধ্যে তা স্পষ্ট করে বলা ছিল না। 'পরবর্তী বছরে উগ্র কর্মপন্থার যে প্রতিশ্রুতি' গান্ধীজি দিলেন তা সমস্ত বিরোধ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে পড়ল মাত্র দুটি ভোট।

নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের নতুন সংবিধান রচিত হল। সে সংবিধান কংগ্রেসের সংগঠনে নিয়ে এলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাকে দিল এক সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী রাজনৈতিক রূপ। ১৫ জন সদস্যের একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হল আর ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হল একটি সর্বভারতীয় সমিতি। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সমিতিগুলির শক্তির মূল ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায় মফঃস্বল শহরে, তালুকে এবং গ্রামে। কার্যকরী সমিতিটিকে এমনভাবে গঠন করা হল যাতে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের

উপাদানের বেশি অনুপ্রবেশ না ঘটে। স্থির হল সারা বছর ধরে কার্যকরী সমিতি সক্রিয় থাকবে এবং তার সিদ্ধান্তগুলি প্রধানত সর্বসম্মতিনির্ভর হবে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার ভার থাকবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ওপর। সর্বভারতীয় কমিটি কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে অগ্রাহ্যও করতে পারবেন। প্রাদেশিক কমিটিগুলি গঠিত হল ভাষার ভিত্তিতে, ফলে প্রত্যেক অঞ্চল বা প্রদেশে স্থাপিত হল একটি করে প্রাদেশিক কমিটি। স্থির হল, যে গ্রামে পাঁচজন বা তার বেশি কংগ্রেস সদস্য থাকবেন সেখানে একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হবে। গ্রামকেন্দ্রগুলির ওপর ধাপে ধাপে আরো বড়ো কেন্দ্র গঠিত হবে সার্কেল, তালুক এবং জেলায়। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতি ৫০,০০০ জনের মধ্যে থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন।

এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস অনেক বেশি মাত্রায় প্রতিনিধিমূলক হয়ে উঠল। কংগ্রেসের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ছিল মাত্র চার আনা, তাও আবার চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। কংগ্রেসের লক্ষ্য ও নীতিতে বিশ্বাসী হলেই কংগ্রেস সদস্য হওয়া যেত। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে কংগ্রেস আর দূরের জিনিস হয়ে রইল না। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বেড়ে চলল। তার ওপর সভ্য হবার বয়স কমিয়ে যখন আঠারোয় নিয়ে আসা হল, তখন যুবপ্রাণের প্রাচুর্য দেখা দিল কংগ্রেসের মধ্যে। কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান ও মহিলা সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে গেল। ১৯২৩-এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা শহরাঞ্চলের সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল। তবে এই নতুন সামাজিক গঠনের মধ্যেই কংগ্রেসের পরিবর্তন সীমিত রইল না; তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতিতেও এল মৌলিক পরিবর্তন। কংগ্রেস সদস্যেরা আর নামেমাত্র সদস্য রইলেন না, যে সচেতন দায়িত্বভার তাঁরা গ্রহণ করতে লাগলেন তার জন্য আত্মত্যাগ ছিল অপরিহার্য। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে সমাজবদ্ধ করার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল কংগ্রেস পার্টি। খাদি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, মদ্যপান নিবারণ, জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি নানা গঠনমূলক কাজে হাত দিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের উদ্যোগে হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ব্যবহার শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধানের বেড়া ভেঙে দিল। এই সময় তিলক স্বরাজ ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছিল, ছ মাসের মধ্যে তাতে যে চাঁদা উঠল তার পরিমাণ এক কোটি টাকারও বেশি। আর্থিক দিক দিয়েও কংগ্রেসের অবস্থা নিরাপদ হল এর ফলে। জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে ধর্ম-নিরপেক্ষ কংগ্রেস পার্টি প্রস্তুত হল গান্ধীজির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নামতে—এবার হাতে তার অভিনব হাতিয়ার। কংগ্রেস প্রার্থীরা ইতিমধ্যে সবাই নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এবার আইনজীবীরা কোর্ট-কাছারি বয়কট করতে শুরু করলেন, শুরু হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশী কাপড় আর মদের দোকান বয়কট। চিত্তরঞ্জন ঘোষণা

করলেন, 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজের আর অপেক্ষা করার সময় নেই।' অসংখ্য ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল, শিক্ষকরাও পদত্যাগ করলেন দলে দলে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হল এই সময়। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার ভার নিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ জাকির হোসেন, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকে।

১৯২১-এর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী কাপড়ের পূর্ণ বয়কট সাধিত হবে স্থির হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় পিকেটিং এবং প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে দিয়ে যেমন বয়কটকে সফল করে তোলা হয়েছিল, ঠিক হল এবারও তাই হবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে থেকে সংগঠিত হল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল; তারা নিল জাতীয়তাবাদী প্রচারকার্যের ভার, চাঁদা এবং দান সংগ্রহের দায়িত্বও রইল তাদের ওপর। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যারা সহযোগিতায় লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠন করে, সালিসি আদালত পরিচালনা করে আর বিদেশী পণ্যের দোকানগুলি পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করে ছাত্রেরা বয়কটের সাংগঠনিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলল।

সারা দেশে এ আন্দোলন নিয়ে এল এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার জোয়ার। উচ্চ নীচ, পুরুষ মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, রক্ষণশীল উদারনৈতিক চরমপন্থী সকলেই এর দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হলেন। সংগ্রামের ডাকে দলে দলে মহিলা বেরিয়ে এলেন পর্দা ছেড়ে; তিলক তহবিল তাঁদের দানের অলংকারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল; সানন্দে কারাবরণ করতেও তাঁরা দ্বিধা করলেন না।

খিলাফৎ কমিটি মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন সৈন্যবাহিনীতে যোগদান না করেন। এ নির্দেশের ফলে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করা হল। সরকারের সঙ্গে সকল সহযোগিতার সম্পর্ক ত্যাগের জন্য ভারতীয়দের আহ্বান জানালেন কংগ্রেস। আন্দোলনের উত্তেজনা ক্রমশ আরো বৃদ্ধি পেল। কর্মহীন শ্রমিক, কারখানার কর্মী, শহরাঞ্চলের দরিদ্র নাগরিক সবাই এসে যোগ দিতে লাগলেন আন্দোলনে। কতকগুলি বড়ো বড়ো ধর্মঘট এ সময় পালিত হল। ধর্মঘটগুলি শুধু শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই সীমিত রইল না, ছড়িয়ে পড়ল আসামের সুদূর চা-বাগান অঞ্চলেও।

গ্রামাঞ্চলগুলিও নতুন উৎসাহের প্রাবল্যে প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে জেগে উঠল। খাজনা বন্ধের যে আহ্বান কংগ্রেস ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলেন তা সরাসরি কৃষকদের মর্মে গিয়ে পৌঁছল। মেদিনীপুরের কৃষকেরা স্থির করল তারা আর ইউনিয়ন বোর্ডের খাজনা দেবে না। বাংলাদেশে প্রথম কৃষক সংঘও গঠিত হল এই সময়। গুণ্টুরে দুগিগ্বালা গোপালকৃষ্ণায়া যে বিক্ষোভ সংগঠন করলেন তাতে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হল। চিরালার সমস্ত নাগরিক মিউনিসিপ্যালিটির কর দেবার আদেশ

অগ্রাহ্য ক'রে বাইরে গিয়ে এক নতুন শহরের পত্তন করলেন। বেজওয়াদায় গড়ে উঠল একটি পাল্টা কাউন্সিল। পেড্ডনডিপণ্ডুর সমস্ত পদস্থ গ্রামকর্মচারীরা কাজ থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন, আর কর দিতে অস্বীকৃত হলেন করদাতাদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৯৫ জন। গুন্টুর, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলার অধিবাসীরাও সংকল্প নিলেন যে তাঁরা কর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। পালনাভে বন্ধ করা হল পশুচারণ বাবাদ ধার্য খাজনা। আর এই সবকটি সংকল্পের পক্ষেই রইল অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সমর্থন। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে খাদি, অহিংসা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নীতিকে যদি মেনে চলা হয় তা হলে এ আন্দোলনে সম্মতি দিতে তাঁরা রাজি আছেন। গান্ধীজি একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন যে রায়তদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে, গুন্টুরের আন্দোলনকারীরা সে শর্ত মেনে নিতেও রাজি হলেন। উত্তরপ্রদেশের রায় বেরিলী ও ফৈজাবাদের ভাড়াটিয়া প্রজারা বন্ধ করলেন বেআইনি খাজনা দেওয়া; ফলে জমিদার ও পুলিশবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা কোর্ট-কাছারি আক্রমণ শুরু করল; যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের উদ্ধার করে আনার জন্য শুরু হল প্রবল উন্মাদনা। জাতীয় রাজনীতিতে এই সময়ে জওহরলাল নেহরুর কর্মজীবনের সূচনা। এই ঘটনাগুলি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রধান প্রধান কোলিয়ারিগুলিতে ধর্মঘট শুরু হল। বিহারে ছোটোনাগপুরের আদিবাসীরা তানা ভগৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হুমকি দেখালেন চৌকিদারী কর ও খাজনা বন্ধের। উড়িষ্যায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। এখানে কণিকা রাজের ভাড়াটিয়া প্রজারা আবওয়াব দানে অস্বীকৃত হলেন। পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গুরুদ্বারগুলিতে দুর্নীতি উচ্ছেদনের প্রচেষ্টা চলছিল; এই আন্দোলন সংগঠনের পিছনে এই ধারণা কাজ করছিল যে দেবালয়গুলির নিয়ন্ত্রণাধিকার হাতে আনতে পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথও অধিকতর প্রশস্ত হবে। স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মালাবারের মোপলা আন্দোলনও তীব্র হয়ে উঠল, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এ আন্দোলন পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল।

সারাভারতব্যাপী এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারণা অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ভারতের গ্রামাঞ্চল প্রকৃত প্রস্তাবে অপরিমিত শক্তির আধার, সে শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশরাজের ক্ষমতার ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করা আদৌ দুঃসাধ্য নয়। লোকে ব্রিটিশ কাপড় কেনা কমিয়ে দিল কিনা কিংবা মদ বিক্রির পরিমাণ হ্রাস পেল কিনা তা নিয়ে সরকারের আদৌ খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সারা ভারত জুড়ে গণ-অভ্যুত্থান ঘটলে আর তাঁদের উদ্‌বেগের অন্ত থাকত না।

প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স-এর ভারত-পরিদর্শনকে উপলক্ষ করে যে বয়কট সংগঠিত

হল তার সাফল্য আরো চমকপ্রদ। এই উপলক্ষে বোম্বাই-এ হরতাল পালিত হয়। এখানের সমুদ্রতটে একটি জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়, গান্ধীজি সেখানে বিদেশী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করলেন। তবে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স-এর প্রতি আনুগত্য দেখানোর ফলে কিছু ইয়োরোপীয় ও পার্শী উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে নিগৃহীত হলেন। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও দাঙ্গার ফলে মারা গেলেন অন্তত ৫৩ জন লোক। কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, কিন্তু এখানেও পুলিশ ও খিলাফৎ-সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গা দেখা দেয়।

চাপে পড়ে সরকার স্থির করলেন দমননীতির আশ্রয় নেবেন। কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলিকে তাঁরা বেআইনি বলে ঘোষণা করলেন। প্রকাশ্য জনসভা ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। যে বাক্-স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন অসম্ভব সেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি একটি চ্যালেঞ্জের রূপ নিয়ে উপস্থিত হল। চিত্তরঞ্জন স্থির করলেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে। তিনি বললেন, 'আমার কব্জিতে আমি হাতকড়ার স্পর্শ অনুভব করছি, আমার দেহের ওপর লৌহশৃঙ্খলের ভার চেপে বসছে...সারা ভারতই এক বৃহৎ বন্দীশালা...সুতরাং কী এসে যায় যদি আমায় জেলের ভিতরে রাখা হয়, অথবা জেলের বাইরে? আমি জীবিত থাকি বা মৃত্যুবরণ করি তাতেই বা কী এসে যায়?' একে একে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রও গ্রেফতার হলেন; হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লেখাতে শুরু করল। কলিকাতার কারাগারগুলি উপছে উঠল বন্দীদের প্লাবনে, কারাকক্ষ পরিণত হল 'পবিত্র তীর্থস্থানে'। ক্রুদ্ধ পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অবর্ণনীয় এবং যথেচ্ছ অত্যাচার চালাল। নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী কয়েক মাসে কারারুদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ গিয়ে দাঁড়াল। চিত্তরঞ্জন নিজে কারাবরণ করলেন; তাঁর অনুগমন করলেন মতিলাল নেহরু, লাজপত রায় এবং গোপবন্ধু দাস।

১৯২১ শেষ হবার আগেই গান্ধীজি ছাড়া বাকি সব প্রধান নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এর আগে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি প্রত্যেকটি প্রদেশকে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে মোপলা বিদ্রোহ এবং বোম্বাই-এর দাঙ্গা শুরু হবার পর গান্ধীজি কিছুটা উদ্‌বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন। তিনি চাইলেন 'মন্থরতার মধ্য দিয়ে গতিবেগ আনতে।' শহরাঞ্চলে অহিংস আন্দোলন সফল হয় নি, তাই তিনি ঠিক করলেন শহর থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র সরিয়ে গ্রামে নিয়ে যাবেন। কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশন সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যক্তিগত ও জনতা-নির্ভর অসহযোগ আন্দোলনে সম্মতিদানের। ১৯২২-এর ১ ফেব্রুয়ারি ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীজি পাঠালেন তাঁর বিখ্যাত চরমপত্র : 'বাক্ স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রাথমিক দাবিগুলিকে আদায় করার জন্য কোনো অহিংস উপায় অবলম্বন ছাড়া এ দেশের সামনে আর কোনো পথ খোলা

ডাণ্ডিতে গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করছেন

খান আব্দুল গফফার খান

আবুল কালাম আজাদ

GREAT MARCH FOR LIBERTY BEGINS.

Mahatma Starts With His Chosen Band Of 78.

RUMOURS OF IMPENDING ARREST BELIED.

Ashram Besieged By Eager Crowds:

SOUL-STIRRING SCENES ON BIDDING FAREWELL.

1,000 WOMEN PARTICIPATE IN HUGE PROCESSION

CONGRESS FLAG HOISTED IN JAPAN

Association With Chinese Revolution Recalled

FIRST STEP TOWARDS SWARAJ

Gandhiji Addresses Aslali Villagers.

"MESSAGE OF SALT"

LABOUR GOVT. CAN'T PLAY TORY GAME

"Daily Herald" Quotes Burke On "Great Empire & Little Minds"

"NO REPRESSIVE POLICY IN INDIA".

সংবাদপত্রের বর্ণনায় ডাণ্ডি পদযাত্রা
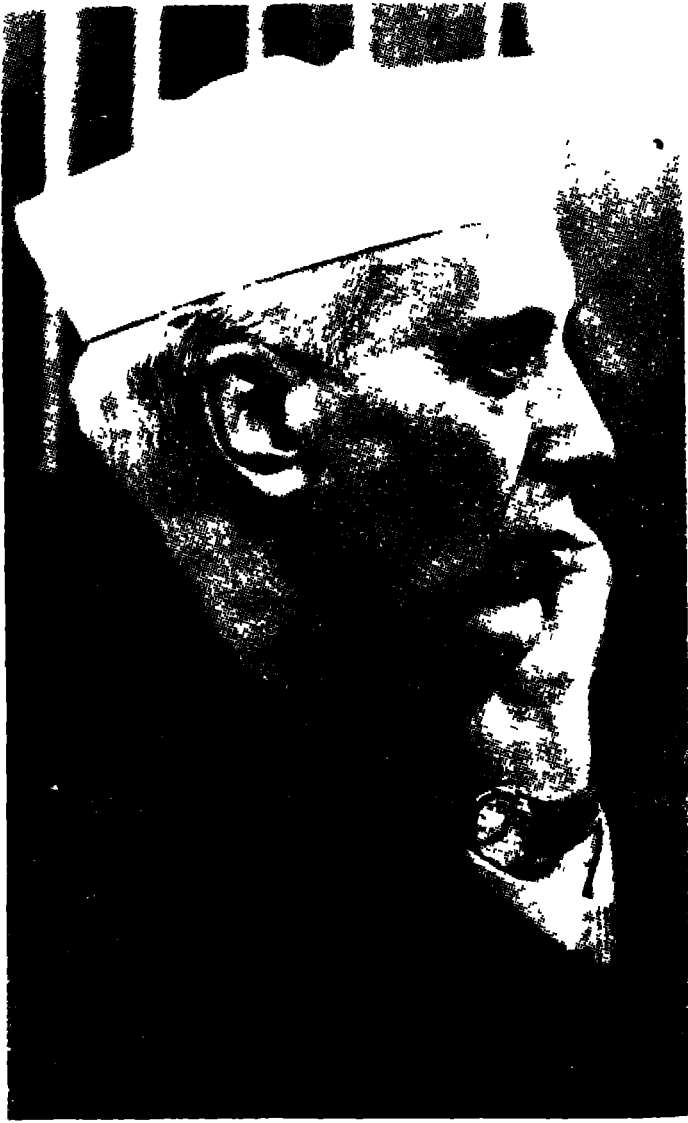
জওহরলাল নেহরু

কৃষ্ণ মেনন, জেনারেল লিষ্টার ও জওহরলাল নেহরু—স্পেন, 1938

গোবিন্দবল্লভ পন্থ

জয়প্রকাশ নারায়ণ
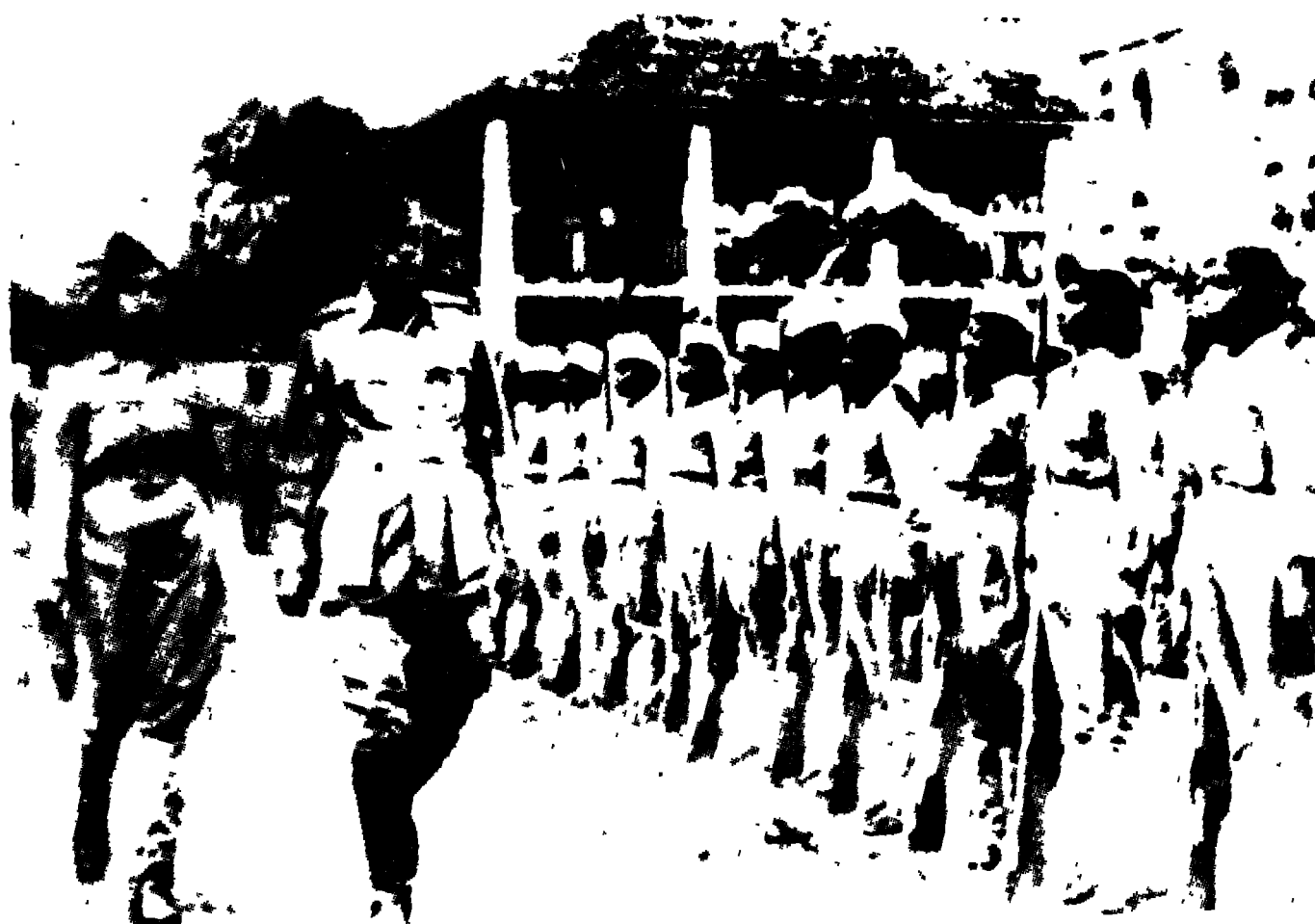
আজাদ হিন্দ ফৌজের নারীবাহিনী

নেই।' গুজরাটের বারদোলি তালুকে এই অহিংস পথের পরীক্ষায় ব্রতী হবেন বলে মনস্থ করলেন গান্ধীজি।

কিন্তু সংগ্রাম শুরু হবার আগেই অহিংস আন্দোলনের পরাজয় ঘটল। বারদোলিতে গণ-অসহযোগ তখনো শুরু হয় নি। ইতিমধ্যেই উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে জনতা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হলেন। পুলিশের যথেচ্ছ গুলিচালনার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু চাষী একটি থানায় আগুন লাগিয়ে দিল, ফলে মারা পড়ল বাইশ জন পুলিশ কর্মচারী। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো হল বারদোলিতে। গান্ধীজির সনির্বন্ধ অনুরোধে অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত পরিকল্পনা বর্জিত হল। কার্যকরী সমিতি তার বদলে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করলেন।

বারদোলির সিদ্ধান্ত মর্মাহত করল অনেক জাতীয় নেতাকেই। সুভাষচন্দ্র এ সিদ্ধান্তকে 'জাতীয় দুর্দৈব' বলে অভিহিত করলেন। জওহরলাল নেহরু এ সিদ্ধান্তে কতখানি 'বিস্মিত এবং হতবাক্' হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছেন নিজের আত্মজীবনীতে। এম. এন. রায়-এর মধ্যে গণশক্তির নয়, নেতৃত্বের দুর্বলতার সুস্পষ্ট পরিচয় দেখতে পেলেন। অন্যেরা অভিযোগ করতে লাগলেন যে জনগণের রাজনৈতিক তৎপরতাকে খর্ব করে তাদের উঁচু শ্রেণীকে মুঠোর মধ্যে রাখতেই গান্ধীজি আগ্রহী।

এ সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছেন তা তাঁর অনুগামীদের খুব সহজে বোঝাতে পারেন নি গান্ধীজি। নেহরুকে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে, 'তখন যদি একে স্থগিত না রাখা হত, তা হলে অহিংস আন্দোলন পরিচালনা করার বদলে আমরা মূলত হিংসাত্মক আন্দোলনেরই দায়িত্ব নিয়ে ফেলতাম। আমরা যে পিছু হঠেছি, এতেই বরং আমাদের শক্তি বাড়বে।...এর ফলে আবার আমরা স্বস্থানে ফিরে আসতে পেরেছি।' বারদোলির পূর্ববর্তী অনেক হিংসাত্মক গণ-অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্তই গান্ধীজি দেখাতে পারতেন। পরেও বারবার আন্দোলন স্থগিত রেখে তিনি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সত্যাগ্রহের পবিত্র নীতিকে বিসর্জন দিয়ে তিনি স্বরাজ অর্জন করতে চান না। তাঁর অস্ত্রহীন সংগ্রাম যে সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে এ কথা তিনি জানতেন, আর এও জানতেন যে, সে সংগ্রামে হিংস্রতারই যদি আশ্রয় নেওয়া হয় তবে জিতবে কোন পক্ষ।

আন্দোলনের গতিবেগে মন্থরতা

ইতিমধ্যে লর্ড রেডিং সারাক্ষণই চেষ্টা করেছিলেন সেভরস্-এর সন্ধি সংশোধন করে এবং খলিফাকে অনুগ্রহ দেখিয়ে কংগ্রেস এবং খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের মধ্যে কি ভাবে ভাঙন ধরানো যায়। অসহযোগ আন্দোলনে যতক্ষণ না ফাটল ধরল ততক্ষণ গান্ধীজিকে গ্রেফতারের ব্যাপারে তিনি কোনো তৎপরতা দেখান নি। তাঁর মতে, বারদোলি সিদ্ধান্তের ফলে কংগ্রেস 'সংগঠনের কাছে সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য আর কোনো লক্ষ্য অবশিষ্ট ছিল না। এ সিদ্ধান্তের পর থেকেই কংগ্রেসে ভাঙন এবং

সংহতির অভাব দেখা দিয়েছিল; সমস্ত উৎসাহ মিলিয়ে যাবার ফলে মোহভঙ্গ ও নিরুদ্যমের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন পার্টির সকল স্তরের মানুষ।' সরকার-বিরোধী প্রচারের অপরাধে ১৯২২-এর ১০ মার্চ তিনি গান্ধীজিকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন।

দোষ স্বীকার করে নিয়েও নিজের কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে যে বক্তব্য গান্ধীজি আদালতের সামনে রেখেছিলেন তার জন্য এ বিচারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটিশের গুণমুগ্ধ এবং বিশ্বস্ত সমর্থক থেকে কী করে ব্রিটিশ শাসনের আপসবিরোধী সমালোচকে রূপান্তরিত হয়েছেন তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ সিদ্ধান্তে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি যে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে অনেক বেশি দুর্বল করে তুলেছে। নিরস্ত্র ভারতের আজ কোনো শক্তি নেই যে সে কোনো আক্রমণের প্রতিরোধ করে।...সে এত দরিদ্র যে দুর্ভিক্ষের পথ বন্ধ করে এমন তার সাধ্য নেই। শহরের বাসিন্দারা প্রায় জানেই না অনাহারের কবলে পড়ে দেশের মানুষ ধীরে ধীরে কিভাবে জীবনহীন হয়ে পড়েছে। তাদের প্রায় কোনো ধারণাই নেই যে যে-দুর্ভাগা স্বাচ্ছন্দ্যের তারা অধিকারী তা অর্জিত হয় বিদেশী শোষকের দালালি ক'রে, আর সে মুনাফা ও দালালি আসে দেশের মানুষকে নিংড়ে নিয়ে। ব্রিটিশ ভারতের আইনানুমোদিত সরকারের ওপর যে জনসাধারণকে শোষণ করার দায়িত্বই অর্পিত সে ধারণাও তাদের প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামে গ্রামে খোলা চোখের দৃষ্টির সামনে নরকঙ্কালের সাক্ষ্য যে সত্যকে উদঘাটিত করে কোনো যুক্তি, সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কোনো চাতুরিই সে সত্যকে ঢাকা দিতে পারে না।...আমি মনে করি যে সচেতন বা অচেতনভাবেই হোক্ শোষকদের সুবিধার জন্য শাসনের ক্ষেত্রে আইনকে এইভাবে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করানো হচ্ছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা, যে-সব ইংরেজ এবং তাঁদের ভারতীয় সহযোগীরা এ দেশ শাসন করেন তাঁদের এ বোধ নেই যে আমার বর্ণিত অপরাধের দায়িত্ব তাঁদেরই। আমি ভালোভাবেই জানি, অনেক ইংরেজ এবং ভারতীয় রাজকর্মচারী মনে করেন যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, এবং তাঁদের পরিচালনায় মন্থর অথচ সুনিশ্চিত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে এ দেশ। তাঁদের কোনো ধারণা নেই একদিকে সূক্ষ্ম অথচ নিদারুণ সন্ত্রাস ব্যবস্থা চালু করে এবং অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে বলপ্রয়োগ করে, আর অন্য দিকে প্রতিশোধ নেবার বা আত্মরক্ষার সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এ দেশের লোককে কিভাবে হীনবীর্য করে তোলা হচ্ছে, কি ভাবে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে অনুকরণ-প্রবৃত্তির দাস হতে।

তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের উপসংহারে গান্ধীজি বলেন যে তিনি যা শুভ তার সঙ্গে সহযোগিতায় যেমন বিশ্বাস করেন তেমনই বিশ্বাস করেন অশুভের সঙ্গে অসহযোগিতায়। 'আইনের কাছে যা সজ্ঞান অপরাধ, আমার কাছে তা নাগরিকের পবিত্রতম কর্তব্য। তার জন্য যত গুরুদণ্ড দেওয়া যায় তা আমায় দেওয়া হোক'—আদালতের কাছে গান্ধীজি ব্যক্ত করলেন এই অভিপ্রায়।

এ বিচারের বিচারক ছিলেন ব্রমফিল্ড। গান্ধীজির মহত্ত্ব স্বীকার করে তিনি বললেন, 'আপনার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর কাছে আপনি মহান দেশপ্রেমিক এবং মহান

নেতা। তবু আপনিও আইনের অধীন, আর আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে আপনি আইন ভেঙেছেন।' এই অপরাধে গান্ধীজিকে দেওয়া হল ছ বছরের কারাদণ্ড—যে দণ্ড ১৯০৮ সালে দেওয়া হয়েছিল লোকমান্য তিলককে।

নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই জেলে থাকার ফলে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য শুরু হবার আগেই প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শেষ হল। এর অব্যবহিত পরেই খিলাফৎ আন্দোলন হারাল তার পূর্বতন গুরুত্ব। তুরস্কে ইতিমধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা; ১৯২২-এর নভেম্বরে সুলতানের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। খলিফার পদ তুলে দিয়ে কামাল পাশা তুরস্কের আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলন এবং গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা সে আন্দোলনকে যেভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন—তাকে দুভাবে দেখা যেতে পারে। কিছু লোকের ধারণায় খিলাফৎ আন্দোলন ছিল ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে যুক্ত করা একই সঙ্গে অদুরদর্শিতা এবং পশ্চাদ্‌মুখিতার পরিচায়ক—এর ফলে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও, রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল ধর্মকে, আর তা করেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি। আবার অনেকেরই ধারণা, খিলাফৎ আন্দোলনের রূপ ধরে এক সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল জাতীয় নেতৃত্বের কাছে—মুসলমান সমাজের সমস্যাও যে তাঁদের সমানভাবে স্পর্শ করে এ কথা প্রতিপন্ন করার সুযোগ। এ সুযোগের সদ্‌ব্যবহার না করা অন্যায় হ'ত; কংগ্রেস নেতারা তাই সুযোগটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি।

পিছনের দিকে ফিরে তাকালে এ কথা আজ বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শহরাঞ্চলের মুসলমানেরা জাতীয় আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা, যে আগ্রহী মনোভাব দেখা গিয়েছিল তার পিছনেও এ আন্দোলনের অবদান অনেকখানি। তা ছাড়া কোনো জাতীয় আন্দোলন যদি সমাজের কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সমর্থনের নীতি অবলম্বন করে তা হলে তার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জাতীয় আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্যকে যদি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে একটি সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার রূপ দেওয়া যেত, যদি তাকে দেশের অখণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের কামনায় উদ্‌বোধিত করা হত, তা হলে নিশ্চ দোষের কিছু থাকত না। কিন্তু দেশের মধ্যে যে দমননীতি এবং তুরস্কে যে ঘটনার পরম্পরা শুরু হল তাতে এ আন্দোলনের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তুরস্কে যখন ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল, জাতীয় নেতৃত্ব তখন তাকে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দেশের মধ্যে আন্দোলনের লক্ষ্যগুলি অচরিতার্থই রয়ে গেল।

প্রথম অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল এমন কথা মনে করাও ভুল হবে। অর্থনৈতিক সমস্যার স্বরূপ এবং সে সমস্যার উৎস অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সচেতন হতে জনসাধারণকে সহায়তা করেছিল এ আন্দোলন, অমার্জিত গ্রামবাসীকেও শিখিয়েছিল যে স্বরাজই তার দুরবস্থার প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায়। জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে মুক্তির এক নতুন আস্বাদ পেয়েছিল তারা। ব্রিটিশ রাজ সম্পর্কে ভয় কেটে গিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ, পুরুষ, মহিলা, ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যেই সরকারী কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে দুঃখকষ্ট বা শাস্তি মেনে নেবার আগ্রহ এবং ক্ষমতা দেখা গিয়েছিল। অস্পৃশ্যতা, পানাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনে খাদির উপর যে জোর দেওয়া হয় তার মধ্যেও পল্লী অঞ্চলের চাহিদার একটি বাস্তব বিশ্লেষণের প্রয়াসই রূপ পায়।

বৈদেশিক শাসকশ্রেণী এবং তাঁদের সরকারকে প্রকাশ্যভাবে অমান্য করার এই যে সংগঠিত প্রয়াস এর থেকে জন্ম নিল এক নতুন আত্মবিশ্বাস, নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারার এক নতুন অনুভব। পিছু হঠতে বাধ্য হওয়ার যত গ্লানি সব মুছে গেল এই আত্মবিশ্বাস, এই নতুন অনুভবের ঔজ্জ্বল্যে। সত্যাগ্রহের শক্তি যে এইখানেই, গান্ধীজি তা জানতেন। ব্যর্থতা যা তা সাময়িক, হতোদ্যম হবার মতো কিছু নয়; গান্ধীজি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, '১৯২০-তে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চলবে। তার শেষ এক মাসে হতে পারে, এক বছরে হতে পারে, আবার বহু মাস বহু বছর ধরেও চলতে পারে সে সংগ্রাম।'

স্বরাজবাদীদের যুগ

ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যাবার ফলে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ক্ষেত্রে অকস্মাৎ ভাটা দেখা দিল। কিছুটা মোহভঙ্গজনিত মনোভাবের ফলে অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আদৌ কার্যকরী হতে পারে কিনা। অহিংসার মন্ত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দীক্ষিত করে তোলা কি আদৌ সম্ভব? আর তা যদি সম্ভবও হয়, কত সময় লাগবে এ কাজকে সুসম্পন্ন করতে? অনেক নেতা তখন কারারুদ্ধ। তাঁদের অনুপস্থিতিতে এবং বিবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হবার ফলে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করতে শুরু করলেন। এই সংকটের মুহূর্তে নতুন নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে দেশ তখনো ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়; অন্য দিকে গঠনমূলক কর্মসূচী সম্পর্কেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু নিয়ে এলেন এক নতুন প্রস্তাব। তাঁরা বললেন আইনসভাগুলিকে বয়কট করার বদলে কাউন্সিলগুলির মধ্যেই অসহযোগের নীতিকে

প্রয়োগ করা হোক, কারণ কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে তবে তার ভেতর থেকে সংস্কারের দাবিকে কার্যকারী করে তোলা সম্ভব। বেশ-কিছু কংগ্রেস কর্মী ও প্রস্তাবে সায় দিলেন, কিন্তু রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ রক্ষণশীল গান্ধীবাদীদের মত ছিল 'বয়কট' আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। এই দুই দল যথাক্রমে 'পরিবর্তন সমর্থক' এবং 'পরিবর্তন বিরোধী' নামে অভিহিত হন। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার সপক্ষে বলিষ্ঠ আবেদন রাখলেন। কিন্তু জয় হল রাজাগোপালাচারীর দলেরই। চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করে মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, মালব্য এবং জয়াকার-এর সহযোগিতায় কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করলেন। তার নাম হল কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টি। চিত্তরঞ্জন হলেন তার সভাপতি আর মতিলাল নেহরু অন্যতম সম্পাদক।

এই নতুন পার্টিও অহিংসা ও অসহযোগের মৌলিক ও প্রাথমিক নীতিকে আশ্রয় করে সংগঠিত হল। এঁরা চাইলেন সংবিধান রচনার অধিকার। স্থির করলেন সে অধিকার যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তা হলে 'সুসংবদ্ধভাবে অবিচলও অব্যাহত প্রতিরোধের সৃষ্টি করে অ্যাসেম্বলি ও কাউন্সিলগুলিতে সরকারের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব করে তুলবেন।' চিত্তরঞ্জনের কল্পনা ও আবেগের সঙ্গে মতিলালের নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তার ঘটেছিল আদর্শ সমন্বয়। সামান্য প্রস্তুতি নিয়েই তাঁরা ১৯২৩-এর নভেম্বরের নির্বাচনে নামলেন এবং বিপুলভাবে জয়ী হলেন লিবারাল বা উদারপন্থী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে (Central Province) তাঁরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন, বাংলাদেশের কাউন্সিলেও পার্টি হিসেবে তাঁরা লাভ করলেন সবচেয়ে বেশি আসন। উত্তরপ্রদেশ এবং আসামে তাঁদের স্থান হল দ্বিতীয়। অন্যান্য প্রদেশে অবশ্য তাঁদের সাফল্য এতটা লক্ষণীয় হল না। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০১টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেলেন ৪২টি আসন।

এ-সব সত্ত্বেও স্বরাজবাদীদের পথ সম্পর্কে 'পরিবর্তন বিরোধীরা' মত পালটালেন না। তাই দু দলের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেধে উঠল। উভয় দলের মধ্যেই গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল অটুট। তা ছাড়া তাঁদের চিন্তায় ও বিশ্বাসে উভয় দলই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত বিরোধী। তাই কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দিলেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার সম্পর্ক তাঁরা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, কংগ্রেস পার্টির ঐক্যও তাই অবিচল ছিল।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ত্রিশ জন মধ্যপন্থী ও মুসলমান সদস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বরাজবাদীরা গঠন করলেন ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী পার্টি। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও তাঁরা একই নীতি গ্রহণ করলেন। সরকারের কাছে তাঁরা নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করলেন : সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, দমনমূলক

আইনগুলি প্রত্যাহার করে নিতে হবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং অবিলম্বে একটি রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স আহ্বান করে এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যাতে সরকারী ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কাউন্সিলগুলির নিয়ন্ত্রণে আসে। তাঁরা স্থির করলেন সরকার যদি দাবিগুলি মেনে নিতে অস্বীকৃত হন তা হলে ভোট দানে বিরত থেকে সরবরাহ ব্যবস্থা পঙ্গু করে তুলবেন এবং এইভাবে শাসনকার্য অচল করে দেবেন।

প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজবাদীরা মধ্যপন্থী এবং হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন; রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তি এবং দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার দাবি করে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রস্তাব পেশ করলেন। ১৯২৫-এর মার্চে গুজরাটের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা বিঠলভাই প্যাটেলকে তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করতেও সফল হলেন।

কিন্তু বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া স্বরাজবাদীদের পক্ষে সম্ভব হল না। ১৯২৫-এর মার্চে তাঁরা স্থির করেন কেন্দ্রীয় আইনসভা বর্জন করবেন। মতিলাল স্বীকার করেন, 'সহযোগিতার যে হাত আমরা প্রসারিত করেছিলাম তাকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; এখন লক্ষ্য সাধনের নতুন পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

ব্রিটেনের রাজনৈতিক আবহাওয়াও এ সময় ভারতের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। ১৯২৩-এ খুব স্বল্প সময়ের জন্য লেবার পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। এরপর বল্‌ডুইনের নেতৃত্বে 'রক্ষণশীল' দল আবার সরকার গঠন করেন। লর্ড বার্কেনহেড-এর উপর পড়ল ইণ্ডিয়া অফিসের দায়িত্ব। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের মতো তাঁরও ধারণা হল যে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কারে ভারতবাসীদের বড়ো বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে; আর কিছুদিন কোনো সংস্কার প্রবর্তন না করাই শ্রেয়। ভারতবর্ষ যে আদৌ কোনোদিন ডোমিনিয়ন মর্যাদার উপযুক্ত হয়ে উঠবে এমন ধারণা তাঁর ছিল না; ১৯১৯-এর আইনে সমস্ত পরিস্থিতির পুনর্বিশ্লেষণের জন্য যে দশ বছর সময় ধার্য হয়েছিল, তিনি স্থির করলেন তার থেকে এক তিল নড়বেন না।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা এবং নৈরাশ্যকে আশ্রয় করে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রবেশ করল স্বরাজবাদীদের মধ্যেও। মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, এন. সি. কেলকার প্রমুখ নেতা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে 'প্রতিবেদনশীল দল' বলে একটি দল গঠন করলেন এবং দাবি করতে লাগলেন যে এইভাবে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছেন। মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ হল যে তাঁরা মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে

এক বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটল—১৯২৫-এর জুন মাসে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল চিত্তরঞ্জনকে।

এই সময় মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা (১৯১৭-তে প্রতিষ্ঠিত) আবার তৎপর হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে উঠল দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং নাগপুরে। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ইতিমধ্যে ১৯২৪-এর ৬ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি ছাড়া পেয়েছিলেন; সাম্প্রদায়িক দীক্ষায় যে চরম অমানবিকতা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প করে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একুশ দিনের উপবাস ব্রত গ্রহণ করলেন; কিন্তু এর ফল হল সামান্যই; সাম্প্রদায়িকতার বীজ বিনষ্ট হল না। তাঁর উপবাসকে উপলক্ষ করে অনেকগুলি ঐক্য-সম্মেলন আহূত হ'ল, কিন্তু ঐক্যবোধকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। পরবর্তী দু বছর সাম্প্রদায়িকতা আরো উগ্ররূপ ধারণ করল। ১৯২৫-এ অন্তত ষোলবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল, আর তার জঘন্যতম রূপ দেখা গেল কলিকাতায়, ১৯২৬ সালে। ক্রমে বড়ো বড়ো শহর ছাড়াও ছোটো শহরগুলিতেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। সাইমন কমিশনের তালিকা অনুযায়ী ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে ১১২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। প্রাণহানি ঘটেছিল প্রায় ৪৫০ জনের, আর আহত হয়েছিল অন্তত ৫,০০০ জন।

১৯১৭ সালে দেখা গেল হতাশার চরম রূপ। সব পার্টিগুলি যাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতি নেন, মতিলাল ও আজাদ তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু তাঁদের উদ্যোগ ব্যর্থ হ'ল। এই ক্রমবর্ধমান হিংস্রতার মধ্যে পড়ে গান্ধীজিও অসহায় বোধ করতে লাগলেন; তাঁর বেদনা প্রকাশ পেল তাঁর লেখায় : 'আমার আশা জেগে আছে একমাত্র প্রার্থনা এবং প্রার্থিত উত্তরের মধ্যে।'

নতুন পর্বের সূচনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নতুন পর্বের সূচনা হ'ল ১৯২৮-এর মধ্যে। এর আগে পাঁচ বছর ধরে সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনের মোকাবিলা করেছিলেন চরম দমননীতি অবলম্বন করে। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কংগ্রেসের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল—একদিকে ছিলেন স্বরাজ পার্টি, আর একদিকে 'গঠনমূলক কর্মীরা', যাঁরা কাউন্সিল বয়কটের মূল সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মীয় গোঁড়ামি চরম রূপ নেওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বদলে দেখা দিচ্ছিল অবিশ্বাস আর সন্দেহ। হিন্দুদের মধ্যে শুরু হ'ল সংগঠন, শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলন; মুসলমানদের মধ্যেও তনাজিম, তবলিম প্রভৃতি আন্দোলনের সূচনা হ'ল। দু পক্ষের ধর্মান্ধদের মধ্যেই ধর্মান্তরীকরণ, পুনঃধর্মান্তরীকরণের অপপ্রয়াস নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত তো হ'লই না, বরং অবিশ্বাস আর সন্দেহ বেড়েই চলল।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক-শ্রেণীও ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই দলে : তাদের একদল উন্নত, অন্য দল অনগ্রসর। অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি দল এই সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমাজবাদী আদর্শের প্রতি। ১৯২৭-এ সোভিয়েট রাশিয়ার দশম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হয়। সেখান থেকে সমাজবাদী ভাবধারা এসে পৌঁছচ্ছিল দেশের তরুণ সমাজের কাছে। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই-সব রাজনৈতিক কর্মীরা ছোটো ছোটো দল গঠন করে কম্যুনিজ্‌ম সম্পর্কে নিজেদের ব্যাখ্যা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল প্রধানত মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ছোটো ছোটো শহরগুলির কল-কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে আর গ্রামাঞ্চলের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের, কৃষক-শ্রেণীর মধ্যে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসকেই তাঁরা সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে মনে করতেন। কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত-ঘেঁষা রাজনীতিতে আইনসংক্রান্ত সংস্কারের দাবিই মুখ্য হয়ে উঠেছিল; তাঁরা চাইলেন কংগ্রেস তাঁদের নিজেদের দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যাও যুক্ত করুন : কলকারখানায় কাজের শর্ত, ভূমিবণ্টন প্রভৃতি যে-সব বিষয় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত সেগুলিও তুলে ধরুন নিজেদের দাবির মধ্যে। রাজনৈতিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও সমাজবাদীরা কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি চরমপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

শ্রমিক-শ্রেণী এবং দরিদ্র কৃষিজীবী-শ্রেণীর সঙ্গে একই সময়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করেন গোষ্ঠীভিত্তিক অনেক রাজনৈতিক দল। এঁদের প্রধান কাজ ছিল, দরিদ্র মুসলমান কৃষিজীবী, শহরাঞ্চলের শ্রমিক, এবং নিচু জাতের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বড়ো করে তোলা। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলিতে প্রতিনিধিত্বলাভের অধিকার, শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সুযোগ ইত্যাদি দাবি ক'রে গণতান্ত্রিক সমাজে সমান মর্যাদা লাভের জন্য তাঁরা সচেষ্ট হলেন। এই প্রবণতা বিশেষ করে দেখা দিল সমাজের তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র প্রভৃতি কিছু কিছু কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ধরনের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, আর 'বিভাজন ও শাসনে'র নীতিতে বিশ্বাসী সরকারও এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। মাদ্রাজে জাসটিস্ পার্টি (Justice Party) কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করলেন। ব্রাহ্মণ-কবলিত কংগ্রেসের হাত থেকে অব্রাহ্মণদের স্বার্থরক্ষা করছেন, এই হ'ল তাঁদের দাবি।

অথচ অস্পৃশ্যতাপ্রথা নির্মূল করে সাম্প্রদায়িক প্রবণতার অভিশাপ থেকে হিন্দুধর্মকে বাঁচানোর চেষ্টায় গান্ধীজি ও তাঁর সহকর্মীরা কম উদ্যোগী ছিলেন না। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ও লক্ষ্য ছিল প্রধানত বোম্বাই অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে সাম্প্রদায়িক

ও স্বতন্ত্রবোধ নির্মূল করে তাদের একটি শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করে তোলা।

তবু এ-কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে ১৯২০-র দশকে জাতীয় আন্দোলনের গতিধারায় ভাটার লক্ষণ স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের নিজেদের মধ্যেই দেখা দিল রাজনৈতিক মতভেদ, দেশের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধের ঘটল ব্যাপক প্রসার। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করার যে খেলা সরকার শুরু করলেন, তাতে মনে হতে লাগল ভারতীয় সমাজ অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক সম্প্রদায়, আরো অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

সৌভাগ্যক্রমে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক নতুন সম্ভাবনার উদয় হ'ল ১৯২৭-এর নভেম্বরে। লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন নির্ধারিত সময়ের দুবছর আগেই তাঁরা একটি রয়্যাল কমিশন নিয়োগ করবেন এবং কমিশন বিচার করে দেখবেন আরো কিছু সংস্কার প্রবর্তন বা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের প্রসারের পক্ষে ভারতবাসীরা কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার জন সাইমন প্রস্তাবিত রয়্যাল কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন; তাঁর নামানুসারে সাধারণ লোকের কাছে এ কমিশন পরিচিত হ'ল সাইমন কমিশন বলে। কমিশনে মোট সাতজন সদস্য নিযুক্ত হলেন; তাঁদের একজনও ভারতীয় নন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন, সংস্কার প্রবর্তনের সীমিত আশ্বাস দিয়ে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে পারবেন। তাঁদের সে আশা ব্যর্থ হ'ল। রয়্যাল কমিশন নিয়োগের পরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ উত্তেজনার তরঙ্গ। ১৯২৭-এ মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে এম. এ. আনসারি ঘোষণা করলেন, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমিশনের 'অনুসন্ধানের' কাজ সম্পূর্ণরূপে বয়কট করা হবে। বলা হল : 'সংশ্লিষ্ট সকল দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের মাধ্যমে অথবা সংবিধানসভা আহ্বান করে নিজেদের সংবধিান রচনা করার অধিকার ভারতবাসীর প্রাপ্য। কমিশন নিয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।...যে 'অনুসন্ধানে'র মধ্য দিয়ে স্থির করা হবে আমরা স্বরাজের উপযুক্ত কিনা কিংবা দায়িত্বশীল সরকার গঠনের কতটা যোগ্যতা আমাদের আছে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আমাদের থাকতে পারে না। আর এই কমিশন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয়দের বাদ দিয়ে ভারতবাসীর আত্মসম্মানের প্রতি যে অবমাননা দেখানো হয়েছে, বয়কটের সিদ্ধান্তের তা তৃতীয় কারণ।'

এই তিনটি কারণের মধ্যে কংগ্রেস জোর দিলেন প্রথম ও দ্বিতীয়টির ওপর। আর ভারতীয়দের আত্মসম্মানে আঘাত করা হয়েছে এই বোধটি সাড়া জাগাল তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ উদারপন্থীদের মনে, কারণ সরকারের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগিতার মাধ্যমে পার্লামেণ্টারি সংগঠন ও কৌশলের সমস্ত-কিছু তাঁরা সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন।

কংগ্রেস, লিব্যারাল ফেডারেশন, এমন-কি, গোড়ার দিকে মুসলিম লীগও সম্মিলিত হলেন সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্তে। কংগ্রেস সর্বত্র কমিশনের মুখোমুখি হলেন 'ফিরে যাও, সাইমন' : জাতীয় সংগ্রামে এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে আবার এক নতুন ঐক্যসূত্র স্থাপিত হ'ল। সে ঐক্যের মধ্যে সামাজিক মিলনের ইঙ্গিত ছিল না, রাজনৈতিক কর্মসূচীর অভিন্নতারও নয়, তবু অন্তত সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের এক আগ্রহ এতে রূপ পেল। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি কমিশন বোম্বাই-এ এসে পৌঁছলেন; 'সাইমন ফিরে যাও' লেখা নিশান ও কালো পতাকা নিয়ে বিরাট বিরাট মিছিল তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। সন্ধ্যায় চৌপটি বেলাভূমিতে পঞ্চাশ হাজার লোকের এক বিরাট জনসভায় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানালেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কমিশন সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন শুধু নয়া দিল্লিতে, তাও কাউন্সিল অফ স্টেটের প্রধানত ব্রিটিশ মনোনীত সদস্যদের কাছ থেকে।

জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণে ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তবে তাঁরা প্রধানত গুরুত্ব দেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলার ব্যাপারে এবং শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতিসাধনে। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সময়ে বোম্বাইয়ে মিনিমাম ল্যাণ্ড হোল্ডিংস অ্যাক্ট (Minimum Land Holdings Act) নামে ভূমি-সংক্রান্ত একটি আইন চালু করার উদ্যোগী হন; আইনটির একটি খসড়াও রচিত হয়। আইনটি প্রবর্তিত হলে এই অঞ্চলের গরিব কৃষকদের অবস্থা আরো খারাপ হত, আর অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতে চলে যেত আরো অনেক জমি। বোম্বাইয়ে শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রস্তাবিত আইনটির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেন। ফলে ১৯২৭-এ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন আইনের খসড়াটি প্রত্যাহার করে নিতে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির ইঞ্জিন মেরামত ইত্যাদির জন্য খড়গপুরে যে কারখানাটি ছিল সেখানেও ধর্মঘটের সূত্রপাত হল। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির পুরো মালিকানা ছিল একটি বেসরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের হাতে; এর প্রধান কার্যালয়ও ছিল লণ্ডনে। কোম্পানির খড়গপুর কারখানায় যে-সব শ্রমিক কাজ করতেন তাঁরা এসেছিলেন অনেক সম্প্রদায়, অনেক জাতি থেকে; তাঁরা সম্মিলিত হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন স্বল্প মজুরি আর কোম্পানি কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। ক্রমে সে আন্দোলন সাধারণ ধর্মঘটের রূপ ধারণ করল। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ অনেক জাতীয় নেতা এবং উদীয়মান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও শ্রমিক নেতা ভি. ভি. গিরি এই ধর্মঘটের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানালেন। জওহরলাল তখন দেশের বামপন্থী তরুণ সমাজের নেতা। ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটি লীগ গঠিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া মস্কোতে যে থার্ড ইন্টারন্যাশনাল অফ দি ওয়ার্কার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড স্থাপন করেন, তার প্রতি এ লীগের ছিল পূর্ণ সহানুভূতি। জওহরলাল এই লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করলেন।

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় আকৃষ্ট বামপন্থী শ্রমিক ও শ্রমিকনেতারাও সাইমন কমিশন বয়কটের ব্যাপারে তাঁদের সমর্থন জানালেন। শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের ফলে ১৯২৮ ও ১৯২৯-এর গণ-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠল। 'ফিরে যাও, সাইমন'— এই আন্দোলন থেকে জন্ম নিল স্টুডেন্টস ফেডারেশন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী চেতনা বিস্তারের দায়িত্ব নিল এই ফেডারেশন।

'বয়কট'কে উপলক্ষ করে জাতীয় নেতৃত্ব উদ্যোগী হয়ে উঠল ভারতীয় সংবিধান রচনার পরিকল্পনায়। ১৯২৭-এর মাদ্রাজ কংগ্রেসেই জওহরলাল নেহরু প্রস্তাব এনেছিলেন যে কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা। এ প্রস্তাবে সমর্থন ছিল সুভাষচন্দ্রের দলের। এ ছাড়া এ সময়ে আর-একটি কর্মসূচী গৃহীত হয় তা সেক্রেটারি অফ স্টেট লর্ড বার্কেনহেডের একটি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বরাজ পার্টিকে লক্ষ্য করে লর্ড বার্কেনহেড আহ্বান জানাল 'এমন একটি সংবিধান রচনা করার জন্য যা অন্তত বহুলাংশে ভারতের মহান জনগণের সাধারণ সম্মতি অর্জন করতে সমর্থ হবে।' কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করার ফলে এমন একটি নতুন শাসনব্যবস্থার পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হ'ল যা ব্রিটিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যেই কার্যকর হতে পারবে। ১৯২৮-এর অগাস্টে লক্ষ্ণৌয়ে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল; তাতে যোগ দিলেন কংগ্রেস, নিখিল ভারত লিব্যারাল ফেডারেশন, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। অভিজ্ঞ স্বরাজবাদী নেতা মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি সংবিধানের এক খসড়া প্রস্তুত করেন। সর্বদলীয় সম্মেলনে সেই খসড়াটি গৃহীত হয়।

ব্রিটিশ-ভারতে এতদিন ধরে শাসনবিভাগের আধিপত্যই ছিল অপ্রতিহত; মতিলাল নেহরু যে রিপোর্ট রচনা করেন তাতে গুরুত্ব দেওয়া হ'ল দায়িত্বশীল সরকারের ওপর, অর্থাৎ শাসন বিভাগের চেয়ে জনগণের নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হ'ল। রিপোর্টে বলা হ'ল যে দুই কক্ষযুক্ত এই সার্বভৌম পার্লামেন্টের ক্ষমতা হবে কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের সমান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েও এই পার্লামেন্টের মতোই ভারতীয় পার্লামেন্টের থাকবে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা। পার্লামেন্টের রাজ্যসভায় সদস্য থাকবেন ২০০ জন, তাঁরা নির্বাচিত হবেন প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। আর লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০০; তাঁরা নির্বাচিত হবেন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে। বাংলাদেশের মুসলমান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অমুসলমান ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায় পার্লামেন্টে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের কোনো সুবিধা পাবেন না। তবে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশকে অবশ্য এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বলে ধরা হবে, কারণ এই দুটি প্রদেশেই মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুটি অঞ্চলের কোনোটিতেই সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে না,

নির্বাচন হবে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।

১৯২৮ সালে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বয়সে যাঁরা প্রবীণ, তাঁদেরই রক্ষণশীল মতাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় মতিলাল নেহরুর রির্পোটে। তরুণ সম্প্রদায় 'পূর্ণ স্বরাজে'র যে দাবি তোলেন প্রবীণরা যে তাকে অস্বীকার করলেন তা নয়, তবে ব্যাখ্যা করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion status) হিসেবে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারেও তাঁদের খুব আগ্রহী দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিরও আপসহীন অকপট সমাধানের চেষ্টা তাঁরা করেন নি। বরং সকল নাগরিককে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সমানভাবে দেওয়ার যে নীতি তার ব্যতিক্রম করা হ'ল কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল দু ক্ষেত্রেই। অবশ্য এই বিশেষ সুযোগ না দিলে কংগ্রেসে যোগ দেন নি এমন জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের হয়তো সন্তুষ্ট করা যেত না। বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিশ্বাস করার মূল্যস্বরূপ এবং সংখ্যালঘু স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে এ দাবি হয়তো অনিবার্য ছিল।

তবে মুসলিম লীগের নীতি আরো চরম; তাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হ'ল ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সর্বদলীয় কনভেনশনও মিলিত হলেন নেহরু রিপোর্টটি অনুমোদন করার জন্য। এ কনভেনশনে মহম্মদ আলি জিন্না দাবি তুললেন যে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এবং পাঞ্জাব ও বাংলার প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। জিন্না ১৯২১ সাল পর্যন্ত ছিলেন কংগ্রেস নেতা, তারপর তাঁর রূপান্তর ঘটে বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে। তিনি এখন চেষ্টা করতে লাগলেন পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের জন্য যাতে এই দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ সুযোগবঞ্চিত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের আইনঘটিত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে। রাজানুগত মুসলমান রাজনীতিবিদরা জিন্নার পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। আগা খান, স্যার মুহম্মদ শফী প্রমুখ যাঁরা নব্যশিক্ষিত পেশাদার শ্রেণী বা ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাঁরাও একই শ্রেণীভুক্ত হিন্দুদের হাত থেকে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করে নেবার আগ্রহে জিন্নাকে সমর্থন জানাতে শুরু করলেন। গণতান্ত্রিক নীতিতে তাঁদের মতো অনীহা অবশ্য সকলের ছিল না—কংগ্রেসের ডা: আনসারি, উত্তর প্রদেশের ভূস্বামী মহারাজ মাহমুদাবাদ, বিহারের বিচারপতি স্যার আলি ইমাম প্রমুখ অনেক মুসলমান রাজনীতিবিদই গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন এ সময়।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাঁরাও উগ্রমূর্তি ধারণ করেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিখেরাও দাবি করতে লাগলেন যে ভাষা ও ধর্মের দিক দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে পাঞ্জাবে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সুবিধা তাঁদের প্রাপ্য।

সর্বদলীয় কনভেনশনে অবশ্য জিন্না ও তাঁর দলের দাবি অগ্রাহ্য হ'ল। জিন্না এবং সাম্প্রদায়িক শিখেদের প্রতিনিধি কনভেনশন বর্জন করে বেরিয়ে এলেন। নেহরু রিপোর্ট 'জনসাধারণের অনুমোদন বহুলাংশে অর্জন করতে সমর্থন হবে' বলে যে দাবি করা যাবে মনে হয়েছিল, এর ফলে সে দাবির ভিত্তি ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে গেল।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-কেন্দ্রিক চিন্তার বিরুদ্ধে সমালোচনা শক্তিশালী হয়ে উঠল। এ সমালোচনার উদ্‌গাতা কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বামপন্থী তরুণদের প্রতিনিধি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের যে প্রস্তাব নেওয়া হয়, সে প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে এঁরা এবার কংগ্রেসকে চালিত করতে লাগলেন। কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু; তাঁর রিপোর্টের সমর্থনে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল একটি ধারা : 'কংগ্রেসের নাম নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যদি প্রচারকার্য চালানো হয়, এ প্রস্তাব কোনোভাবেই তার অন্তরায় সৃষ্টি করবে না।' কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে বলা হল যে ১৯২৯ সাল শেষ হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকার যদি নেহরু রিপোর্ট মেনে না নেন, তা হলে লাহোরে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে নতুন করে ডাক দেওয়া হবে আইন অমান্য আন্দোলনের।

এইভাবে আপসের মধ্যে দিয়ে বিরোধের সমাধান করে দলীয় ঐক্য বজায় রাখা হ'ল। এর প্রধান কৃতিত্ব গান্ধীজির। আমেদাবাদে ছ'বছর অবসর গ্রহণের পর তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করলেন কংগ্রেসের অধিনায়ক রূপে। সমস্ত বিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমর্থক। তাঁর ব্যবস্থাপনায় স্থির হ'ল লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতিত্বের উত্তরাধিকার মতিলাল নেহরুর কাছ থেকে লাভ করবেন তাঁর পুত্র, জওহরলাল।

লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ বা সামগ্রিক, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রতি কংগ্রেস সুনিশ্চিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হ'ল। ডোমিনিয়ন স্টেটাস-এর সীমিত স্বাধীনতার চিন্তায় সন্তুষ্ট থাকা আর কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না; 'দীর্ঘ অপেক্ষার পর তুচ্ছ সংস্কারের' সান্ত্বনা নিয়ে কাল কাটানোর দিনও শেষ হয়ে গেল।

১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছিল, সেই বিরল মুহূর্তে ইরাবতী নদীতীরে দাঁড়িয়ে অগণিত জনতার সামনে জওহরলাল ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন, 'আর যদি ব্রিটিশ শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে চলা হয় তা হলে মানুষ ও ঈশ্বরের কাছে আমাদের অপরাধী হতে হবে।'

চারিদিকে তখন নতুন আশা, নতুন উত্তেজনা; বাতাসে সঞ্চারিত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের সংকল্প।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তির পূর্বাভাস

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই দশকের শুরু; এর শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা—ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে লিপ্ত করার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করেন। কিন্তু এই দশ বছরে জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করার আগে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত সেটি হল এই যে দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে যে ধরনের বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের পুনর্জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তৃতীয় দশকের প্রথম কয়েকটি বছরেও তার ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনও আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং দেশের রাজনৈতিক চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৩০-এর দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে এ-সবেরই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

শুধু ১৯২৮ সালেই দেশে অন্তত ২০৩টি ধর্মঘট হয়; ৫০৫,০০০ জন কর্মী এই-সব ধর্মঘটে যোগ দেয়। বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে বস্ত্রশিল্প-কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী 'গির্নি কামগর' সংগঠনের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। 'সাউথ ইণ্ডিয়ন রেলওয়ে' এবং 'ম্যাড্রাস অ্যাণ্ড সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে'র কর্মীরাও বিপ্লবী কর্মপন্থার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। দেশের বিভিন্ন শহরে কীর্তি, মজদুর, কিষাণ, স্পার্ক এবং ক্রান্তি নামে অনেকগুলি কম্যুনিস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন যুব-সংগঠনের জন্মও এই সময়েই; নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-সব ছাত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত স্বরাজবাদীদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সংগঠনগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে সমাজবাদী সংগ্রামের জন্য বামপন্থী সংগঠনগুলি তখন সুশৃঙ্খলভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। শহরাঞ্চলের শ্রমিক-শ্রেণীকে নিয়ে এমন কোনো শ্রমিকদল এই সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে পারে নি যাদের সমাজবাদী আদর্শে, উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য আন্দোলনে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীর যোগাযোগ স্থাপনেও এই সংগঠনগুলি উদ্যোগী হয় নি।

কলিকাতায় যখন কংগ্রেস অধিবেশন এবং সর্ব-দলীয় 'কন্‌ভেন্‌শন' অনুষ্ঠিত

হচ্ছিল, সেই সময়ে সাম্যবাদীরা বিভিন্ন (প্রাদেশিক) 'ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি'গুলির একটি সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সভায় যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলি হ'ল : সর্বহারাদের শ্রেণী-সংগ্রামের আয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা, জমিদারি অধিকারের বিলোপ (আদর্শগতভাবে, বিনা ক্ষতিপূরণে), কর্মীদের দৈনিক কাজের বরাদ্দ সময় হ্রাস ও তার সঙ্গে সর্বনিম্ন বেতনের হার নির্ধারণ, এবং সংবাদপত্রের, বক্তৃতার ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি। ১৯২৮ সালে ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার যে নীতি কংগ্রেস নিয়েছিলেন, এই সম্মেলনে সে নীতিরও সমালোচনা করা হয়।

এই সময়ে বৃটিশ শাসকবর্গের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে, 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলিই সর্বাধিক সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই 'হুইট্‌লি কমিশন' নামে আর-একটি রাজকীয় 'কমিশন'কে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি বিধান এবং শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির অন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তার সুপারিশের জন্যে ভারতবর্ষে পাঠানো হ'ল। যেহেতু শ্রমিক-শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবেই বামপন্থী আন্দোলনের সর্বাধিক গুরুত্ব, সরকারী প্রচেষ্টাও সেই কারণে শ্রমিকদের এই তত্ত্বটি বোঝাতে তৎপর হয়ে উঠল। যে-সব নেতা সাম্যবাদ ও বিপ্লবের ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলেন, তাঁদের চাইতে সরকারই প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক-শ্রেণীর হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু শ্রমিকরা এই প্রচারে ভুললেন না। সংস্কারপন্থী 'হুইট্‌লি কমিশন' যখন ভারতে এসে পৌঁছলেন, তখন অনেকগুলি শ্রমিক সংগঠনই সে কমিশনকে বয়কট করল। তাদের স্মরণে ছিল যে ১৯২৮ সালে সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভায় ট্রেড ডিস্‌পিউট্‌স' বিল এবং 'পাব্লিক সেফ্‌টি অ্যাক্টের' যে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, তা যে শুধুমাত্র তাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না, তাই নয়, উপরন্তু এই দুটি আইনের দ্বারা তাদের কর্মোদ্যোগের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করারও চেষ্টা করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবিত আইনের শর্ত ছিল যে সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ ইচ্ছামতো ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করতে পারবে, এবং প্রশাসনিক বিভাগের মতে কোনো প্রদেশে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে, আইনসভার সম্মতি ছাড়াই আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এই আইনের ফলে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ দেশে বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছে অর্থ বা অন্য প্রকারের সাহায্য প্রার্থনা করার জন্যে যোগাযোগ করাও শক্ত হয়ে উঠত। যাই হোক, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যারা এই আইনগুলি অগ্রাহ্য করেন।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইতে 'গির্নি কামগর' ইউনিয়ন এবং রেলওয়ে শ্রমিকদের যৌথ আহ্বানে একটি সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯২৮ সালের ধর্মঘটগুলিতে যে-সব কর্মী যোগদান করেছিলেন তাঁদের অপসারণ, এবং তাঁদের পরিবর্তে পাঠানো কর্মীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এই ধর্মঘট ডাকা হয়।

ধর্মঘটী কর্মীদের অভিযোগ, শ্রমিক সংহতি বিনষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য ছিল এবং এর ফলেই কারখানাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধেছিল। ক্রমশ এই ধর্মঘট কানপুর এবং কলিকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটের অব্যবহিত পরেই, ১৯২৯-এর ২০ মার্চ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তেত্রিশজন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতাকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, ডাঙ্গে, মিরাজকর এবং পি. সি. যোশী। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট নেতা। আর ছিলেন দুজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট—বেঞ্জামিন ব্র্যাড্‌লি এবং ফিলিপ স্প্র্যাট—বোম্বাইতে কমিউনিস্টদের পরামর্শ এবং সাহায্য দানের জন্য এঁদের পাঠানো হয়। তা ছাড়া বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন অ-কমিউনিস্ট প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিও ছিলেন। আইনসভার খারিজ করা দুটি দমনমূলক আইনও ভাইসরয় লর্ড আরউইন একটি বিশেষ 'অর্ডিনান্সে'র মাধ্যমে চালু করেন। 'ষড়যন্ত্রকারী'দের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল, তথা শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলি থেকে বহুদূরে অবস্থিত মীরাট শহরে চালান করা হয়। এইখানে বহুদিন ধরে, প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৩ সাল অবধি 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার' বিচার চলে। শেষ অবধি অধিকাংশ বন্দীদেরই দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বন্দীদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁরা নিজেদের মতবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী মনোভাবের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে একটি দীর্ঘ বয়ান পেশ করেন, কিন্তু সেটিকে চেপে দেওয়া হয়।

এ কথা এখন জানা গেছে যে সরকার এই সময়ে জওহরলাল নেহরুকেও একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গ্রেফতার করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু এর ফলে যে ধরনের বিক্ষোভ এবং আন্দোলন হতে পারে, তা ভেবে সাহস করেন নি। নেহরু অবশ্য রাজবন্দীদের স্বপক্ষে আইনজ্ঞদের সাহায্য পাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা কমিউনিস্টদের এই বিচার-মামলাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যায়।

১৯২৯ সালে পুরো বছর ধরেই অবশ্য বিভিন্ন ধর্মঘট চলতে থাকে। নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ.আই.টি.ইউ.সি.) অধিবেশনে বামপন্থী নেতারা 'হুইট্‌লি কমিশন'কে বর্জন করার ব্যাপারে এবং 'এ.আই.টি.ইউ.সি.'কে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থার (লীগ এগেন্‌স্ট ইম্পিরিয়ালিজম্) সঙ্গে যুক্ত করার প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন পেলেন। এন.এম.যোশীর দল এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু ভোটে তাঁরা পরাজিত হন। এরপর তাঁরা এ.আই.টি.ইউ.সি. ত্যাগ করে একটি নতুন শ্রমিক-ইউনিয়ন গড়ে তোলেন যার নাম নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (এ.আই.টি.ইউ.এফ.)। এই সংস্থাটি সব রকম বিপ্লবী আদর্শ, এমন-কি, রাজনৈতিক কাজকর্ম বর্জন করে শুধুমাত্র শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণে নিযুক্ত থাকবে স্থির করল। অবশ্য সাধারণভাবে

শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রগতিবাদী গোষ্ঠীগুলিও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন যাঁরা, তাঁরা জাতীয় কংগ্রেস থেকে দূরে সরে ছিলেন। তাঁদের মতে (কংগ্রেসের) নেতৃবর্গ বিশ্বাসভাজন নন, এবং তাঁর মতাদর্শও 'বুর্জোয়া' এবং প্রতিক্রিয়াশীল। অবশ্য শ্রমিকদের দিক থেকে দেখতে গেলে এ কথা সত্য।

এইভাবে, বামপন্থীদের মধ্যে দুটি দিক (একটি সংরক্ষণশীল ও অন্যটি প্রগতিবাদী) থাকায় এবং সরকারী দমন-নীতির ফলে তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে জাতীয় অভ্যুত্থানে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব কমে যায়।

পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং বাংলাদেশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুবসমাজের মধ্যে আবার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এঁরা কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং অহিংস আন্দোলন সম্বন্ধে ক্রমেই হতাশ হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫ সালে উত্তর প্রদেশে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যা 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত হয়। এই মামলায় তিনজন বন্দী—রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশনলাল এবং আশফাকুল্লাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অন্যান্য যাঁদের এই ঘটনায় লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয় তাঁরা গ্রেফতার এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। ১৯২৮ সালে অবশ্য পলাতকদের মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রশেখর আজাদ জেলের বাইরে ছিলেন। ইনি এখন এগিয়ে এলেন 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মি'র সংগঠনকারীদের অন্যতম হয়ে। ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী এই সংগঠনের নাম কিছুদিন পরে পরিবর্তন করে রাখা হল 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন'।

৩০ অক্টোবরে 'সাইমন কমিশনে'র সদস্যরা যখন লাহোরে যান তখন পাঞ্জাবের প্রবীন নেতা লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ মিছিল যথারীতি 'সাইমন ফিরে যাও' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে তাঁদের অভ্যর্থনা করে। এই অহিংস মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ আক্রমণ চালায়, এবং হাঙ্গামার মধ্যে লাজপৎ রায় লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন। ১৯২৮-এর ১৭ নভেম্বর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জনমত এইজন্যে পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট মি: সণ্ডার্সকেই দায়ী করে—কারণ তিনিই লাঠি চালানর হুকুম দিয়েছিলেন। 'পাঞ্জাব ও নওজওয়ান ভারতসভা'র নেতা ও 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের'র সদস্য ভগৎ সিং-এর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সণ্ডার্স মারা যান। ভগৎ সিং তাঁর দুই সহকর্মীর সঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯০৭ সালে ভগৎ সিং-এর জন্ম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অজিৎ সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৯২৮ সালে নওজওয়ান ভারতসভা পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে; অক্টোবরে ভগৎ সিং এবং তাঁর সহকর্মীরা দিল্লিতে ফিরোজ শা কোটলার কাছে একটি সভায় উপস্থিত হন। সভাটির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্থান

সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন (এইচ.এস.আর.এ.) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগঠনের বিশ্বাস ছিল গণবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দেশকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা সম্ভব; 'জনগণের জন্য জনগণের বিপ্লব' এই শ্লোগান তাঁদের যুগেই প্রথম শোনা যায়। গ্রামবাসীদের কাছে রাজনীতি ব্যাখ্যা ও প্রচারেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে সন্ত্রাসবাদ হ'ল প্রথম এবং একান্ত আবশ্যকীয় পর্যায়। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত শৌর্য ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তবেই জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এইচ. এস. আর. এ. সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে বেরিয়ে আসবেন এবং নিজেদের কার্যকলাপের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্যার জর্জ শুস্টার একটি বিশেষ 'অর্ডিনান্স' জারী করেন। এর দ্বারা ট্রেড ডিসপিউট' আইনটি, ও 'পাব্লিক সেফটি' আইনের একটি সংশোধনী বলবৎ করা হয়। এরই প্রতিবাদে, আইনসভার দর্শম-মণ্ডলীর গ্যালারি থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সরকারী আসনগুলি লক্ষ্য করে একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। তার সঙ্গে তাঁরা 'লাল ইস্তাহার' বলে একটি পুস্তিকার অনেক কপিও আইনসভার কক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। বোমা নিক্ষেপ করার ফলে কেউ অবশ্য আহত হন নি, কারণ বোমাটি সশব্দে ফাটলেও, মারাত্মক ছিল না। বিপ্লবীদের কাউকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা উদ্দেশ্য ছিল না; ওই পুস্তিকাটিতে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যে তাঁরা 'বধিরের' কানেও নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেবেন। এঁরা স্বেচ্ছায় ধরা দেন যাতে বিচারকক্ষকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের মতাদর্শ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেন। কমিউনিস্টরাও মীরাটে এই নীতিই গ্রহণ করেন।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের শ্রমিক সংগঠকদের এবং 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর মধ্যে কয়েকটি ব্যাপারে মতাদর্শের গভীর পার্থক্য ছিল। অথচ, মতাদর্শে এবং কর্মপদ্ধতিতে দুই দলের মিলও ছিল খুব। সাধারণভাবে, দুটি দলই জনসাধারণের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম দমননীতি ও বিভাজন নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মূর্তি তুলে ধরেন। জনসাধারণ তখনো কম্যুনিজমের জন্য প্রস্তুত হয় নি; আর নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে ১৯০৫-এর আন্দোলনের সময় থেকেই বীর পূজার ঐতিহ্য প্রবল। জনমানসে জগৎ সিং ও এইচ.এস.আর.এ.-র প্রতি আকর্ষণই তাই ছিল বেশি। লাহোর কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন যখন শুরু হল তখন এর আকর্ষণই জনসাধারণকে আন্দোলনের পথে টেনে নিয়ে এল।

কংগ্রেসের মধ্যেও তখন ঐক্যের অভাব। গান্ধীজি এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা বিশ্বাসের বিষয়, কোনো পরিস্থিতিতেই তাঁরা হিংসা ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন

তাঁরা। আবার অন্য অনেকে গান্ধীজি, তাঁর নেতৃত্ব ও তাঁর কর্মসূচীকে গ্রহণ করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো বিকল্প আর কিছু নেই এবং তাঁর কর্মসূচীর সাফল্যলাভের সম্ভাবনা প্রবল। তাঁরাও অহিংসা বর্জন করেছিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে অসমে অসমে লড়াই হয়ে দাঁড়াবে। বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, বা তা দিয়ে যদি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা যায় তা হলে সে কার্যকলাপকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার আর-একটি অস্ত্র বলে স্বীকার করতে তাঁরা রাজি ছিলেন। আরো একদল ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে দু-ধরনের বিক্ষোভই দরকার। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও এই ধরনের মতপার্থক্য ছিল। কেউ কেউ ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আন্তরিকভাবে বামপন্থী চিন্তায় বিশ্বাসী; আবার কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবে সমাজতন্ত্রের বিরোধী। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীরা যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে বিশ্বাস করতেন, সমাজতান্ত্রিকে নীতির মতো সে কর্মসূচীও সমতাবাদী এবং বিত্তবিরোধী, এমন-কি, সাম্যবাদী বলে দাবি করা হত। কিন্তু রাষ্ট্রের মালিকানা, ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীর গুরুত্ব প্রভৃতি সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলিকে তাঁরা বর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তি অত্যন্ত উঁচু ধরনের নীতিসম্পন্ন মানুষে পরিণত হতে পারে; এই ধরনের মানুষ নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে সে সমাজই আদর্শ সমাজ; সরকারের সেখানে করার মতো প্রায় কিছুই থাকবে না।

এই-সব কারণে লক্ষ্যের অনেক মিল থাকলেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র কিছু ছিল না। নেতাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না পাওয়ায় জনসাধারণের উৎসাহও অনেকটা পথভ্রষ্ট এবং স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সংগঠন গড়ে তোলার বোধও তাঁদের ছিল না; আন্দোলনটির মধ্যে গতিশীল এমন কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না যা সমস্ত শক্তি একত্রিত ও সংহত করতে পারে।

ভগৎ সিং এবং তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা শুরু করলেন। এ মামলা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন যে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে; তাঁরা যে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা যে তাঁদের প্রাপ্য তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁরা অনশন শুরু করলেন। তাঁরা যাতে শহীদের মৃত্যু বরণ করতে না পারেন, জেল-কর্তৃপক্ষ সেজন্য বাধ্য হয়ে তাঁদের জোর করে খাওয়াতে শুরু করলেন। বন্দী যতীন দাসকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই খাবার বা ওষুধ খাওয়ানো গেল না; ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শেষ কথা : 'আমি শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করব।'

১৯২৫ সালের পর ভগৎ সিং এবং আরো অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী মার্কসবাদের কিছু মূল বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই, জেলের ভিতরে ও বাইরে, সন্ত্রাসবাদকে নতুন আলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। ক্রমে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে গণবিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এর ফলে উত্তর ভারতে সন্ত্রাসবাদ হ্রাস পেতে লাগল।

ত্রিশ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলন ঠিক কিভাবে ঘটেছিল তা জানতে হলে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেকার কয়েকটি ঘটনা জেনে নিতে হবে। ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি তখন ক্ষমতাসীন। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী। সমাজবাদী ও একদা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল নীতিকে বজায় রাখতে চাইলেন। তাঁর ভারতীয় সমর্থকরা এতে ক্ষুণ্ণ হন। গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইন পরামর্শের জন্য ইংলণ্ড যান এবং ভারতে ফিরে এসে ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবের প্রতি সর্বাধিক সর্বদলীয় সম্মতি আদায়ের জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে।

আরউইনের অক্টোবরের বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে গান্ধীজি ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে দাবি জানানো হয় যে ব্রিটিশ-সদিচ্ছার প্রমাণ হিসাবে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক। জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রের সহযোগে প্রথমে একটি অনমনীয় দাবি পেশ করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি ও পিতার পরামর্শে সর্বদলীয় ঘোষণাপত্রে তাঁদের সঙ্গে সই করেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজির মন্ত্রে নেহরু দীক্ষা লাভ করেছেন। এই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে জিন্নাও একমত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল যেন বিনাশর্তে আরউইন-ঘোষণাকে সমর্থন জানানো হয়। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে নেতাদের মধ্যে আদৌ একতা ছিল না। পুরনো ও নতুন নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। নরমপন্থী নেতাদের প্রাধান্য হ্রাস পেতে লাগল এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী নেতাদের প্রভাব বাড়তে লাগল। একদিকে যাঁরা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট যেমন মতিলাল নেহরু ও গান্ধীজি, অন্য দিকে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র যারা পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে অটল। এই বিভেদের মধ্যেও ত্রিশ শতকের আন্দোলনে জওহরলাল নেহরুই একটি মীমাংসা আনতে পেরেছিলেন।

দিল্লির ঘোষণাপত্রে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে যে-সব বিষয়ে অনুমোদন আশা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে কোনো ক্রমে বাধ্য করতে না পারায় আরউইন নরমপন্থী নেতাদের কাছেও অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গান্ধীজি, মতিলাল ও জিন্নাকে ২৩ ডিসেম্বর তিনি জানিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার আগামী গোলটেবিল

বৈঠকে কোনো বিশেষ দলকে সমর্থন করতে অক্ষম। শেষ মুহূর্তে, গান্ধীজি চরমপন্থীদের পূর্ণ স্বরাজ দাবি সমর্থন করে বসলেন। তিনি বললেন : 'আমার তরী জ্বালিয়ে দিয়েছি।' অন্য দিকে অনেকে ভাবলেন বামপন্থীদের সমর্থন করে গান্ধীজি তাঁদের আপসহীন দাবিকে দুর্বলই করে ফেলছেন।

লাহোর : ৩০ ডিসেম্বর। হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপে তখনো কর্মচঞ্চল, এই শহরে কংগ্রেস দিল্লি ঘোষণাপত্রকে সমর্থন করলেও প্রস্তাব নিলেন যে আরউইনের নীতির ফলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের কিছুই লাভ হবে না। নেহরু রিপোর্টও ইতিমধ্যে বাতিল হয়ে গেছে। এখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা দরকার।

কংগ্রেস প্রস্তাবে এই আন্দোলন আইন অমান্য নামে বর্ণিত হল। নরমপন্থীরা এর ব্যাখ্যা করলেন যে, সমস্ত সরকারী শাসনসংক্রান্ত, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য সংস্থার কোনো নিয়মকানুন পালন করা হবে না। গান্ধীজি সমর্থন জানালেন কারণ তাঁর ভয় ছিল হয়তো যুব সম্প্রদায়ের হতে আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠবে। তিনি বললেন : 'একমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারাই দেশকে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, কারণ দেশে এমন একটি দল রয়েছে যারা আলোচনা, বক্তৃতা কিংবা প্রস্তাব—কোনো কিছুই শুনতে রাজি নয়, যারা বিশ্বাস করে শুধু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।' আন্দোলনকে আইনসভার মধ্যে নিয়ে যাবার স্বরাজবাদী কর্মসূচী ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন কংগ্রেস একটি সাংগঠনিক বিপ্লবের সূচনা করুক এবং একটি বিকল্প সরকার গঠন করুক। শ্রমিক, কৃষক ও যুবসম্প্রদায়কে সেই উদ্দেশ্যে গড়ে তুলুক। তাঁর এ প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল না।

দলগত বিভেদ ও বিরোধের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ব্যাহত হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি এক অকৃত্রিম একতাবোধ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশের সাধারণ লোক পূর্ণ স্বরাজ দাবিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। শুধু যুব সম্প্রদায়ের কাছে এই দাবির একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা নয়, প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধেরাও এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ইংরাজ কখনোই ভারতীয় জনসাধারণের হাতে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে না। পূর্ণ স্বরাজই একমাত্র পথ যে পথে ভারতের অগ্রগতি হতে পারে। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য কিছু নরমপন্থীরা পূর্ণ স্বরাজ দাবিকে সমর্থন করেন নি। তাঁরা সংখ্যালঘু। 'সাইমন ফিরে যাও' আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে যে সামগ্রিক একতাবোধ সৃষ্টি করেছিল তা অক্ষুণ্ণ রইল।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুষ্ঠু সংগঠন দেওয়ার জন্য স্থানীয় লোকেদের নিয়ে ছোটো ছোটো দল গঠনের যে ইচ্ছা সুভাষচন্দ্র ও আর অনেকের ছিল তা অস্বীকার

করা যায় না। তবে ১৯৩০ সালে সারা ভারতে জাতীয় চেতনা ও স্বরাজের প্রতি জাতীয় সমর্থন অনেকটাই গান্ধীজির আত্মসম্মান, গ্রাম-উন্নয়নমূলক কর্ম ও বাণীর ফল বলা যেতে পারে।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি

১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাস ছিল অভূতপূর্ব উৎসাহব্যঞ্জক। আন্দোলনের দিন তখনো ঠিক হয় নি,কোনো কার্যসূচীও না। সবকিছুই গান্ধীজির ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজি মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন আন্দোলন স্থগিত করা হবে না বা প্রত্যাহৃত হবে না যেমন ঘটেছিল চৌরীচৌরার ব্যাপারে। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> গান্ধীজি আমাদের এই ধারণা দিলেন যে আইন অমান্য আন্দোলনে শুরু হলে, কিছু এদিক ওদিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য, থামবে না।...এই আশ্বাসে আমাদের অনেকেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

স্থির হ'ল ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি সারা দেশে প্রকাশ্য জনসভায় যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব লোকে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিজ্ঞাপত্রে বা ঘোষণাপত্রে শপথ গ্রহণ করবেন। এইদিনেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার কথা। এদিন 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষিত হল।

যে কারণে এই আন্দোলন আরম্ভ হয় তা এমনভাবে ঘোষণাপত্রে বর্ণিত হল যা সব শ্রেণীর ও প্রায় সব দলের লোকের কাছেই অনুমোদনযোগ্য হয়ে রইল। প্রতিজ্ঞা পত্রটি এই রকম :

> আমরা বিশ্বাস করি, শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার মৌলিক অধিকার আছে, পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার যেমন আছে, তেমনি জীবন ধারণের রসদ পাবার—যাতে জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ মেলে। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, কোনো সরকার যদি এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে, তাদের নির্যাতন করে, তা হলে সে শাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ বা সে সরকারের পরিবর্তন ঘটাবার অধিকার তাদের আছে। ভারতে ব্রিটিশ সরকার শুধু যে ভারতবাসীকে তাদের স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, জনসাধারণের শোষণের ওপর তাদের ভিত গড়ে তুলেছে। এভাবে তারা ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মনোবলকে খর্ব করে ভারতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে ইংরাজ সরকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য যত্নশীল হওয়া দরকার।

কিন্তু যেহেতু এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি সর্বদলীয় লোকের কাছে সমানভাবে অনুমোদনযোগ্য করে তোলার দরকার ছিল, সেজন্য কয়েকটি বিতর্কমূলক সমস্যার উল্লেখ এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভারতের কৃষি-উৎপাদনের

অবক্ষয় ও প্রাচীন শিল্পের বিনাশ অর্থনৈতিক অধোগতির কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ভারত থেকে বিভিন্নভাবে সম্পদ ক্রমাগত পাঠাবার কথাও বাদ যায় নি। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের আধুনিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফলস্বরূপ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে বলা হয় বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রতা এবং সৈন্যবাহিনী দেশ দখল করে রাখার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বহিঃশক্তির উপর নির্ভরতা। এই-সব থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়াল যে গান্ধীজির অহিংসামূলক আইন অমান্য আন্দোলনই স্বাধীনতা আন্দোলনের অস্ত্র। ঘোষণাপত্রে লেখা হল :

> হিংসার পথেই স্বাধীনতা পাওয়া যাবে সেটাই একমাত্র জোরালো পথ—এ আমরা মানি না। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সাধামতো সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করে, কর না দিয়ে এবং অন্য ভাবে আইন অমান্য করার জন্য নিজেদের সবরকম উপায়ে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা যদি স্বেচ্ছায় সবরকম সাহায্য প্রত্যাখান করি, যদি কর না দিই, সবরকম প্ররোচনা সত্বেও যদি হিংসার পথ বর্জন করি তবে এই নৃশংস শাসনব্যবস্থার অবসান অনিবার্য।

এর পরের এক লাইন শুধু পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেসের নিয়মাবলী পালনের অঙ্গীকার। যে চার রকম অবক্ষয়ের বিশ্লেষণ প্রতিজ্ঞাপত্রটিতে করা হয়েছিল তাতে সমাজতন্ত্রবাদের কোনা চিন্তা কোথাও প্রতিফলিত হয় নি। কংগ্রেসের কার্যকর কমিটির অনুসৃত নীতি হল আবেদন করে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন। এর সাফল্য সরকারী মনোভাবের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

এই সময় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে প্রকাশিত তাঁর একটি নিবন্ধে গান্ধীজি ১১-দফা শাসনসংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব আনলেন। যদি ইংরাজ সরকার সেগুলি গ্রহণ করেন তা হলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতে পারে। তিনি কী করতে চাইছেন সে সম্পর্কে গান্ধীজি নিজে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না। কবি এবং জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন : আমি রাতদিন ধরে খুবই ভাবছি, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোনো আলোর নির্দেশই পাচ্ছি না।

৬ মার্চ গান্ধীজি আরউইনকে জানালেন অবিলম্বে ১১-দফা আইন ও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকর না করা হলে আইন অমান্য আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে চালানো হবে যাতে সাধারণ কৃষক সমাজের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া যায়। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন :

> যখন আমরা স্বাধীনতাই দাবি করছিলাম তখন এইভাবে সামাজিক ও আইনগত সংস্কারের তালিকা তৈরির কী দরকার ছিল বুঝি না। স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি গান্ধীজি কি সত্যি তাই বুঝতেন, না আমরা স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছি?

লবণ সত্যাগ্রহ

অবশেষে, গান্ধীজিই মনস্থির করলেন। ঠিক হল, তিনি ৭৮ জন সুযোগ্য অনুগামীদের নিয়ে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে রওনা হবেন এবং সমুদ্রের ধার দিয়ে ১০০ মাইল পদব্রজে গুজরাটের গ্রামগুলি অতিক্রম করে দণ্ডীতে পৌঁছবেন। সেখানে গান্ধীজি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্রকাশ্যে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে সরকারী আইন অমান্য শুরু করবেন। গান্ধীজি যখন দণ্ডী যাত্রা শুরু করলেন জাতীয় চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। লাঠির ওপর ভর দিয়ে শীর্ণ, কৃষকের মতো শরীর নিয়ে গান্ধীজি যখন চলতে শুরু করলেন গ্রামের লোকেরা ভিড় করে দেখতে এল। যে আইনের ফলে দেশে সাধারণ লোকের ওপর করভার এবং সেইসঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছিল তারা দেখল গান্ধীজি কি ভাবে সেই আইন ভাঙেন। গান্ধীজির আন্দোলনে যোগদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বেড়ে একটি বিরাট আকার নিয়ে দণ্ডীর পথে এগোতে লাগল।

ভারতের সমস্ত বড়ো শহরগুলিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক উত্তেজনার ঢেউ দেখা গেল। আইন ভঙ্গে দলে দলে মেয়েদের যোগদান এই উত্তেজনার প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় গান্ধীজি ভারতের নারী সমাজের কাছে চরখায় সুতো কাটার আবেদন জানালেন। এবং অনুরোধ করলেন যেন তাঁরা ঘরের কাজ ছেড়ে বিদেশী পণ্যের দোকানে ও সরকারী সংস্থায় ধরনা দেন। প্রথমে মাত্র কয়েকজন মহিলা, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয় নেতাদের যথা চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরুর পরিবারের, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অধিক সংখ্যায় মহিলারা এই আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। সে সময় শুধু দিল্লির মতো সামাজিক ভাবে গোঁড়া শহরেই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৬০০ মহিলা কারাবরণ করেন। বোম্বাইতে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। এমন-কি, ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা লেখেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি আর-কিছুই না করে থাকে, ভারতীয় নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভে বহুলাংশে সাহায্য করেছে। এটা একটা বড়ো লাভ। যা একশত বছরের তিন-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেও সম্ভব হয় নি। তা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় নারী কুসংস্কার বন্ধন থেকে মুক্ত হল।

ইতিমধ্যে এপ্রিল ও মে মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা লবণ আইন অমান্য করলেন। সত্যাগ্রহ শুরু করার আগেই এবং সরকারী ডিপো ধরসনাতে লবণ তৈরি করতে পারার আগেই গান্ধীজি গ্রেফতার হলেন। তাঁর স্থান পূরণ করে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন আব্বাস তায়বজী, বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনিও বন্দী হলেন। এর পরে এলেন দৃপ্ত জাতীয়তাবাদী কবি সরোজিনী নাইডু। ২১ মে ধরসনাতে তাঁর লবণ তৈরি করার প্রচেষ্টার জীবন্ত

বর্ণনা দিয়েছেন মার্কিন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। মিলার বহুকষ্টে ওই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। মিলারের কথায় :

> যাত্রার পূর্বে শ্রীমতী নাইডু প্রার্থনা সভা আহ্বান করলেন। সব স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়লেন। তিনি বললেন : ভারতের সম্মান আমাদের হাতে। আপনাদের এরা মারবে কিন্তু কোনোরকম ভাবেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করবেন না, এমন-কি, আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য হাতও তুলবেন না। তীব্র জয়ধ্বনিতে আর কিছু শোনা গেল না।
>
> ধীরে ও নিঃশব্দে জনতা লবণ ডিপোতে পৌঁছানোর জন্য আধমাইল পথ হাঁটতে শুরু করল। লবণ সেখানে জমেছিল তার চার দিকে জলভর্তি গর্ত। সুরাটের ৪০০ স্থানীয় পুলিশ সেগুলি পাহারা দিচ্ছিল, ৬ জন ইংরাজ অফিসারের অধীনে। পুলিশের হাতে ছিল পাঁচফুট লম্বা ও অগ্রভাগ লোহা দিয়ে মোড়া লাঠি। কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে চারপাশে ২৫ জন রাইফেলধারী দাঁড়িয়ে ছিল।
>
> ...পুলিশ কর্মচারীরা হুকুম দিলেন যে সত্যাগ্রহীরা যেন ছত্রখান হয়ে চলে যান কারণ সাম্প্রতিক আইন অনুসারে কোনো একস্থানে পাঁচজনের বেশি লোক জড় হতে পারেন না। লাইনের প্রথম সারিতে সত্যাগ্রহীরা নীরবে এ আদেশ উপক্ষো করে এগোতে থাকলেন। একদল এ দেশীয় পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের মাথায় লোহা-মোড়া লাঠির আঘাত অজস্রভাবে বর্ষণ হতে লাগল। একটি সত্যাগ্রহীও আত্মরক্ষার্থে হাত তুললেন না। খালি মাথায় লাঠি পড়ার অস্বস্তিকর ঠকাঠক শব্দ শুনতে পেলাম। দর্শকরা প্রতিটি লাঠি পড়ার আঘাতে সত্যাগ্রহীদের জন্য সহানুভূতিতে কাতরাতে লাগলেন।
>
> ...কয়েক মিনিটের মধ্যে জায়গাটি আহত লোকে ঢাকা পড়ে গেল। চাপ চাপ রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সাদা পোশাকে। যখন প্রথম লাইনের সকলেই ধরাশায়ী, স্ট্রেচার-বাহকেরা তাড়াতাড়ি এসে আহতদের তুলে নিয়ে গেল।...
>
> সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি সারি তৈরি হয়ে গেল এবং নেতারা অনুরোধ করতে লাগলেন যেন সত্যাগ্রহীরা আত্মসংযম রক্ষা করেন। যাত্রা শুরু হল। কোনো সংগীত নেই, উৎসাহোদ্দীপক হাততালিও নেই, কোনো সম্ভাবনা নেই মৃত্যু কিংবা আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার। পুলিশ দল বেঁধে ছুটে এল এবং বিনা দ্বিধায় সত্যাগ্রহীদের মারতে শুরু করল। আমি দেখতে পেলাম ১৮ জন আহত সত্যাগ্রহীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ৪২ জন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন স্ট্রেচার-বাহকের অপেক্ষায়।

মিলারের রিপোর্টে পাওয়া যায় দর্শকবৃন্দের ওপর পুলিশী অত্যাচারের এক বিস্তৃত বিবরণ। মিলারের নিজের প্রতিক্রিয়া এই রকম :

> আত্মরক্ষায় বিমুখ কতকগুলি লোককে প্রহৃত ও অত্যাচারিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি এক সময় এত অস্থির হয়ে পড়লাম যে আমায় মুখ ফেরাতে হচ্ছিল...। আমি এক নিষ্ফল আক্রোশ ও অবর্ণনীয় ঘৃণা বোধ করতে লাগলাম।...

অহিংস আন্দোলন কয়েকবার প্রায় ব্যর্থ হল। উত্তেজিত জনতাকে নেতাদের

বারবার বলতে হল গান্ধীজির উপদেশ স্মরণ রাখার কথা। মনে হচ্ছিল যেন এখনই নিরস্ত্র জনতা সমবেতভাবে পুলিশের ওপর আঘাত হানবে। ইংরাজ পুলিশ সুপার তাঁর রাইফেলধারী বাহিনীকে একটা ছোটো পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলেন এবং জনতার প্রতি গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত রাখলেন। নেতারা কোনোক্রমে স্বেচ্ছাসেবকদের সংযত করে রাখলেন।

সকাল ১১টা সেদিনটা খুব গরম। তাপমাত্রা ১১৬ ডিগ্রীতে পৌঁছেছে। আন্দোলন সবে একটু শান্ত। ৩২০ জন সত্যাগ্রহী সাংঘাতিক ভাবে আহত। দু'জন মারা গেছেন। শুশ্রূষারত ডাক্তার নেই বললেই চলে। মিলার যখন এই ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠাতে চাইলেন, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে বাধা দিলেন এবং পরে সেন্সর করে দিলেন। অনেক পরে মিলার বই আকারে এটি প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীজির কারারুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। বোম্বাই শহরের ভেন্দী বাজার ও ওয়াডালা এলাকায় হাঙ্গামা হল। কিন্তু ইউরোপীয় বসবাসের এলাকায় মিছিল সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। মাদ্রাজে পুলিশের লাঠি কোনো ভেদাভেদ মানে নি। বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যায় বিদেশী কাপড়ের বয়কট সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। উত্তর প্রদেশে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য কৃষক ও জমিদারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। অক্টোবরের পর আহ্বান হ'ল কৃষকরা যেন জমিদারকে খাজনা না দেন। মধ্য প্রদেশে অরণ্যকরের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু হল। কর্ণাটকে কর না দেওয়ার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'ল।

এই আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরেও খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ইতিমধ্যে পাঠান উপজাতিরা ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ডেরা ইসমাইল খান ও পেশোয়ারের লোকেরা এবং বান্নু ও কোহাট নদীর উপত্যকায় লোকেরা স্থানীয় প্রধানদের আওতায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণ কৃষিজীবন যাপন করেছিল। পেশোয়ারের কাছে উৎমান জাই গ্রামের অন্যতম সর্দার খান আবদুল গফর খান প্রথম পাঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯১৯ সালে হিজরত ও আফগান সমর্থক আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য তাঁকে জেলে রাখা হয় এবং পরে অনেকদিনের জন্য তাঁকে ওই প্রদেশ থেকে দূরে রাখা হয়। ১৯২৯ সালের অব্যবহিত পূর্বেই তিনি ফিরে আসেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডা: খান সাহেবের সঙ্গে তিনি পাঠানদের সংগঠন করেন ও অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার জন্য তিনি সীমান্ত গান্ধী নামে অভিহিত হন। প্রথমে তিনি পাঠান জিরাগ বা পাঠান উপজাতি পরিষদের একটি শাখা স্থাপন করেন। এই শাখাটি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের ইউনিটের মতোই। খোদা-ই খিদমতগার বা ভগবানের সেবক নামে সংগঠনটি পরিচিতি লাভ করে। তাঁদের পোশাকের জন্য তাঁরা 'লাল কুর্তা' বা 'রেডশার্ট' আখ্যাও পান। পাঠানদের মধ্যে জাতীয় একতাবোধের প্রতি তাঁরা আহ্বান জানান এবং উপনিবেশবাদ ও হস্তশিল্পের অবক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা

করতে থাকেন। সংগঠনটি গরিব কৃষক ও শিল্পশ্রমিকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করল। ১৯৩০ সালে খোদা-ই-খিদমতগারের সদস্য ছিল ৮০,০০০। গান্ধীজির ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে ভারতের অন্যান্য জায়গায় দলের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব দমন করা যত না শক্ত ছিল, গফর খানের পক্ষে তাঁর দলের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি দমন করা অনেক বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পেশোয়ারে আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার কথা ২০ এপ্রিল। প্রচুর গরিব কৃষক জড় হয়েছেন ঈদ উৎসবের প্রাক্কালে। সীমান্তের বহু উপজাতির লোকেরা সে সময় সমতলভূমিতে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরেন। ঐ উৎসবে তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের যখন ধরা হল, জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাল এবং পুলিশের হাত থেকে তাঁদের মুক্ত করতে চেষ্টা করল। সীমান্তের উপজাতিরা এঁদের সহযোগিতা করল। বিবাদ-বিসম্বাদে আবহাওয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং দু'পক্ষ থেকেই গোলাগুলি চলতে লাগল। এ সংঘর্ষ ক্রমে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করল। পেশোয়ারে বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটিশ সৈন্যবাহী গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। তাদের পথ রোধ করার জন্য ব্যারিকেড গড়ে তোলা হল। সরকারী কর্মচারীরা ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সৈন্যশিবিরে আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী শিখগোষ্ঠীভুক্ত আকালীরা ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিচ্ছিলেন। রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেলের দু'দল পদাতিক সৈন্যদের যখন হুকুম দেওয়া হল জনতার উপর গুলি বর্ষণের জন্য, তাঁরা তাঁদের এক সহযোগী চন্দ্রসিং গাড়োয়ালের আবেদন অনুসারে গুলি করতে অস্বীকার করেন এবং মুসলমান পাঠান সহযোগীদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হন। ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসন' নীতির দুর্বলতা এর দ্বারা আবার একবার প্রমাণিত হল। যদি লোকেরা আগের থেকে শিক্ষিত হত এবং একতাবদ্ধ হত তা হলে এই নীতি কখনো সফল হতে পারত না।

গাড়োয়ালী পদাতিক সৈন্যদের ইংরাজ সৈন্যরা ঘিরে ফেলল। পরে সামরিক বিচার হ'ল। তাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল। মে মাসের প্রথমের দিকে পার্বত্য অঞ্চলের আফ্রিদী ও মোহম্মদ উপজাতিরা বিদ্রোহ করে এবং পেশোয়ারের বিদ্রোহে যোগদানের জন্য রওনা হয়। পেশোয়ারের এই বিদ্রোহের প্রতি পাঞ্জাবে এক বলিষ্ঠ সমর্থন দেখা গেল, বিশেষ করে আকালী দলের মধ্যে। স্থানীয় আন্দোলনকারীদের সহয়াতার জন্য তাঁরা একটি দল পাঠালেন। ঝিলম নদীর ধারে ব্রিটিশ সৈন্য ওঁদের আটকে রাখলেন। শেষে, একদল ব্রিটিশ সৈন্য সীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করে এবং উপজাতিদের হঠিয়ে পার্বত্য এলাকায় পাঠিয়ে দেয়।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে সূর্য সেনের নেতৃত্বে কিছু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। তাঁরা চট্টগ্রামে অস্ত্রাগারগুলি একসঙ্গে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

সূর্য সেনের সহচরদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল এবং পরবর্তীকালের নামকরা কম্যুনিস্টকর্মী গণেশ ঘোষ, এঁরা স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সংগঠিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দ গুপ্ত এবং টেগরা (টাইগার) বল এবং কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওহদেদারের মতো বীর মহিলা।

ভারতীয় রিপাবলিকান সেনাবাহিনীর নামে একটি ঘোষণাপত্রে সূর্য সেন সমস্ত ভারতীয়কে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানালেন। সূর্য সেন এবং তাঁর সহচরেরা ঠিক করলেন চারটি কেন্দ্রে ইউরোপীয়দের উপর হামলা করা হবে। ইংরাজ সৈন্যের পোশাকে পঞ্চাশজন যুবক পুলিশ অস্ত্রগার লুণ্ঠন করলেন। এই কাহিনীকে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বলা হয়।

কিন্তু যুবকেরা তাড়াতাড়িতে যে রাইফেল ও বন্দুক লুণ্ঠন করেছিলেন তার গোলা বারুদ আনতে ভুলে যান। তার ফলে সহকারী পুলিশ ইনস্পেকটর জেনারেলের নেতৃত্বে ছোটো একটি সরকারী দলের তাড়নাতেই তাঁদের পিছু হটতে হয় এবং চট্টগ্রামের বাইরে পর্বতাঞ্চলে পালিয়ে যেতে হয়। ২২ মে একটি ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট ৫২ জন বিপ্লবীকে ঘিরে ফেলে। তবুও তাঁদের মধ্যে অনেকেই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এর ফলে ৬৪ জন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছিলেন। সবচেয়ে কনিষ্ঠ বিপ্লবী টেগরা বল প্রথম গুলিতেই সাংঘাতিকভাবে আহত হন। লোকনাথের প্রতি তাঁর শেষ কথা : 'আমি মরছি, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাও।'

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ এর পর সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। অগাস্ট মাসে বিনয় বোস নামে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল স্কুলের একটি ছাত্র একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করলেন এবং নিরুদ্দিষ্ট হলেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি বাদল ও দিনেশের সঙ্গে, সরকারের প্রধান কার্যালয় ডালহৌসি স্কোয়্যারে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ প্রবেশ করে জেলের ইনস্পেকটর জেনারেলকে গুলি করেন। বারান্দা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার সময় ইউরোপীয় যাকেই দেখেন তাকেই এঁরা গুলি করেন। বন্দী হওয়ার আগে বাদল বিষ খেলেন, বিনয় ও দিনেশ নিজেদের গুলি করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিনয় বোস মারা গেলেন, দিনেশ সেরে উঠলেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হ'ল।

উত্তর ভারতে সন্ত্রাসবাদকে জিইয়ে রেখেছিলেন দক্ষ সন্ত্রাসবাদী চন্দ্রশেখর আজাদ। পুলিশ তাঁর সহকর্মীদের বন্দী করল এবং তাঁর সরবরাহের উৎসগুলি খুঁজে বার করল। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ তাঁর খবর দেয় এবং এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে তিনি যুদ্ধ করতে করতেই মারা গেলেন।

তার আগে ১৯৩০ সালে ইংরাজ সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা অর্ডিনান্সের মধ্যে আইনের অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন যাতে ভগৎ সিং ও তাঁর সহচরদের প্রচলিত আইনানুসারে সাক্ষী জোগাড় করার ও আপীল করার অধিকার না দিয়েই

বিচার করা যায়। ৭ অক্টোবর ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল এবং অন্যান্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হ'ল। আন্দামানের কুখ্যাত কারাগারে অনেকেই বন্দী হয়ে রইলেন।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের এই-সব আক্রমণের মধ্যে পূর্ববঙ্গের এবং উত্তর প্রদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের দেশ প্রীতিই প্রতিভাত হয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রচলিত ধারায় তাঁদের দেশপ্রেমের উন্মাদনা প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। গান্ধীজির অহিংস নীতিতে তাঁরা পুরোপুরি আস্থাবান হতে পারছিলেন না। তাই তাঁরা সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন। কিন্তু এই সন্ত্রাসমূলক কাজের মধ্যেই তাঁদের নিজেদের ধ্বংসের অঙ্কুর ছিল। সন্ত্রাসবাদী যুবক ও যুবতীদের যথেষ্ট সাহস থাকা সত্ত্বেও, সরকারের শক্তির কাছে তাঁদের হার অবধারিত ছিল। ইংরাজ সরকারের মধ্যে এজন্য কোনো সত্যিকারের ভীতি ছিল না—শুধু এই সন্ত্রাসবাদীদের বিনষ্ট করার একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল। এর কারণ সন্ত্রাসমূলক কাজের পরে কোনো গণবিপ্লব হত না। সাধারণ লোকেরা তখনো প্রস্তুত হন নি বিপ্লবের জন্য, কারণ তাঁদের রাজনৈতিক বিপ্লবের কোনো শিক্ষা ছিল না আর সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের সেভাবে সংগঠনও করেন নি।

মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে সোলাপুরে এইসময় আর একটি গণবিদ্রোহ ঘটেছিল। এখানে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক একটি 'যুদ্ধ পরিষদ' গঠিত হয়। তাঁরাই আইন ভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করেন। শহরে জাতীয় পাতাকা উত্তোলন করা হ'ল। ইংরাজ সরকারের সমর্থনকারী পুলিশ ও অন্যান্য বে-সামরিক কর্মচারীরা রেল স্টেশনের দিকে পশ্চাদপসরণ করলেন। খবর পেয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কারফিউ জারী করলেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য দু'হাজার ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানো হয়। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে অনেকেরই ফাঁসির হুকুম হ'ল বা ধরা পড়লেন।

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের পাশাপাশিই কৃষক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সালে কর না দেওয়ার আন্দোলন থেকে এই বিদ্রোহের জন্ম হলেও এর আসল উৎস কৃষকশ্রেণীর উপর জমিদারের অত্যাচার। পৃথিবীর সমস্ত দেশে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যাবসা জগতে এক ব্যাপক মন্দা চলছে। কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এইসঙ্গে কৃষকশ্রেণীর লভ্যাংশও হ্রাস পেয়েছে। ফলে কৃষকদের পক্ষে জমিদারদের পাওনা এবং সরকারের খাজনা দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল।

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এই সময় ছিলেন জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেসে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে প্রস্তাব পাকা হল যে জাতীয় আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে জমির খাজনা হ্রাসের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ ছাড়া দেনা পরিশোধের উপর সাময়িক বিরতি, ঋণদাতাকে শুধু আংশিক ক্ষতিপূরণ দান, কৃষককে উচ্ছেদ করার জন্য জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার খর্ব করা এই-সবও প্রস্তাবের অংশ ছিল। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি প্রথম দফা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে জমিদার

ও কৃষকরা উভয়েই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু অন্যান্যরা নয়।

এলাহাবাদ জেলার আউধে কর না দেওয়ার আন্দোলন শুরু হয়। এম. এন. রায়, এবং তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রামে গ্রামে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করতে লাগলেন। পূর্ববাংলার কিশোরগঞ্জ নামে এক জায়গায় কেবল পাট উৎপন্ন হত। সারা পৃথিবীতে মন্দার ফলে পাটের দাম হ্রাস পাচ্ছিল। ফলে কৃষকেরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ তাঁরা পাট ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করতেন না। তাঁরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন। এই কাজে কলকাতায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করলেন। কৃষকদের দমনের জন্য সৈন্য পাঠানো হ'ল। ডিসেম্বরে বেরারের বুলডানা জেলার কৃষকেরা পণ্য ব্যবসায়ী ও মহাজনদের শোষণনীতির ফলে নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। এ অঞ্চলে যে তুলা উৎপন্ন হয়েছিল সবই ওরা আগে থেকে কিনে নিয়েছিল। তুলাই ওখানকার প্রধান পণ্য। স্থানীয় জমিদারেরা বর্গাদার ও কৃষিমজুরদের উপর অত্যাচার নানাভাবে বাড়িয়ে দিলেন। বুলডানার কৃষকেরা সমবেত হয়ে কৃষক সংগঠন গড়ে তুললেন। এই সংগঠন স্থির করলেন যে রাজস্ব, খাজনা ও ঋণের সুদ—কোনোটাই দেওয়া হবে না। সমবেতভাবে কৃষকেরা ইংরাজ কর্মচারীদের খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন এবং মিছিল করে ড্রাম বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনমত গঠন করতে লাগলেন। কোথাও কোথাও তাঁরা মহাজন ও জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

গান্ধীজির দণ্ডী যাত্রা পৃথিবীর লোকের কিংবা ভারতের যতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এইরূপ বিক্ষিপ্ত কৃষক-অসন্তোষ কিংবা বিদ্রোহ ততখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলি থেকেই অখিল ভারতীয় কিষাণ সভার জন্ম। এই সংগঠন থেকে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনার অভ্যুদয় হয় যে সাম্রাজ্যবাদ কৃষকদের দুরবস্থার কারণ। বিদ্রোহী কৃষকসমাজ নিজেদের শ্রেণীকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হলেন, কিন্তু শহরাঞ্চলের যে-সব সাহসী বিপ্লবী গ্রামে কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি তাঁরা সমর্থন জানাতেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন শ্রেণী-সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের ধারার সঙ্গে মিলে যায় ও পরে আইন ভঙ্গ আন্দোলনের রূপ নেয়। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই সংগ্রামের সবগুলিই গান্ধীজির অহিংস নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় নি।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

জনতার এই সংগ্রাম হিংস্র রূপ নেওয়ার অনেক আগে থেকেই সরকারী প্রতিক্রিয়া আদৌ আপসমূলক ছিল না বরং ছিল প্ররোচনামূলক। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি প্রেসের কাছ থেকে আমানত দাবি করে ও কংগ্রেস পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে অর্ডিনান্স পাস হল। কংগ্রেস পার্টির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও সরকার

নিলেন। যাঁরা নিয়ম ভঙ্গ করলেন তাঁদের বন্দী করা হল। মে মাসের প্রথমে গ্রেফতার হলেন কংগ্রেস নেতারা। এরপরেই ত্রাসের রাজত্ব শুরু হল। কংগ্রেসের সব স্তরের নেতা ও তাঁদের সমর্থকদের উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গেল।

কংগ্রেস পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য একটি বেসরকারী কমিশন নিযুক্ত করলেন। কমিশনের বক্তব্য 'কংগ্রেস অভিযোগ' নামে প্রকাশিত হল। তার মধ্য সরকারী অত্যাচার ও নির্মমতার বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ ছিল। যে-সব শহরে জনতা বিদ্রোহী হয়েছিল ব্রিটিশ সৈনারা যে সে-সব জায়গায় গিয়ে পুরুষ, মহিলা ও পথচারীদের উপর নৃশংস অত্যাচার করত তার উল্লেখ এই অভিযোগে পাওয়া যায়। মাদ্রাজ শহরে অত্যাচারের এমন-একটি পদ্ধতি সরকার চালু করেন যা পরে সমস্ত দেশে চালু হয় :

> জনসাধারণকে বেআইনী সমাবেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করার জন্য পুলিশ নতুন পথ বেছে নিল। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সত্যাগ্রহী একত্র করে লরীতে বোঝাই করে তাঁদের শহর থেকে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে তারা নামিয়ে দিত। অর্থ ছাড়া তাঁরা কিভাবে ফিরে আসেন পুলিশ তাই দেখত।

কর্ণাটক জেলার আঙ্কোলা ও সিদ্দাপুর তালুকে দু'হাজার লোকের ৩৩০টি পরিবারের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, ১৬৬টি বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হ'ল। যাদের এই শাস্তি দেওয়া হল তারা সাধারণত গরিব লোক। যাঁরা এই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নীলামে কিনেছিলেন, ৩৭ জন মহিলা সত্যাগ্রহী সিদ্দাপুরে তাঁদের বাড়ির সামনে অনশন করলেন। এই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি কেনারও যে লোক ছিল তা দেখে মনে হয় গান্ধীজির নীতি সারা দেশের লোকে গ্রহণ করে নি।

বাংলাদেশে গোলগুলি বর্ষণ ও লাঠি চালনা প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে ক্লাসের নির্দোষ ছাত্রদের নির্মমভাবে প্রহার করে। গুজরাটে কৃষকেরা সীমান্ত অতিক্রম করে বরোদা রাজ্যের এলাকায় চলে আসতে লাগলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতবন্ধু একজন ইংরেজ লেখেন :

> কিছু কৃষক তাঁদের পাকা ফসলে (যেগুলি সরানো সম্ভব নয়) আগুন লাগিয়ে দিলেন। আমি ওঁদের একটা অস্থায়ী বাসস্থান দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম তাঁরা মাদুর দিয়ে ঘরের দেওয়াল এবং তালপাতা দিয়ে ছাদ করেছেন। এঁদের একটি বড়ো দলকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা তাঁদের স্থায়ী বাসভূমি ছেড়ে কেন চলে এসেছেন? মহিলাদের কাছ থেকে সবচেয়ে সোজা উত্তর : 'কারণ গান্ধীজি এখন জেলে।' পুরুষদের মধ্যে আর্থিক অভিযোগ সম্পর্কে চেতনা তবুও ছিল, অনেকে বললেন : চাষ করে আর-কিছু হয় না এবং করের বোঝাও দুর্বিষহ। দু-একজন বললেন : স্বরাজ অর্জনের জন্য।

ব্রেলস্‌ফোর্ড বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যে যাঁরা ফিরে যেতে চেয়েছিলেন সুরাটের

পুলিশ কেমন করে তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় গুর্খা সৈন্য ও স্থানীয় পুলিশ ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল। মহিলাদের সম্মানে হাত দিতেও তারা ছাড়ে নি। সরল কৃষকেরা প্রফুল্লচিত্তে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করল কিন্তু তবুও সরকারকে রাজস্ব দিল না।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সাইমন কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। নভেম্বরে ইংরাজ সরকার লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকের সভাপতি ছিলেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। ব্রিটিশ দাবি করেন এ বৈঠকে সব দলই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস এই বৈঠক বয়কট করেন। এই বৈঠকের অন্যান্য ভারতীয় সদস্যেরা এবং দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে একমত হলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি সমেত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলা যেতে পারে এবং তা পার্লামেণ্ট দ্বারা শাসিত হতে পারে। ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে কিন্তু তার উপরে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার দায়িত্ব হবে সমবেত। এ ব্যবস্থা বৈঠকের প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল।

অল্পদিন পরে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির যে সদস্যরা জেলে ছিলেন, তাঁরা মুক্তি পেলেন। গোল টেবিল বৈঠকের সদস্যরা ভারতে ফিরে এলে তেজ বাহাদুর সপ্রু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজি যাতে লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং কোনো রফায় আসতে পারেন সেজন্য তিনি গান্ধীজিকে রাজী করান।

ইতিমধ্যে ডিসেম্বরে মুসলিম লীগ এলাহাবাদ অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে আইন ভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। এর ফলে লর্ড আরউইনের পক্ষে দাবি করা সহজ হ'ল যে কংগ্রেসের বক্তব্য সত্ত্বেও গান্ধীজি আদৌ সারা দেশের প্রতিনিধি নন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

দিল্লিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে ভাইসরয়ের আলাপ-আলোচনা চলে। কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাব এবং ২৬ জানুয়ারির শপথ এই আলোচনায় অগ্রাহ্য করা হয়। নেহরু ও অন্যান্য বামপন্থী নেতার কাছে এটা খুব মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। গান্ধীজি মেনে নিলেন যে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কংগ্রেস আবার আলোচনা শুরু করবে। আর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে যদি সরকার আশ্বাস দেন যে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ বেলা আড়াইটায় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসল গান্ধীজি-আরউইন আলোচনার

ফলাফল বিবেচনা করার জন্য। সমিতি একমত হতে পারল না। অনেকে এ আলোচনাকে জয়লাভ বলে স্বাগত জানালেন, অনেকে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। জওহরলাল নেহরুর কাছে গান্ধীজি গোপনে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করে বোঝান। এ সম্পর্কে নেহরু পরে লেখেন :

> চুক্তির দু'নম্বর ধারার ব্যাখ্যা (যার দ্বারা সরকারের রূপ কী হবে সে সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়) আমার কাছে গায়ের জোরে তর্কের মতো মনে হয়েছে এবং আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। কিন্তু গান্ধীজির কথাবার্তায় আমি কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছিলাম।...দু-একদিন আমি গুমরে মরছিলাম, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ঐ চুক্তিকে তখন বাধা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না।...

বস্তুত ৫ মার্চ তারিখেই দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই হল। এই চুক্তিই পরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনায় গান্ধীজি অন্যান্য অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিশেষ আইনের বলে যে-সব রাজনৈতিক কর্মীরা 'হিংসাত্মক কার্যকলাপে'র অভিযোগে বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের মুক্তির প্রশ্নও এর মধ্যে ছিল। এই-সব আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে গান্ধীজি অনেক যুক্তি দেখান। যাঁদের জমি জায়গা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও গান্ধীজি করেন। লবণে সরকারের একচেটিয়া অধিকার বন্ধ করতেও গান্ধীজি চেয়েছিলেন। গান্ধীজির এই-সব যুক্তিতর্কে আরউইন অবিচল রইলেন। শুধু কিছু জায়গায় জমির খাজনা মকুব করাতে রাজী হলেন। কিন্তু ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুদণ্ডাদেশ মকুব করার যে অনুরোধ গান্ধীজি করেছিলেন তাতে আরউইন শুধু অসম্মতিই জ্ঞাপন করলেন না, ঐ ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনা করাতেও রাজী হলেন না। ২৩ মার্চ ফাঁসির মঞ্চে তাঁদের মৃত্যু হ'ল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকারের দমন নীতিতে কোনো শিথিলতা দেখা গেল না। যে-সব সুযোগ গান্ধীজি চেয়েছিলেন তা তিনি পেলেন না।

করাচী কংগ্রেস

লাহোরের পরে করাচীতে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন বসল ২৯ মার্চ, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির ছয় দিন পরে। কংগ্রেসের নিজস্ব ঐতিহাসিক পট্টভী সীতারামাইয়ার কথায় : 'সে মুহূর্তে ভগৎ সিংয়ের নাম গান্ধীজির নামের মতোই সারা ভারতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। গান্ধীজি যখন করাচীতে পৌঁছলেন তাঁর বিরোধিতা করে মিছিল বেরিয়েছিল। কংগ্রেসে গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব রাখা হয় যাতে সন্ত্রাসবাদীদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার প্রশংসা করা হয়। কংগ্রেসের অহিংসবাদীদের কাছে এ প্রস্তাব মনঃপুত হয় নি, গান্ধীজি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন একটি সংশোধন-এর মধ্যে যোগ করার পরে। সংশোধনের পরে প্রস্তাব হল এইরকম :

'যদিও কংগ্রেসের নীতি সমস্ত প্রকারের হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং এ-সব সমর্থন না করা, তবুও সে দেশপ্রেমীদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ প্রশংসচিত্তে স্মরণ করে।'

কংগ্রেসের যুবগোষ্ঠী এই সংশোধনের বিরোধীতা করেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে। খুব অল্প ভোটের জন্য তাঁদের বিরোধিতা সফল হয় নি।

সাধারণভাবে, করাচী কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব মাদ্রাজ ও কলকাতা অধিবেশনের আপসমূলক মনোভাবেরই অনুগামী। এক দিকে এই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হ'ল, এবং অন্য দিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তি, যার দ্বারা সংগ্রামের পুনর্বিবেচনার পথ খোলা হল, স্বীকার করে নিল। স্বাভাবিকভাবে, ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে যে উৎসাহের জোয়ার এসেছিল তাতে ভাটা পড়ল। এ অবস্থায় স্বাধীনতার সংগ্রামে জনসাধারণের সহযোগিতার সম্ভাবনা খুব একটা রইল না। পরবর্তী পথ ঠিক করার দায়িত্বও নেতাদের উপরই ন্যস্ত হল।

এক দিক থেকে অবশ্য করাচী কংগ্রেস ১৯৩০ সালের জানুয়ারির পরবর্তী পর্যায়ের সূচনা করে। এতে মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতির একটি প্রস্তাব গৃহীত এবং স্থির হয় যে তার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী গঠিত হবে। এর আগে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। এই প্রস্তাবের প্রধান বিষয়গুলি এইরকম :

১. জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রক্ষার আশ্বাস।
২. জাতিগত ও ধর্মগত অক্ষমতা দূর করা।
৩. প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতিসাধন ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন।
৪. কর হ্রাস।
৫. অনুন্নত অঞ্চলে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত বেগার বা বাধ্যতামূলক বৃত্তিহীন শ্রম রদ করা।
৬. লবণের কর উচ্ছেদ, এবং
৭. শ্রমিকের বিশেষ অধিকার (যেমন কাজের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ন্যূনতম বেতন, ছুটির ব্যবস্থা, কাজের সুব্যবস্থা) রক্ষা করা।

কৃষি-কর্মসূচী প্রণয়নের কাজেও কংগ্রেস হাত দেন। করাচী কংগ্রেস অবশ্য আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাত থেকে তাঁদের বড়ো বড়ো জমিদারি কেড়ে নেওয়ার দাবি তুলতে পারেন নি। তবু, বিভিন্ন কমূসূচী প্রণয়নের এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে ১৯৩০-এর রাজনীতিতে বামপন্থী বিপ্লবীদের পরাজয়ের ইঙ্গিত দেখা গেলেও নেতাদের অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরম গণতান্ত্রিক নীতি মেনে নিতে হয়েছিল। আগের চার বছরের গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছাড়া তাঁদের উপায়ও ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী বছরগুলিতেও জাতীয় নেতাদের এই গণতন্ত্রের নীতিকেই

অনুসরণ করতে হয়। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে করাচী কংগ্রেসে গান্ধীজির নীতি জয়লাভ করে ঠিকই (এবং এ জয়লাভের কারণ অনেকটাই ছিল তাঁর প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষমতা), কিন্তু, একই সঙ্গে, কংগ্রেসী কর্মসূচীতে এখন থেকে যে চরম, সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রাধান্য দেখা যায় তারও শুরু করাচী কংগ্রেসেই।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন

কংগ্রেস অধিবেশনের সময়েই অখিল ভারতীয় যুব লীগ এবং ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস পার্টি (Workers and Peasants Party) করাচীতে মিলিত হন। কৃষক ও শ্রমিক সম্পর্কে ওয়ার্কার্স ও পেজেণ্টস পার্টি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার রক্ষা, আর্থিক নীতির প্রস্তাব থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। তাঁরা পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম যাতে অব্যাহত থাকে তার ডাক দিলেন। এই প্রস্তাবে গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে এবং দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের সিদ্ধান্তকে নিন্দা করা হল।

এদিকে আবার সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। ইতিমধ্যে ২৪ এবং ২৫ মার্চ কানপুরে এক সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং তার ফলে দুই সম্প্রদায়েরই কিছু লোক নিহত হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমেই বাড়তে লাগল। জিন্না ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম গোষ্ঠী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করছেন ঘোষণা করলেন।

১৯৩১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের মতামত কী হবে তাই নিয়ে তর্কবিতর্ক চলল। একটি বড়ো প্রতিনিধি দল পাঠাতে সরকার রাজী ছিলেন, কিন্তু তার বদলে একমাত্র গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হলেন। যদি ডা: আনসারীর মতো জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা গান্ধীজির সঙ্গে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে লণ্ডনে যেতেন, তা হলে হয়তো ইংলণ্ডের জনমত বিশ্বাস করতে পারত যে কংগ্রেস মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও মুসলিম জনতার প্রতিনিধি। কংগ্রেস কিন্তু আশা করলেন যে নিজের অধিকারেই আনসারী লণ্ডনে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হবেন। সুভাষচন্দ্রের বর্ণনা অনুযায়ী গান্ধীজিও বলতে শুরু করলেন : 'নতুন সংবিধানে যদি মুসলমানেরা প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি প্রশ্নে সংঘবদ্ধভাবে দাবি করে তিনি তা মেনে নেবেন।' এ কথায় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের শক্তি আরও বাড়ল। পরে দুটি কারণে গান্ধীজি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে তিনি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী স্বীকার করবেন না। এক, সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তা দুই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রদত্ত এক বিবৃতি :

> যদি কোনো কারণবশত গান্ধীজি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য একই নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিক্রিয়াবাদী মুসলমানদের দাবি অনুযায়ী পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁরা (জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা) প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের,

এমন-কি, গান্ধীজিরও বিরোধিতা করবেন, কারণ তাঁরা নিশ্চিন্তভাবেই জানেন যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী শুধু যে সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তা নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও ক্ষতিকর।

এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইনের উত্তরসূরী হিসাবে লর্ড উইলিংডন ভাইসরয় হয়ে এলেন। নতুন ভাইসরয়ের দৃষ্টিভঙ্গী উদার তো নয়ই, বরং বেশি সংকীর্ণ। প্রাদেশিক সরকার রাজনৈতিক অপরাধীদের অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করে গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করছেন এই সম্পর্কে গান্ধীজির অভিযোগ তিনি স্বীকার করলেন না এবং এই ধরনের চুক্তিভঙ্গের মীমাংসার জন্য গান্ধীজির সালিশী বোর্ডের প্রস্তাবও তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তাঁর কর্মচারীরা পরামর্শ দিলেন যে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ হবে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যে ইংরাজ সরকারের সমানই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও উত্তর প্রদেশে খোদা-ই খিদমৎগারদের ওপর সাংঘাতিকভাবে পীড়ন চলছিল, কর বন্ধ করার জন্য যাঁরা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাঁরাও এ উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। সরকারকে এ সম্পর্কে মীমাংসায় আসতে বাধ্য করার জন্য অগাস্ট মাসে গান্ধীজি গোল টেবিল বৈঠকের জন্য লণ্ডনে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু উইলিংডনও তাঁর সিদ্ধান্তে দৃঢ়। তিনি ডা: আনসারীর প্রতিনিধিত্বও স্বীকার করলেন না। তাঁর বক্তব্য হ'ল ডা: আনসারী যেহেতু কংগ্রেস সদস্য, স্বতন্ত্র প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর নির্বাচন অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আসল কথা হ'ল এই ইংরাজ সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোকেদের দাবি সমর্থন করে নিজেদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতি সফল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই একদিকে যেমন আনসারীর মতো জাতীয়তবাদী নেতাদের নির্বাচন অস্বীকার করা হ'ল, হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিনিধিত্ব খুব বেশি করে মেনে নেওয়া হল। এই প্রতিনিধিত্ব সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাবের তুলনায় বেশিই ছিল। সিমলায় বল্লভভাই প্যাটেল, প্রভাশংকর পাটকানি ও জওহরলাল নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করার পর গান্ধীজি হাল ছেড়ে দিলেন, সরকারের কাছ থেকে শুধু এটুকু প্রতিশ্রুতি পেলেন যে সুরাটের গ্রামে জোর করে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে সরকারী অনুসন্ধান করা হবে, কিন্তু 'কংগ্রেসের উত্থাপিত অন্য কোনো অভিযোগ সম্পর্কে' অনুসন্ধান হবে না। যদি অনুসন্ধান না করা হয় তা হলে কংগ্রেস স্বার্থরক্ষার্থে অন্য পন্থা গ্রহণ করতে পারবে এমন একটি ইঙ্গিত অবশ্য গান্ধীজি দিয়েছিলেন তবে ১৯৩১ সালের ১৫ অগাস্টে তিনি লণ্ডনের পথে রওনা হওয়ার ফলে ইংরাজ সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর নমনীয়তাই ধরে নেওয়া হ'ল।

এই ঘটনাগুলি থেকেই আভাস পাওয়া যায় যে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস বিফল হবে। ঐ বৈঠক চলে ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার একদিন আগে গান্ধীজি লণ্ডনে পৌঁছলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিরা তখন এসে গেছেন। ইংরাজ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে গান্ধীজি সাদর অভ্যর্থনা পেলেন। তিনি লণ্ডনের East End এলাকায় ছিলেন। ল্যাঙ্কাশায়ার মিল এলাকা তিনি এই সময় পরিদর্শন করেন। যদিও সত্যাগ্রহের ফলে ঐ এলাকার কাপড়ের কলগুলিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবু শ্রমিকেরা তাঁদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন ভারতের এই সংগ্রামে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতাদের দূরে রাখার একটি পথ বার করে ফেলেছেন। তাঁরা বারবার দাবি জানাতে লাগলেন যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রশ্ন সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নের আগে আলোচিত হোক। গান্ধীজি সাংবিধানিক সংস্কারের প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং চেয়েছিলেন এটাই আগে আলোচিত হোক। এই প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হল সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিটিতে। এই কমিটিতে সভাপতিত্ব করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই কমিটির সব সদস্যদের আহ্বান জানালেন তাঁরা সবাই যেন লিখিতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এবং এ সম্পর্কে তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তা যেন সকলেই গ্রহণ করে নেন। সকলে একমত হলেন না। হতে পারতেনও না। ইংরাজ সরকার জানতেন যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটি করবেন। একজনের প্রস্তাব আর-একজন গ্রাহ্য করবেন না। গান্ধীজি কমিটির কাছে খুব যুক্তিসংগত একটি আবেদন আনলেন। তিনি বললেন, 'এ প্রশ্নের মীমাংসা আসবে স্বরাজের সংবিধান থেকে, তাই মীমাংসাকে ভিত্তি করে সংবিধান রচিত হতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে অনৈক্য বিদেশী শাসন তার জন্ম না দিলেও তাকে পুষ্ট করে তুলেছে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কাঠিন্য স্বাধীনতার সূর্যের উত্তাপে গলে জল হয়ে যাবে।'

কিন্তু এতেও বরফ গলল না। সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা যেমন আগা খান, প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে দাঁড়ালেন এবং নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের মুঠির মধ্যে আসার জন্য হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও সমানভাবে ব্যগ্র ছিলেন। তাঁরা সকলেই বিভিন্নভাবে গান্ধীজির একতাবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শেষে, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাব আনলেন যে ১৯৩০ সালের সমঝোতা অনুযায়ী আলোচনা এগোবে। তিনি উইলিংডনের নীতিই অনুসরণ করলেন এবং প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মুখ্য ধারাগুলির আভাস দিলেন। প্রস্তাবিত আইনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনার ব্যবস্থা হল এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার কথা রইল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি যেমন রাজস্ব,

বৈদেশিক সম্পর্ক (যার মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত অন্তর্গত), প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার শুধু ভাইসরয় ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই থাকবে। গান্ধীজি হতাশ হয়ে ভারতে ফিরে এলেন।

দমননীতির পুনরাবৃত্তি

১৯৩০-এ আরউইন যে দমননীতি অবলম্বন করেছিলেন তার চেয়েও নির্মমভাবে জাতীয় আন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন উইলিংডন সরকার। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীরা কৃষকদের আহ্বান জানালেন খাজনা দেওয়া স্থগিত রাখার জন্য, অন্তত যতদিন-না সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হয়। তাঁদের এবং তাঁদের নেতাদের পাইকারীভাবে ধরে বন্দী করা হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন নেহরু ও পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন। গান্ধীজির ভারত-প্রত্যাবর্তনের পাঁচ দিন আগে এঁদের বন্দী করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবদুল গফর খান, ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডা: খান সাহেব এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের বন্দী করা হ'ল। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম শহরে তিন দিন ধরে ইংরেজ নাগরিকরা গুণ্ডাদের সাহায্যে দেশ-সেবকদের বাড়িঘর লুট করলেন, পুলিশ তাঁদের কোনো বাধা দিল না। খড়গপুরের কাছে কুখ্যাত হিজলী জেলে বন্দীরা জেল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রহৃত হলেন পরে বন্দীদের উপর গুলি চালানোও হয়। এর ফলে দু'জন নিহত হন।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর এ-সব ঘটনার বিরুদ্ধে গান্ধীজি উইলিংডনের কাছে প্রতিবাদ জানান, কিন্তু উইলিংডন নির্বিচল রইলেন। তখনো কিন্তু কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের সঙ্গে 'সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত' অবশ্য, যদি ভাইসরয় অর্ডিনান্স তুলে নেন এবং কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বরাজের দাবির আন্দোলন চালাতে অনুমতি দেন। কংগ্রেসের এই মনোভাবের সঙ্গে লাহোর কংগ্রেসে ব্যক্ত মনোভাবের অনেক তফাত। তবুও কংগ্রেস আইনভঙ্গ আন্দোলন পুনরায় চালু করার হুমকি দেখালেন। কিন্তু সরকারকে বিচলিত করা গেল না। ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি গান্ধীজি, কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল সমেত কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে বন্দী করা হ'ল। এখন বন্দীদের উপর প্রহার এবং তাঁদের সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে এক করার চেষ্টা খুব ব্যাপকভাবে হতে লাগল। ১৯৩২ সালে সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সন্ত্রাসবাদীরা ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ নিতে শুরু করলেন। গান্ধীজি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন দলে দলে আইনভঙ্গ করা উচিত হবে না, বরং বিশেষ বিশেষ কাজের দ্বারা এককভাবে আইনভঙ্গ করা হবে। তাঁর যুক্তি হল অহিংস নীতিতে প্রত্যেকের স্থির হয়ে দাঁড়াবার সাহস থাকা দরকার। আসল কারণ সম্ভবত এই ছিল যে সরকারী প্ররোচনার ফলে একসঙ্গে আইনভঙ্গে যোগদান

করলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া আইনভঙ্গ আন্দোলনের অসফলতায় গান্ধীজি হতাশও হয়ে পড়ছিলেন। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন যখন ২৪ এপ্রিল দিল্লিতে নির্ধারিত হল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর সভাপতিত্বে, নেতৃস্থানীয় সদস্যরা তখন বন্দী। অন্যান্যরা চাঁদনী চকের ঘড়িঘরের কাছে সভা আহ্বান করলেন, আহমদাবাদের এক প্রতিনিধি শেঠ রণছোড়দাসের সভাপতিত্বে। তাঁরাও বন্দী হলেন তবে ১ মে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

সাম্প্রদায়িক রায়

গণ-অভ্যুত্থানের ধারা থেকে স্বতন্ত্র এক নতুন ধারা এই সময় লক্ষ্য করা যায়। হরিজন, তপশীলী জাতি এবং উপজাতিদের সমর্থন লাভের জন্য অনেকদিন ধরেই সচেষ্ট ছিলেন; তাঁদের নিয়ে ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসন' নীতির পাল্টা উত্তর তৈরি করার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। সরকারী 'বিভাজন ও শাসন' নীতি ১৯৩২ সালে চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বিঘোষিত রায়ের মধ্যে দিয়ে। এই রায় অনুযায়ী হিন্দু 'অস্পৃশ্য' এবং মুসলমানদের নির্বাচকমণ্ডলী পৃথক হবে স্থির হল। হিন্দু ও 'হরিজন'দের দুটো পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হবে। হিন্দু ও হরিজনদের আলাদা করার এই চেষ্টাকে গান্ধীজি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন। বহু হরিজন যেমন এম. সি. রাজা গান্ধীজিকে সমর্থন করলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন একই নির্বাচকমণ্ডলী হোক শুধু প্রতিনিধিদের মধ্যে কিছু আসন হরিজনদের জন্য থাক্। এর মধ্যে কিছু হরিজন ডা: আম্বেদকরের নেতৃত্বে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি জানালেন যাতে অস্পৃশ্যতা দূর না করে হরিজনদের হিন্দু বলা হয়। উইলিংডনের কাছে এই ছিল সুযোগ। তিনি এই সুযোগে সাম্প্রদায়িক রায় মেনে নেওয়ার জন্য গান্ধীজিকে পীড়াপীড়ি করতে লাগেলন। এর ফলে গান্ধীজি পুনার কাছে যারবেদা জেলে সেপ্টেম্বর মাসে আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন। এই সাম্প্রদায়িক রায় তিনি বিরোধিতা করলেন কিন্তু হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে হরিজনদের জন সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা রায়ে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের দাবি করলেন। আম্বেদকর এবার গান্ধীজির পক্ষ সমর্থন করলেন। পুনার এই চুক্তি সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক রায়ের সংশোধন হিসাবে গৃহীত হল।

যেমন অখিল ভারতীয় অস্পৃশ্যতা এবং অস্পৃশ্য সমাজ-সেবক লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। মধ্য ভারতে, দক্ষিণ বিহারে এবং উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রচার উপজাতি ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তে লাগল। কিছু কংগ্রেস সমর্থন যেমন প্রাক্তন ইংরাজ মিশনারী ভেরিয়ার এলউইন এবং শামরাও হিভালে একনিষ্ঠভাবে জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে লাগলেন সেই-সব উপজাতি ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যাদের জাতীয় চেতনা

এতদিন বিশেষ জাগ্রত হয় নি। এই-সব আন্দোলনের মধ্যে হরিজনদের জন্য সব মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩-এর ৮ জানুয়ারি উদ্‌যাপিত হল 'মন্দির প্রবেশের দিন' হিসেবে। ভারতের বহু তীর্থ-কেন্দ্রগুলিতে বহু জাতি ও ধর্মের লোকের আনাগোনার ফলে উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতিদের উন্নতি জাতীয় উন্নতিরই সমার্থক বলে গণ্য করা হতে লাগল এবং এর আবেদন সাধারণের কাছে বাড়িয়ে দিল।

১৯৩০-এর আন্দোলনের তুলনায় জনসাধারণের ওপর দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের (প্রকৃতপক্ষে একে ব্যক্তিগত আইন অমান্য বলা উচিত) প্রভাব সামান্যই। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেস-প্রভাব অক্ষুণ্ণই রইল। কর না দেওয়া ও খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন উত্তর প্রদেশে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বজায় থাকল।

১৯৩২-৩৩ সালেই সম্ভবত গোঁড়া সন্ত্রাসবাদের আগুন (যা অহিংস আইন ভঙ্গ আন্দোলনের চেয়ে পৃথক) শেষ বারের মতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই আগুন কঠোরভাবে দমন করে নিভিয়ে ফেলা হয়, বিশেষত বাংলায়। সন্ত্রাসমূলক বিভিন্ন ঘটনা ঘটে এই বছরে। বেশ-কিছু অপ্রিয় রাজকর্মচারী এ সময়ে নিহত হন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন ভারতীয়ও ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার নতুন গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন সভাপতিত্ব করছেন। ডায়াসেশনের মহিলা কলেজের এক মেধাবী ছাত্রী বীণা দাস তাঁকে গুলি করেন। গুলি লাগল বুকে পকেটে রাখা নোট বইতে, জ্যাকসন বেঁচে গেলেন। বীণা দাস যাবজ্জীবন কারাগারে নির্বাসিত হলেন। ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুক্তি পান নি।

১৯৩২ সালের জুন মাসে চট্টগ্রামের কাছে একটি গ্রাম সৈন্যরা ঘিরে ফেলেন। সূর্য সেন এবং আরো চারজন সন্ত্রাসবাদী সেখানে একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। সিঁড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলি এল। ক্যাপটেন ক্যামেরন নিহত হলেন। সেই গোলমালের মধ্যে সূর্য সেন দুজন মহিলা সহযোগী, প্রীতিলতা ওহদেদার এবং কল্পনা দত্তকে নিয়ে আত্মগোপন করেন। ১৯৩৩ সালের প্রথম দিকে সূর্য সেন অবশেষে গয়রালা গ্রামে ধরা পড়লেন। জনৈক গ্রামবাসী এক বিশাল গুর্খাবাহিনীর কাছে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। সৈন্যবাহিনী তাঁর সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করে, কিন্তু শেষে ঢাকায় ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। বাংলাদেশের জনসাধারণ ও নেতারা আজও তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করেন, তাঁকে জাতীয় বীরের সম্মান দেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। সন্ত্রাসবাদীদের অধিকাংশই ছিলেন শহরাঞ্চলের স্কুল ও কলেজের ছাত্র, কিন্তু শহরাঞ্চলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে কৃষকসমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে ধরনের চরম কৃষি-কর্মসূচী সংগঠিত হয়। সে রকম কোনো কর্মসূচীও তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি।

১৯৩৩ সালে স্বাধীনতা দিবস অভূতপূর্ব উৎসাহের মধ্যে উদ্‌যাপিত হল। বাংলায় হুগলী জেলার বদনগঞ্জে পুলিশ গুলি চালিয়ে কংগ্রেসের একটি শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফেব্রুয়ারিতে কস্তুরবা গান্ধী গুজরাটের চোরসাদে একটি মিছিল পরিচালনার সময় ধরা পড়লেন। তাঁর ছয় মাসের কারাদণ্ড হল। ১৯৩৩ সালের মার্চে কংগ্রেস অধিবেশন কলকাতায় হওয়ার কথা। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সে অধিবেশনের সভাপতি (তিনি হিন্দু মহাসভারও সভ্য ছিলেন)। কিন্তু অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগেই এক হাজার কংগ্রেস প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হলেন। পুলিশ সভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল। জনতা-বেষ্টিত হয়ে যে কয়েকজন প্রতিনিধি সভার মধ্যস্থলে ছিলেন তাঁরা অধিবেশন শুরু করে দিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে। পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আইন অমান্য ও বিদেশী পণ্য বর্জনের পদ্ধতিতে এ সভা পুনরায় আস্থা জ্ঞাপন করেন।

এই সময়ে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার জন (এঁদের মধ্যে কয়েক সহস্র মহিলা ও বেশ কিছু শিশু ছিলেন) গ্রেফতার হলেন। এর দ্বারা এই প্রতিভাত হয় যে আইন অমান্য আন্দোলনের জনপ্রিয়তা তখনো অব্যাহত। কিন্তু গান্ধীজি হরিজন সমস্যার উপরই বেশি জোর দিলেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিনি নিজের এবং তাঁর সহচরদের আত্মশুদ্ধির জন্য এবং হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য ২২ দিনের অনশন ব্রত ঘোষণা করলেন। সরকার তৎপর হয়ে তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। গান্ধীজি বিবৃতি দিলেন যে কিছুকালের জন্য কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে বন্ধ রাখা উচিত। এক বছর পরে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে এই আন্দোলন পরিত্যক্ত হয়।

ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকার ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন। এই বৈঠকে কংগ্রেস কোনো প্রতিনিধি পাঠান নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে এই বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে না। গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার ফলে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন আইন—ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ আইনে কতকগুলি নতুন সংস্কারের প্রস্তাব ছিল। এতে বলা হল যে কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল—বলা হল যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে একত্রিত করে। মনে হতে পরে যে ভারত একটিই দেশ, এবং ভারতীয়রা একই জাতি—এই নীতিকে ব্রিটিশ সরকার মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা জাতীয় নেতাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মত ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে

দেশীয় রাজাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই দ্বিকক্ষযুক্ত কেন্দ্রীয় আইন সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অযৌক্তিক প্রাধান্য দেওয়া হল। বলা হল, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন না, রাজারাই তাঁদের মনোনয়ন করবেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ভোটাধিকার অত্যন্ত সীমিত রইল। ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৪ জন মাত্র ভোটাধিকার পেলেন। এত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও আইন সভাকে যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হল তাও সীমিত। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষমতা রইল না, আর যে-সমস্ত ক্ষেত্রে আইন সভাকে ক্ষমতা দেওয়া হল সেখানেও গভর্নর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা বহাল রাখা হ'ল। তা ছাড়া আগের মতোই এ ব্যবস্থা রইল যে গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নররা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং সরাসরি সে সরকারের কাছেই নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন।

প্রাদেশিক সরকারকে যতটুকু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হল, গভর্নরকে বিশেষ অধিকার দিয়ে সে অধিকার বস্তুত নাকচ করে দেওয়া হল। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যে-কোনো আইন প্রস্তাব যে গর্ভনর নাকচ করে দিতে পারবেন তাই নয়, আইন প্রণয়ন করা ও প্রবর্তন করার অধিকারও তাঁকে দেওয়া হল। রাজ্যের কার্যনির্বাহক সংস্থা (Civil Service) এবং পুলিশের উপরও তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা রইল।

প্রস্তাবিত আইনে খুব কম লোকেই খুশি হয়েছিলেন। কংগ্রেসের কাছে এ আইন 'সম্পূর্ণ হতাশাজনক'। অন্যান্য অনেকে এই আইনকে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিলেন। বোঝা গেল, ভারতের জনসাধারণের ওপর যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ ভোগ করেন তা সত্যি সত্যি ছেড়ে দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। শুধু সরকারের গঠন একটু পরিবর্তন করা হল। মন্ত্রীসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হল ঠিকই, কিন্তু বিদেশী শাসন অব্যাহতই রইল।

আইনের মধ্যে প্রাদেশিক শাসন-সম্পর্কিত অংশটুকু শীঘ্রই চালু করার কথা হল, এবং বলা হল কেন্দ্রীয় শাসন-সম্পর্কিত অংশ পরে প্রবর্তিত হবে। কংগ্রেস সমগ্র আইনটির বিরুদ্ধে ছিলেন তবুও তাঁরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য এর দ্বারা তাঁরা আইনটি কার্যকরী করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে চান নি, বরং দেখাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের পেছনে কতটা গণসমর্থন আছে। এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছিল। বেশির ভাগ প্রদেশ কংগ্রেস বিপুল ভোট নির্বাচনে জয়লাভ করেন। সন্দেহের কোনো অবকাশই রইল না যে জনতার বিরাট অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। অনেকে যুক্তি দেখালেন যে নির্বাচনে জয়লাভের পর মন্ত্রীসভায় যোগ না দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। নেহরু ও অন্যান্য বামপন্থী কংগ্রেস কর্মীরা বিধানসভায় যোগ না দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বললেন এর দ্বারা মুক্তি সংগ্রাম ব্যাহত হবে। কিন্তু বেশির ভাগ সদস্য মন্ত্রিসভা গঠনের সপক্ষে রায় দিলেন। ১৯৩৭ সালের

জুলাই মাসে এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শুধু বাংলা ও পাঞ্জাবেই অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে এবং কংগ্রেসের মধ্যে পুরনোপন্থী সদস্যের অধিক্যের ফলে শাসন-ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনার চেষ্টা কংগ্রেস সরকার করেন নি। কোনো মৌলিক কিংবা আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব কংগ্রেস আনেন নি। এর আর একটা কারণও ছিল। কংগ্রেসে শ্রমিক এবং কৃষক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর লোক। যেটুকু ক্ষমতা ওঁদের হাতে এল তা দিয়ে জনসাধারণের উন্নত করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। শাসন প্রণালীতে কিছু নতুন প্রথা সূচনা হল। তাঁদের সততা ও সেবার মানও প্রশংসনীয়। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের মান উন্নত করার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেন। গরিব কৃষকদের ঋণ-মুক্তির জন্য ও জমির বিলিব্যবস্থার জন্য নতুন আইন পাস করা হল। তবে এই ধরনের আইন জমিদার ও ভূস্বামীদের সম্মতি নিয়ে প্রবর্তন করা হ'ল বলে অনেকটা আপসের চেষ্টা এই আইনের মধ্যে দেখা যায়। শ্রমিক সংগঠনগুলি বেশি পারিশ্রমিকের জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে উন্নত অবস্থা আনার জন্য মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে উৎসাহী হলেন। কয়েকটি জায়গায় অবশ্য তাঁদের মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কিছুটা শিথিল হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পেল। তবে পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগ সম্পর্কে জনগণের আতঙ্ক ও বিরূপতা অব্যাহতই রইল।

এ যুগের সবচেয়ে লাভের দিক মানসিক। জনসাধারণ এক ভিন্ন অনুভূতির আস্বাদ পেলেন। এতদিন যাদের জেলের কয়েদী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের শাসনকার্যের ভার তুলে নিতে দেখে তারা কিছুটা বিজয়গর্ব অনুভব করলেন। চারি দিকের আশা ও আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে থেকে মুক্তির প্রথম বার্তা তাদের কাছে এসে পৌঁছল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তির আস্বাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ভারতবর্ষে অনেক নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনার অভ্যুদয় ঘটে। জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছিলেন, তাঁদের সকলেই কংগ্রেসের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি মেনে নিতে পারেন নি। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে তাঁদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে যে পার্থক্য তা শুধু কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতা দলগুলির মধ্যেই বিভক্ত ছিল না; কংগ্রেসের মধ্যেই দুটি রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমান্তরালভাবে বেড়ে উঠতে থাকে এবং যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে।

এক অর্থে ধরলে ও যুগের নতুন ভাবনার প্রথম ফসল স্বাভাবিকভাবেই নেতি-ব্যঞ্জক, কারণ বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা যে শেষ হয়ে গেছে এই নতুন চিন্তার আলোয় তা ধরা পড়ল। জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ এমন কোনো চেতনার সঞ্চার করে নি যার বিদ্যুৎস্পর্শে তারা ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে এক জাতীয় অভ্যুত্থানে সংঘবদ্ধ হতে পারে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই হয় ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন, নয় রুদ্ধ হলেন কারাকক্ষের নির্জনে। অন্যেরা মিশে গেলেন কম্যুনিস্ট বা অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের রেশ এভাবে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

অন্য দিক দিয়ে বিচার করলে তিনটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ধারা চোখে পড়ে। এক, সমাজবাদী চিন্তা এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে প্রসারলাভ করেছিল। দুই, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধারা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশলাভ করছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারার সঙ্গে এসে মিলছিল। তিন, কৃষক আন্দোলনও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিল বিপর্যয়ী অর্থনৈতিক মন্দা। অনিবার্য গতিতে এ মন্দা ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য ধনতন্ত্রী দেশগুলিতেও। এর ফলে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে গেল। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতিও ধনতন্ত্রী দেশগুলির গভীর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ধনতন্ত্রী দেশগুলির তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার

অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্‌বেগ, এবং সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। সে দেশে কোনোরকম মন্দা দেখা দেয় নি, কর্মসংস্থানেরও কোনো অভাব ঘটে নি; বরং দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার পর উৎপাদনের পরিমাণ চারগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই দু ধরনের অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে স্বাভাবিকভাবেই কম্যুনিস্ট আদর্শ, সমাজতন্ত্র, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বাইরের জগতে এই-সব পরিবর্তনের ধারা ভারতবর্ষেও প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি করল। ফলে সমাজবাদী ভাবধারা শুধু নেতাদের নয়, সাধারণ মানুষকেও নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করল। এই নতুন ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন তরুণ সম্প্রদায় এবং শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী।

কংগ্রেসের মধ্যেও এই বামপন্থী প্রবণতার ফলে ১৯৩৬-এ পর পর দুবছরের জন্য জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। নেহরুর পর কংগ্রেস সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিও তাঁর নতুন মৌলিক চিন্তার জন্য সুবিখ্যাত। ১৯৩৮-এ তিনি প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯-এ স্বয়ং গান্ধীজি ও তাঁর অন্য অনেক অনুগামীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র সভাপতি রূপে পুনর্নির্বাচিত হন।

১৯৩৬-এ কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে নেহরু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে সমাজতন্ত্রই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কৃষকশ্রেণী শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কংগ্রেস পার্টির সম্পর্ক যাতে আরো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার ওপর তিনি জোর দেন। জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে হলে এর চেয়ে আর যে কোনো ভালো পথ নেই, এ কথাও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন :

> আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর, এবং ভারতের, সকল সমস্যার সমাধান সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিহিত। 'সমাজতন্ত্র' কথাটিকে আমি কোনো অস্পষ্ট মানবিকতার সঙ্গে সমর্থক বলে ধরছি না; কথাটিকে তার বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক অর্থে ব্যবহার করছি।...এ সমাজতন্ত্রের অর্থ আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় বিপুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন; এ সমাজতন্ত্র ভূমি ও শিল্পের উপর কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটাবে, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার, সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী বুনিয়াদকে উচ্ছেদ করবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিঁকে থাকবে শুধু সীমিত আকারে; বর্তমান মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়ে গিয়ে তার বদলে দেখা দেবে পারস্পরিক সহযোগিতা-নির্ভর উদ্যোগের উচ্চতর আদর্শ। আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের অভ্যাস, আমাদের আকাঙক্ষা—শেষ পর্যন্ত সব-কিছুরই পরিবর্তন ঘটবে। সংক্ষেপে এই সমাজব্যবস্থাকে আশ্রয় করে যে নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটবে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে তা হবে সম্পূর্ণ পৃথক।

অকংগ্রেসী নেতৃত্বের মধ্যেও সমাজবাদের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল এই যুগে।

একদিকে যেমন কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল তেমনি জন্ম নিল এক নতুন পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম যুগের নেতা পি. সি. যোশী। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে, আচার্য নরেন্দ্র দেব এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। নিজেদের সংগঠন এবং পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন কংগ্রেস যাতে তাঁদের 'সমাজতান্ত্রিক নীতি' গ্রহণ করেন। এই যুগের আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে কেরালা, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর কংগ্রেসী সমাজবাদীরা মার্কসবাদের দিকে যতটা ঝুঁকেছিলেন, উত্তর ভারতের কংগ্রেসীরা ততটা ঝোঁকেন নি।

ক্রমে সরকারী দমননীতির আক্রোশ গিয়ে পড়ল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর। দমননীতির ফলে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল, ১৯৩৪-এর শেষের দিকে সরকারী নিষেধাজ্ঞার বলি হল রেড ফ্ল্যাগ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। মীরাট মামলা থেকে যে-সব কম্যুনিস্ট কর্মী ছাড়া পেয়েছিলেন, নতুন করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভ্য হয়ে কাজ করা ছাড়া তাঁদের আর গত্যন্তর রইল না। কিন্তু নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কংগ্রেস পার্টি এবং এম. এন. রায়ের সমর্থকদেরই ছিল প্রাধান্য। সুতরাং এ সংগঠনের মধ্যে কম্যুনিস্টরা সংখ্যালঘু হয়ে রইলেন। যোশী, চমনলাল এবং মৃণালকান্তি বসু পরিচালিত দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনটি ইতিমধ্যে ভি. ভি. গিরির অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্‌স ফেডারেশনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। গিরি এবং মৃণালকান্তি বসু দুজনেই ছিলেন কংগ্রেসী সংগঠনের জাতীয়তাবাদী প্রবণতার সমর্থক। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এমন অনেক বামপন্থীই ছিলেন যাঁরা কম্যুনিস্ট বা এম. এন. রায়-পন্থীদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব মেনে নিতে পারেন নি; ফলে ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে যে যুক্ত সংগঠনটি স্থাপিত হ'ল, তাঁরা তাকেই সমর্থন করতে শুরু করলেন।

১৯৩৪-এর গ্রীষ্মে মজুরি হ্রাসের প্রতিবাদে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকেরা বোম্বাই থেকে একটি ধর্মঘট শুরু করেন। রেড ফ্ল্যাগ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা তখনো জারি হয় নি। ব্যাপকভাবে না হলেও রেড ফ্ল্যাগ ফেডারেশন ও অন্য দুটি ফেডারেশন এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন। ধর্মঘটে যোগ দেন প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার শ্রমিক। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশী অত্যাচার ও কিছু কিছু দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতার অত্যুৎসাহী মনোভাব ধর্মঘটের সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তখন শুধু বোম্বাইতেই কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০। তাদের অনেককে কাজের সুযোগ দিয়েও ধর্মঘট ব্যর্থ করার চেষ্টা করা হয়।

এ যুগের তৃতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে গান্ধীবাদ, কংগ্রেসী সমাজবাদ এবং কম্যুনিজ্‌ম এ সময় ছোটো ছোটো কিষাণ আন্দোলনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু

করে। ১৯২০-র দশকে কিছু কিছু শ্রমিক ও কৃষক পার্টি সংগঠিত হয়; ১৯২৯-৩১-এর অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও কৃষকদের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু প্রতিবাদ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু উইলিংডনের দমননীতির ফলে এই-সব আন্দোলনের ধারা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। কৃষক নেতাদের উদ্যোগে কিছু কিছু জেলায় কৃষক আন্দোলন এই সময় আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তর প্রদেশে বামপন্থী কৃষি-কর্মসূচী আগেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; বিহারে সহজানন্দ সরস্বতী যে শক্তিশালী স্থানীয় কিষাণসভা সংগঠন করলেন তাও গড়ে উঠল এই কর্মসূচীকে আশ্রয় ক'রে। আর-একজন উল্লেখযোগ্য কৃষকনেতা হলেন করিয়ানন্দ শর্মা; পরবর্তীকালে ইনি বিহারের অনুন্নত জেলাগুলিতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খোদা-ই-খিদমৎগারদের পরিচালনায় এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে বামপন্থীদের উদ্যোগে কৃষকদের দাবি আবার সোচ্চার হয়ে উঠল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের কিছু জেলা ছিল বিশাল দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের অন্তর্ভুক্ত। হায়দরাবাদের দরিদ্র, শোষিত কৃষকদের পক্ষ নিলেন স্বামী রামানন্দ তীর্থ। মহারাষ্ট্রের একটি জেলায় গান্ধীজির আদর্শে পরিচালিত কোনো বিদ্যালয়ে স্বামী রামানন্দ জীবন শুরু করেন। পরে তিনি বোম্বাই শহরের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেন এবং সংস্কারপন্থীদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। তাঁর উদ্যোগে ঔরঙ্গবাদ জেলায় গান্ধীজির আদর্শে পরিচালিত একটি গ্রামকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে কৃষিজীবীদের আশ্রয় করে যে হায়দরাবাদ রাজ্য জন-কংগ্রেস (Hyderabad State Peoples' Congress) গড়ে ওঠে, তা রামানন্দ তীর্থেরই প্রচেষ্টার ফল। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতালাভের পর এই জনকংগ্রেসই সংগ্রাম শুরু করেন যাতে হায়দরাবাদ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দক্ষিণ ভারতের জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের দাবি জানাতে শুরু করেন এই সময়। উত্তর তামিলনাড়ুতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বন্নিয়াররা, দক্ষিণ তামিনাড়ুতে থেবর ও নাদারদের প্রাধান্য। এঁরা সকলেই এবং কেরালার ইরাবা সম্প্রদায় নাগরিক ও গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বেশি ক্ষমতা দাবি করতে শুরু করলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মানভূম ও পুরুলিয়া জেলায় এবং বিহারের রাঁচি ও সিংভূম জেলায় অনুন্নত কৃষিজীবীদের মধ্যে গান্ধীজির জাতীয়তা ও অহিংসার আদর্শ প্রচারের ভার নিলেন গান্ধীবাদী কর্মীরা। অনগ্রসর, সুযোগবঞ্চিত আদিবাসী মানুষের মধ্যেও এই আদর্শ কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়ল। ছোটোনাগপুরের তানা ভগৎ আদিবাসী আন্দোলন থেকে পরবর্তী কালে এ অঞ্চলে গান্ধী মহারাজের পূজার উদ্ভব হয়।

আসাম-সংলগ্ন নাগাভূমিতেও এক নাগা যাজকের পরিচালনায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটল। গুইদালো বলে এক নাগা তরুণী দৈবশক্তির অধিকারিণী এই বিশ্বাসে তাঁকে নাগাদের রানী বলে ঘোষণা করা হ'ল। রানী গুইদালো নিজেকে জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক বলে দাবি করতে লাগলেন। ১৯৩০ দশকের শেষের

দিকে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানির নেতৃত্বে দক্ষিণ আসামের সিলেট জেলায় এক অত্যন্ত শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠল। এ আন্দোলনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল নিকটবর্তী জেলায়—পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহে।

উপরে উল্লিখিত আন্দোলনগুলি কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল না, তারা যে সবসময়ে কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত হত তাও নয়। তবে কিষাণ সভার অনেকগুলিই পরিচালনা করতেন কংগ্রেসী সমাজবাদীরা। কোনো কোনো কৃষক আন্দোলন, যেমন ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ বা ত্রিবাঙ্কুরের বয়ালার সত্যাগ্রহ, সংগঠন ও পরিচালনা করেন স্থানীয় কম্যুনিস্ট কর্মীরা। কংগ্রেসের সংগঠন কর্মীরা যে-সব কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব করতেন সাধারণভাবে তারা সংস্কারমুখী; বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র তাদের মধ্যে প্রকাশ পেত। অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হত আঞ্চলিক শ্রেণী সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে; জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পরোক্ষ, হয়তো কিছুটা আনুষঙ্গিক। কয়েকটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবার ধর্মনেতাদের নেতৃত্ব লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে অনগ্রসর অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে আদিম নৈতিকতার আদর্শে; আর এ আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরেন তাদেরই আঞ্চলিক ধর্মগুরু, কিংবা তাদের নিজেদের জাতির বা উপজাতির ধর্মশিক্ষক। ধর্মকে কেন্দ্র করে এই ধরনের আবেদনে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই পরোক্ষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বহু দেশেই কৃষকদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এ ঘটনা বার বার ঘটতে দেখা গেছে।

তবে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে, তাদের সংগঠিত করে তোলার সংকল্পে যে-সব রাজনৈতিক কর্মী ব্রতী হন, মার্ক্সীয় ভাবাদর্শই তাঁদের অনেকের কর্মোদ্যোগের প্রেরণা। এ ভাবাদর্শ তাঁরা পেয়েছিলেন কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসী সমাজবাদীদের কাছ থেকে। যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বিক্ষোভ সংগঠিত হ'ত তা তাঁদের মেলবার রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। হিজলি বা বক্সারের ক্যাম্পে কিংবা মান্দালয় ও আন্দামানের জেলে একসঙ্গে বহু রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দী করে রাখা হত; এই বন্দীদশার ফলেও তাঁদের পক্ষে ভাববিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা হয়েছিল। অনেক গান্ধীবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী বন্দীই অবসর সময়ে যে-সব বই প্রচার-পুস্তিকার সংস্পর্শে আসেন তা তাঁদের মনকে অহিংসা, কিংবা বোমা-নির্ভর দলগত বীরত্বের আদর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। ১৯৩৫-এর মে দিবসে আন্দামান জেলের একত্রিশ জন বন্দী একটি কম্যুনিস্ট কো-অর্ডিনেশন (Communist Co-ordination) গঠন করেন; ভগৎ সিং-এর অবশিষ্ট সহকর্মীরাও এর অন্যতম উদ্যোক্তা। চট্টগ্রাম দলের যাঁরা আন্দামানে ছিলেন, তাঁদেরও কেউ কেউ কম্যুনিস্ট হন। তবে পল্লী অঞ্চলে কংগ্রেসী রাজনৈতিক কর্মীরই সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এঁদের অনেকেই

গান্ধীজির সর্বোদয় আদর্শ প্রচারের ভার নেন। পরিবর্তনের এই মূল ধারাগুলিকে আশ্রয় করে জন্ম নিল এ যুগের মুক্তি সংগ্রামের নতুন রূপ।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশীয় রাজ্য

ভারতবর্ষের যেটুকু অংশ 'ব্রিটিশ ভারত' তার প্রত্যক্ষ শাসনের ভার ছিল ভাইসরয়ের উপর। দেশের বাকি অংশে ছড়িয়েছিল অসংখ্য রাজন্যশাসিত রাজ্য, ব্রিটিশের ভাষায় যাদের নাম নেটিভ স্টেট্স বা দেশীয় রাজ্য। দেশীয় রাজ্যের কতকগুলি আয়তনে বৃহৎ, তাদের জনসংখ্যাও বেশি; আবার কতকগুলি আয়তনে ছোটো, তাদের জনসংখ্যাও স্বল্প। দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকার ফলে এগুলি ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের পাশাপাশিই অবস্থিত ছিল। আসলে দেশীয় রাজ্য বা দলপতির মাধ্যমে ব্রিটিশই এগুলি পরোক্ষভাবে শাসন করতেন।

দেশীয় রাজ্যের রাজাদের শাসন ছিল স্বেচ্ছাচারী। অনেকেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি যথোপযুক্ত আনুগত্য দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখবার চেষ্টা করতেন। আনুগত্য প্রদর্শনে যাঁরা বিমুখ হতেন, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের খড়্গ গিয়ে পড়ত তাঁদের ওপর; ফলে রাজ্যচ্যুত হতে হত তাঁদের। তবে এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে যা লক্ষণীয় তা হল যে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার বজায় রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন এই রাজ্যগুলিতে ছিল না বললেই চলে। রাজারা নিজে আর তাঁদের অভিজাতবর্গ বাস করতেন চরম ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার মধ্যে; তাঁদের সঙ্গে তুলনা করলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় দৈন্য ও অভাবের চেহারা প্রকট। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারও কিছু কম হত না। সাধারণ অবস্থায় দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী শাসক হয় দেশের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে, নয় বাইরের থেকে আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হন; ব্রিটিশ শাসনের দরুন সে সম্ভাবনাও ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক দুর্গের অনাহত নিরাপত্তায় বাস করতেন দেশীয় রাজন্যবর্গ।

এই পরস্পরবিরোধী, অসন্তোষজনক অবস্থা থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জন্ম নিল একাধিক আঞ্চলিক সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে দেখা যায় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের প্রতিফলন। সংগঠনগুলি অভিহিত হত প্রজা মণ্ডল, রাজ্য প্রজা সম্মেলন (States' Peoples' Conference) প্রভৃতি বিবিধ নামে। মহীশূরে যে সংগঠনটি গড়ে ওঠে তা রাজ্য কংগ্রেসের (State Congress) রূপ নেয়। সংগঠনগুলির সব কটিই ছিল আঞ্চলিক, রাজ্যের সমস্যার প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। সংগঠন ছাড়া যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকদের মাধ্যমেও নতুন ভাবধারা দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশীয় রাজারা ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অনেক সৈন্য পাঠাল। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এই সৈন্যরা নিজের নিজের রাজ্যে

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিস্তারের সহায়তা করেন। এ ছাড়া আইন অমান্য আন্দোলনও দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২০-তে নাগপুরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস এদিকে প্রথম দৃষ্টি দেন। দেশীয় রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস আহ্বান জানালেন যাতে তাঁরা অবিলম্বে নিজ নিজ রাজ্যে জনসাধারণকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার দেন। তবে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে একই সঙ্গে এ কথাও বলা হল যে দেশীয় রাজ্যের নাগরিকেরা যদিও এককভাবে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারেন, কংগ্রেসের নাম নিয়ে তাঁরা তাঁদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না; যা তাঁরা করতে চাইবেন তা তাঁদের ব্যক্তিগত দায়িত্বেই করতে হবে। ব্রিটিশ ভারতের যে-সব নাগরিক কংগ্রেসের সভ্য তাঁদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সাধারণভাবে কংগ্রেসের ধারণা এই ছিল যে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মসূচী সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা উচিত স্থানীয় প্রজা মণ্ডল বা রাজ্য প্রজা সম্মেলনের (States' Peoples' Conference) হাতে।

দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যাতে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয় ব্রিটিশ সরকার সেজন্য চেম্বার অফ প্রিন্সেস বা নরেন্দ্র মণ্ডল নামে একটি উপদেষ্টাসংস্থা স্থাপন করেন। অবশ্য এ সংস্থার কাজ ছিল শুধু পরামর্শ দেওয়া। বিভিন্ন স্তরের রাজাদের মধ্যে পদমর্যাদা নিয়ে বিরোধের ফলে সংস্থাটি বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। সাইমন কমিশন নিয়োগের বছর ব্রিটিশ সরকার হরকোর্ট বাটলার ইণ্ডিয়ান স্টেট্‌স কমিটি নামে আর-একটি কমিটি নিয়োগ করেন। বাটলার কমিটির কাজ ছিল যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার উপায় নির্ধারণ করা। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ ছিলেন, সরকারী উদ্যোগে তাঁদের মধ্যে সাড়া জাগল। কাথিয়াওয়াড়ের বলবন্তরায় মেহ্‌তা ও মণিলাল কোঠারি এবং দক্ষিণাপথের জি. আর. অভয়ংকার ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে এক নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন (All-India States' Peoples' Conference) আহ্বান করেন। পশ্চিম ভারতীয়দের উদ্যোগে আহূত হলেও সারা ভারত থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরকারী কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করা এবং 'সম্মিলিত জনমতের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন।' তা ছাড়া সমস্ত রাজ্যগুলিতেই নির্বাচনী নীতিকে আশ্রয় করে জনসাধারণ যাতে সরকারী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় সম্মেলনে তার ওপরও জোর দেওয়া হয়। দেশীয় রাজ্যগুলিতে সরকারী রাজস্ব ব্যক্তিগত ব্যবহারে লাগানো হত; এই অনাচার যাতে দূর হয় সেইজন্য সম্মেলন চাইলেন, সরকারী রাজস্ব এবং শাসকের ব্যক্তিগত আয় যে সম্পূর্ণভাবে পৃথক তা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হোক। স্বেচ্ছাচারী

ক্ষমতার যাতে সম্পূর্ণ অবসান হয় সেজন্য সম্মেলন বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলার ওপরও জোর দিলেন।

সবশেষে, সম্মেলন চাইলেন ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সাংবিধানিক যোগসূত্র স্থাপন করতে এবং সে যোগসূত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যের সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে। এই যোগসূত্র স্থাপিত হলে সারা দেশের পক্ষেই স্বরাজলাভ ত্বরান্বিত হবে, এই হ'ল সম্মেলনের অভিমত।

১৯২৭-এর ডিসেম্বরের প্রথম সম্মেলনের পর থেকেই নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ নেয়, তার কার্যধারাও অব্যাহত থাকে। সংগঠনটি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্র, কংগ্রেসের মতো সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী তার মধ্যে দেখা দেয় নি। তবে তার প্রধান কারণ এই যে দেশীয় রাজ্যসমূহে সামন্ততন্ত্রই শোষণের প্রত্যক্ষ উৎস। সংগঠনটি স্থাপিত হওয়ার অন্যতম আশু ফল হিসেবে এ কথা উল্লেখ করা যায় যে এর পর থেকে দেশীয় রাজ্যসমূহে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে রইল না; আঞ্চলিক ঘটনাও পেল ভারতীয় তাৎপর্য। লাহোর-কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু; সভাপতির ভাষণে 'পূর্ণ স্বরাজে'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কংগ্রেসের সরকারী নীতিই তিনি ঘোষণা করলেন :

> দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতবর্ষের বাকি অংশ থেকে পৃথক হয়ে থাকতে পারে না।...তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র জনসাধারণেরই আছে।

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের দাবিগুলি সমর্থন করে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাস করলেন ১৯২৯-এর অধিবেশনে। সম্মেলন মনে করতেন দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা উচিত; তাই প্রথম গোল টেবিল বৈঠক যখন আহূত হল, সম্মেলন ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ সে বৈঠকে যেন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পান। ব্রিটিশ সরকার এ অনুরোধে কান দিলেন না। সম্মেলন তখন কংগ্রেসের কাছে একটি স্মারকলিপি দাখিল করলেন। স্মারকলিপিটিতে আবেদন করা হল এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচিত হোক যা সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা ছাড়া করাচী কংগ্রেসে ব্রিটিশ ভারতের নাগিরকদের পক্ষে যে মৌলিক অধিকার ও সুবিধা দাবি করা হয়েছিল, স্মারকলিপিটিতে বলা হল দেশীয় রাজ্যের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও তা যেন প্রযোজ্য হয়। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের শুরু, এইভাবে তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ নিল; সে আন্দোলনের ধারা মিশে গেল বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে।

গান্ধীজি কিন্তু হস্তক্ষেপের বিরোধীই রইলেন। ১৯২০-তে কংগ্রেস যে বিরোধী নীতি নিয়েছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে বাইরের থেকে কোনো আন্দোলন যদি গড়ে তোলা হয়, তার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া

আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেশীয় রাজ্যের নাগরিকদের নিজের থেকে পেতে হবে। তবে কংগ্রেস যখন প্রস্তাব আনলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের উচিত তাঁদের প্রজাদের মৌলিক অধিকার দান করা, তখন সে প্রস্তাবে উৎসাহ দিতে গান্ধীজি কোনো দ্বিধা করেন নি।

১৯৩৫-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল, কিন্তু এ সম্পর্কিত প্রস্তাবে এমন একটি বিকৃত রূপ দেওয়া হল যাতে দেশীয় রাজন্যবর্গ জাতীয়বাদী দাবিগুলিকে বাধা দিতে পারেন। প্রস্তাবিত আইনে স্থির হল যে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে দুই-পঞ্চমাংশ আসন এবং নিম্নতর কক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই ব্যবস্থায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিকে কোনোই স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল না। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় দেশীয় রাজ্যের সদস্যেরা যে জনগণের প্রতিনিধি হবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখা গেল না। দেশীয় রাজাদের মনোনীত ব্যক্তিরাই শুধু আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন স্থির হ'ল।

অনেকগুলি রাজ্যে, বিশেষত রাজকোট, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে, এ সময় উল্লেখযোগ্য গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। সব ক্ষেত্রেই আন্দোলনগুলির দাবি ছিল যেন গণতান্ত্রিক নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এবং সরকারী শাসনব্যবস্থাকে নতুন করে সংগঠন করা হয়। এ দাবির জবাব রাজারা দিলেন নির্মম দমননীতির মাধ্যমে। গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল স্রোত আটকাতে গিয়ে অনেকে আবার সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধে উস্কানি দিতে শুরু করলেন। হায়দরাবাদের নিজাম প্রচার করতে শুরু করলেন এ আন্দোলন আসলে মুসলমানবিরোধী; আবার কাশ্মীরের মহারাজা দেখাতে চাইলেন এ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ত্রিবাঙ্কুরের আন্দোলন সম্পর্কে বলা হল যে এর পেছনে খৃস্টানদের এবং খৃস্টীয় চার্চের হাত আছে; আর এ বিক্ষোভ সংগঠিত করে তারা আসলে হিন্দু মহারাজাকে গদিচ্যুত করতে চাইছেন।

দেশীয় রাজ্যের জনগণের মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেস ইতিমধ্যে সমর্থন জানাতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা দাবি করতে লাগলেন যাতে রাজ্যসমূহে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত এবং জনসাধারণকে নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। স্বাধীনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বললেন, তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে সব ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা, এবং সে স্বাধীনতার আস্বাদ থেকে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরাও বাদ যাবেন না। ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৮) সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে তাদের আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেস নিজেকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করবেন। সরল ভারতবাসীর উদ্দেশ্য, আকাঙক্ষা সব-কিছুর রূপই যে এক, নিখিল ভারত রাজ্য প্রজা সম্মেলন সে সত্যকে আবার মূর্ত করে তুললেন জওহরলাল নেহরুকে ১৯৩৯ সালের জন্য সভাপতিপদে বরণ ক'রে। দেশীয় রাজ্যসমূহে জনগণের যে আন্দোলন, রাজনৈতিক

চেতনার বিকাশকে তা শুধু আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে নি, সে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ঐক্যবোধের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল।

বিশ্ব রাজনীতি

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি এবং তার পর থেকেই জাতীয় আন্দোলনের, বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতারা, বিশ্ব রাজনীতিতে প্রথম সচেতনভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বাইরের জগতে কী ঘটছে এবং দেশের লোকের ওপর তার প্রভাব কী তা জানার আগ্রহ প্রথম লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য গোড়া থেকেই বিদেশে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় অর্থসম্পদ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন ভারতীয় নেতারা। ১৮৮৫-তে কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই এই বিরোধিতা কংগ্রেসের অন্যতম নীতি হয়ে ওঠে। এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় আর-একটি ক্ষেত্রে। কংগ্রেস এই সময় থেকে দেশের জন্য এমন একটি বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন যাতে ব্রিটেনের চেয়ে দেশের নিজের স্বার্থই সাধিত হবে। সাধারণভাবে এ নীতি ছিল সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদেরই বিরোধী। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রাসেল্স-এ নিপীড়িত জাতিসমূহের একটি মহাসভা (Congress of Opposed Nationalities) আহূত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে-সব দেশের মানুষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত হতেন, সেই-সব দেশের নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মী এবং বিপ্লবীরা মিলে এই সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি সম্মিলিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা যায়। জওহরলাল নেহরু এ সম্মেলনে যোগ দেন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন :

> পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের নিপীড়িত মানুষ আজ যে সংগ্রাম করছে, তার মধ্যে আমরা একটা গভীর মিল খুঁজে পাই। সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে দেখা দিলেও তাদের শত্রুর আসল চেহারা একই; নিপীড়নের পদ্ধতিও প্রায়শই সমান।

ব্রাসেল্স মহাসভাতেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ (League against Imperialism) স্থাপিত হয়। নেহরু লীগের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন।

এই বছরের শেষের দিকেই মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে ব্রিটেনকে যুদ্ধকালীন সহায়তা দানের প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার ভিত্তিতে সরকারকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণ বা সম্প্রসারণের জন্য যদি যুদ্ধের উদ্যোগ করে কিংবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তা হলে ভারতবর্ষ তাতে কোনোরকম সাহায্য দেবে না।

১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠতে থাকে। পৃথিবীর যে-কোনো অংশে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হন। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়েই ইটালি, জার্মানি ও জাপানে গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই আর-এক রূপ; তার দৃষ্টিভঙ্গী তীব্র রকমের গোঁড়া; জাতিবিদ্বেষ তার অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করলেন তা ফ্যাসিবাদবিরোধী। ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতি তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানালেন। ১৯৩৭-এ যখন জাপানের হাতে চীন আক্রান্ত হল, কংগ্রেস তাকে শুধু সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বলে ধিক্কার দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না; একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন: 'চীনবাসীদের প্রতি সহানুভূতিস্বরূপ তাঁরা যেন জাপানী পণ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন।' পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৮-এ চীনা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য একটি মেডিক্যাল মিশন এ দেশ থেকে পাঠানো হয়। ডা: এম. অটল ছিলেন এই মিশনের নেতা; ডা: কোটনিশ ছিলেন মিশনের অন্যতম সদস্য।

এই-সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের নীতি প্রকাশ পেল তা একটি সত্যেরই স্বীকৃতি। কংগ্রেস বুঝতে পেরেছিলেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত এবং ফ্যাসিবাদের সঙ্গে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমর্থকদের যে সংগ্রাম আসন্ন, তার প্রভাব ভারতবর্ষে গভীরভাবেই পড়বে। অধিকাংশ ভারতীয় নেতাই এই মত পোষণ করতেন, তবে বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের সকলের মুখপাত্র ছিলেন জওহরলাল নেহরু। নেহরু অবশ্য এ ক্ষেত্রে শুধু কংগ্রেসের নয়, সারা দেশেরই মুখপাত্র ছিলেন। বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় অগ্রগতির সম্পর্ক যে কত নিবিড় ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই তা প্রথম স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারেন; তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এ বোধ বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন :

> আমাদের সংগ্রাম এক বৃহত্তর, ব্যাপকতর সংগ্রামের অঙ্গ। যে প্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি, সেই একই প্রেরণায় সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বুদ্ধ। সেই প্রেরণাই তাদের কাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে ধনতন্ত্র ফ্যাসিবাদের শরণ নিয়েছে...সাম্রাজ্যবাদ বহুদিন ধরেই ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে চেহারা নিয়েছিল, সে চেহারা তার নিজের জন্মভূমিগুলিতেই ফ্যাসিবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফ্যাসিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ আজকের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রেরই দুই মুখ।..পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্র এবং প্রাচ্য ও অন্যান্য পরাধীন দেশসমূহের উদীয়মান জাতীয়তাবাদ রুখে দাঁড়িয়েছে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এই মিলিত মূর্তির বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে, নেহরু তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে 'পৃথিবীর যে-সব প্রগতিশীল শক্তি স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবে, আর রাজনৈতিক ও সামাজিক দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার জন্য লড়াই করবে' ভারতবর্ষ তাদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে বলে তিনি ঘোষণা করেন, কারণ, সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তার সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের কোনো তফাত নেই।

ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতা

১৯৩৫-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে যে সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়, তাকে কেন্দ্র করে বিবিধ ধরনের আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদবোধ নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ বোধে যথারীতি ইন্ধন জোগাল সরকারের 'বিভাজন ও শাসন' নীতি। সারা দেশ জুড়ে আধা সামন্ততান্ত্রিক যত জমিদার ও ভূম্যধিকারী ছিলেন তাঁরাও সাম্প্রদায়িক বিভেদে উৎসাহ জাগালেন। এক ধরনের উগ্রপন্থী ধর্মীয় গোঁড়ামিও আত্মপ্রকাশ করল।

নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন; ৫৮-র মধ্যে তাঁরা মাত্র ২৬টি আসন লাভ করেন। এই ২৬টির মধ্যে ১৫টি আসন আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, যেখানে খান আবদুল গফ্ফর খান এবং তার খোদা-ই-খিদমৎগারেরা এই সাফল্যের কারণ। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন মুসলিম লীগও এর চেয়ে খুব বেশি পান নি। সারা জাতির স্বার্থকেই কংগ্রেস তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তার জন্য তাদের আন্তরিক ও সচেতন প্রচেষ্টা কোনো অংশে কম ছিল না। কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরও অভাব ছিল না। তবু নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বুঝতে পারলেন যে মুসলমান জনসাধারণের আস্থা তাঁরা এখনো অর্জন করতে পারেন নি। যে-সব ক্ষেত্রে তাঁরা জয়লাভ করেন তার ভিত্তিতে নিজেদের শক্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য তাঁরা উদ্যোগী হলেন এবং গণসংযোগের একটি কর্মসূচী সংগঠিত করার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

মুসলিম লীগ অবশ্য কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে তীব্র আক্রমণ শুরু করলেন। তাঁদের অভিযোগ, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় যাতে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়, কংগ্রেসের লক্ষ্য তাই। লীগ এ সময় এ তত্ত্বও প্রচার করতে শুরু করলেন যে হিন্দু ও মুসলমান আসলে দুই জাতি।

হিন্দুদের মধ্যেও জাতিভিত্তিক কিছু কিছু সংগঠন এই সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে এই সংগঠনগুলি ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। এদের মধ্যে প্রধান ডা: আম্বেদকরের ইনডিপেণ্ডেণ্ট ওয়ার্কার্স পার্টি। এ পার্টির কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই। ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতাদের সমর্থনপুষ্ট এই পার্টি প্রধানত দুঃস্থ

শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত ছিল। মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টিরও পুনরভ্যুত্থান দেখা দেয়। তথাকথিত ব্রাহ্মণ-কবলিত কংগ্রেসের বিরোধিতায় জাস্টিস পার্টি উদ্যোগী হয়ে ওঠে। অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের অনেক সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। হিন্দু মহাসভা এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ১৯৩৫-এ স্থাপিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। পরবর্তী বছরগুলিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দুরা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আরো তিক্ত করে তুলল। সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের 'দ্বিজাতি তত্ত্বে'র বিরুদ্ধে তাঁরা একই ধরনের অবৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্ব খাড়া করলেন এবং প্রচার করতে শুরু করলেন যে ভারতীয় বলতে হিন্দুদেরই বোঝায়; অন্য ধর্মের মানুষ যাঁরা, তাঁরা বিদেশী।

এই দুই সাম্প্রদায়িক তত্ত্বই ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়; বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করে তোলে। হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তাঁদের অনুগামীদের শোনাতেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বশ্যতার, এমন-কি, সহযোগিতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। ব্রিটিশ সরকার যখন কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ চালাতেন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তখন ব্যগ্র হয়ে উঠতেন।

১৯৩৯-এর পরে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের অবিচল মনোভাবের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই বিরোধের উৎস সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা; ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ভারতের আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব—এ দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে এর মূল খুঁজে বের করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারী ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোই বুঝি ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য। আসলে কিন্তু ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ছিল শহরাঞ্চলের সম্পত্তির মালিক ও উচ্চবিত্ত কৃষক শ্রেণীর আশা-আকাঙক্ষায় ইন্ধন জোগানো। সমাজের কিছু কিছু সম্প্রদায় তখনো সামাজিক স্তরবিভাগ ও অগণতান্ত্রিক গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ছিলেন; ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসনে'র নীতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলিতে সক্রিয় বিস্তার লাভ করেছিল—সমাজের রক্ষণশীল শক্তিগুলি আবার সাহায্যলাভের আশায় এই-সব দলেরই শরণাপন্ন হতেন।

যে-সব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করেন সেখানে তাঁদের উদ্যোগে অনেকগুলি সংস্কার প্রবর্তিত হয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা, হরিজনদের অবস্থার উন্নতিসাধন, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রবর্তন কংগ্রেসের উদ্যোগের পরিচয় বহন করে। আর-একটি ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সক্রিয় মনোযোগ দেন। শহরে কলকারখানার অঞ্চলে দোকান থেকে সস্তায় মদ কিনতে পাওয়া যেত; এ-সব অঞ্চলে মদ্যপান এক গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস মাদ্রাজেই প্রথম মদ্যপান নিবারণী আইন প্রবর্তন করেন; পরবর্তীকালে এই নিবারণমূলক নীতি

কংগ্রেসের কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রম-সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ সরকার ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে যাতে সরকারী মধ্যস্থতার মিটিয়ে ফেলা যায়, এই ব্যবস্থার মধ্যে তার উপযোগী আয়োজন রাখা হ'ল। স্বাধীনতার যুগে শ্রম-সম্পর্কের কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

শ্রম-সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় হিসেবে সম্মিলিতভাবে বোঝাপড়ার এক উদারনৈতিক প্রয়াস এই ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক শক্তি এর ফলে বেড়ে যায়; আবার শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাতে ঐক্য বজায় রাখতে প্রস্তুত হন তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবশ্য ব্যবস্থাটির এই বলে সমালোচনা করতে থাকল যে এর ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সহযোগিতা দেখা দেবে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ দেশে চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে।

সাধারণভাবে বলা যায়, ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে গান্ধীজির নীতিগুলিকে বাস্তাবে রূপায়িত করার কাজে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কর্মোদ্যোগে দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থী নেতাদেরই সক্রিয় দেখা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছরে এই নীতিগুলি ছিল ভারত সরকারের সরকারী নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা এবং আসাম এই প্রদেশগুলি নিয়ে পাকিস্তান গঠনের এক দাবি ১৯৩৫ সালে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু এই-সব প্রদেশেই নির্বাচনে মুসলিম লীগ আদৌ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি যে-সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, মুসলিম লীগ সেখানেই সাফল্য অর্জন করেন। কংগ্রেস যদি ১৯৩৭-এর নির্বাচনের শিক্ষা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন তা হলে সহজেই বুঝতেন অনেক মুসলমান ভোটার কংগ্রেসকে ভোট দেন নি কেন? এর কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের ভয়; সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভয় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যদি প্রাদেশিক আইনসভাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তা হলে নিজেদের আধিপত্যকে ব্যবহার করবেন মুসলমানদের উচ্ছেদের কাজে। কংগ্রেস বুঝতে পারেন নি যে যে-কোনো দেশের সংখ্যালঘুদের পক্ষে এ ধরনের ভয় স্বাভাবিক; আর কংগ্রেসের বাইরে এবং ভেতরেও সাম্প্রদায়িক চিন্তা যখন এত প্রবল, তখন সে ভয় ব্যাপক হয়ে উঠবে তাও স্বাভাবিক।

অনেক কংগ্রেস নেতা অবশ্য তৎকালীন পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন কংগ্রেসের ভেতর থেকে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদের জন্য সুদৃঢ় সংগ্রাম করা ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনচেতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাঁদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ, সহৃদয় ব্যবহার করলে, তাঁদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্য উদ্যোগী হলে তবেই তাঁদের বিশ্বাস

অর্জন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সমাজে সামন্ততন্ত্র সংশিষ্ট যা-কিছু আছে তার বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন।

১৯৩৭-এর মার্চে নেহরু ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি বিশেষ সংগঠন গড়ে তোলা হবে। এই সংগঠন মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণসংযোগ স্থাপন করার ভার নেবেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবেন। উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক দলগুলির কাছ থেকে এ উদ্যোগে সাড়া পাওয়া গেল। মজলিস-ই-আহরার, জমায়ত উলেমা-ই-হিন্দ প্রভৃতি দলগুলি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন। কিন্তু গণ-সংযোগের যে কর্মসূচী কংগ্রেস নিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি সফল হ'ল না। কংগ্রেস নেতারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শোষিত মানুষকে সংঘবদ্ধ করে তুলতে পারেন নি।

তবে এই গণসংযোগের কর্মসূচীই লীগ নেতাদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলল। উত্তর-প্রদেশের ধনী ভূস্বামী লিয়াকৎ আলি খান ছিলেন লীগের সমর্থক, তাঁর মতো অনেকেই এখন জিন্নার গোঁড়া ভক্ত হয়ে ওঠেন। এদের ভয় হল কংগ্রেস যদি উত্তরোত্তর আরো চরমপন্থী কৃষি-কর্মসূচী অনুসরণ করে চলেন তা হলে তাঁরা যে আধা সামন্ততান্ত্রিক মর্যাদা ভোগ করেন তা খর্ব হবে, তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব যদি বৃদ্ধি পায়, তা হলে সাম্প্রদায়িক নেতারা এতদিন সরকারের যে অনুগ্রহ ভোগ করে আসছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হবেন।

বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িক নেতারা প্রকাশ্যে বলতে পারতেন না যে এই-সমস্ত কারণে তাঁরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন। তাঁরা বরং কংগ্রেসের ব্যর্থতাকে বড়ো করে দেখাতে চাইলেন। বাংলাদেশে তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ আনলেন যে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং ভূস্বামীদের পক্ষ নিয়েছেন। আবার উত্তর প্রদেশে তাঁদের অভিযোগ হ'ল যে কংগ্রেস গণসংযোগের নীতিতে ব্যর্থ হয়েছেন, আবার কংগ্রেসের জন্যই মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী হীনবল হয়ে পড়ছেন—একই সঙ্গে এই অভিযোগ আনতে তাঁদের দ্বিধা হল না। ১৯৩৭-এ লক্ষ্ণৌতে লীগের অধিবেশন হল। সভাপতির ভাষণে জিন্না অভিযোগ করলেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মুসলমানদের সঙ্গে অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন।

মুসলিম লীগ এবার নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে আরো সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৯৩৮-এর মধ্যেই লীগে ১৭০টি নতুন শাখা স্থাপিত হ'ল; উত্তর প্রদেশে ৯০টি এবং পাঞ্জাবে ৪০টি। শুধু উত্তর প্রদেশেই এক লক্ষ লোককে লীগের সদস্য করা হ'ল। ১৯৪০-এ লীগ দাবি করলেন স্বতন্ত্র পাকিস্তানের। মুসলিম লীগের এই পর্বের রাজনীতির এবং স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবির, সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অধ্যাপক এ. এফ. সালাহ্উদ্দিন আহমেদ। ১৯৭২-এর

এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলকাতায় বাংলাদেশ সম্পর্কে যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন, তাতে একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে যে আন্দোলন তা ধর্মীয় আন্দোলন নয়।...হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এই ভয়ই এ আন্দোলনকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐতিহ্যাশ্রয়ী ইসলামে রাজনীতি ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু আজকের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে সে কথা খাটে না।...পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করেছিলেন যে-সব নেতা, প্রাচীন ইসলামের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগ তাঁদের মধ্যে খুব কম জনেরই ছিল। ঠিক এই কারণেই মজলিস-ই-আহ্‌রার, জমায়ত উলেমা-ই-হিন্দ প্রভৃতি যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, মুসলিম লীগকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি; তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে লীগের নেতৃত্বে ঐস্লামিক ঐতিহ্যের পরিচয় ভালোভাবে পাওয়া যায় না। রক্ষণশীল মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও (এ কথা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সব মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকই মুসলিম লীগের বিরোধী ছিলেন না) মুসলিম লীগ মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ ও তাঁদের মাধ্যমে মুসলমান জনসাধারণের আনুগত্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই-সব মানুষের কাছে পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কাহীন বহুমুখী অগ্রগতির এক সুযোগ তুলে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। এ যুদ্ধ ভারতীয় নেতাদের পক্ষে এক দুরূহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। সর্বগ্রাসী নির্মম শাসনতন্ত্র, গোঁড়া জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ফ্যাসিস্ট দর্শন, ভারতীয় নেতারা গোড়া থেকেই তার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৯-এর পূর্বেই ফ্যাসিবাদ যখন রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল, এবং তার বিস্তার-লোলুপ আগ্রাসী কর্মসূচী সংগঠিত করে তুলেছিল, তখনই জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ইয়োরোপের ঘটনাবলীতে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার জানান; স্পেন, ইথিওপিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নির্যাতিত মানুষদের প্রকাশ্য সমর্থন জানাতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। জাপানে যখন ফ্যাসিস্ট প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তখনো তাঁরা একই মনোভাব প্রকাশ করেন, জাপানের হাতে যখন চীন আক্রান্ত হয় তখন স্বাভাবিক যুক্তিতেই চীনকে সমর্থন জানান, জাপানকে ধিক্কার দেন আক্রমণকারী বলে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও তাঁদের বিদ্বেষ ছিল সমান তীব্র। স্বভাবতই যুদ্ধ সম্পর্কেও তাঁদের মনোভাব কী হবে তা নির্ভর করছিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপর। যদি দেখা যায় যে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির ওপর শুধু ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করছে, এবং তাদের প্রতিপক্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক অর্থসম্পদলোভী নয়া সাম্রাজ্যবাদই আত্মপ্রকাশ করছে, তা হলে এ যুদ্ধে ভারত কোনোরকম অংশ নেবে না। আর যদি

দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সত্যি সত্যি নিজেদের পথ পরিবর্তন করেছে এবং ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে 'বিশ্ব গণতন্ত্র রক্ষা'র জন্য সংগ্রাম করছে, তা হলে ভারত মিত্রশক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হবে। তবে মিত্রশক্তির কথার সঙ্গে কাজের যে মিল থাকবে তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চাই। বিশেষত, ব্রিটেনকে ভারতের উপর তার সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক আধিপত্য ছেড়ে দিতে হবে এবং ভারতীয়েরা যাতে স্বায়ত্তশাসনের যথোপযুক্ত অধিকার পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের এই-সব অনুভূতিকে মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা, কোনোরকম গ্রাহ্যই করা হল না। ১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষিত হল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হল। ১৯৩৫-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন সম্পর্কে যে অংশটুকু ছিল তা তখনো কার্যকরী হয় নি, সুতরাং সাংবিধানিক দিক দিয়ে দেখলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে ভাইসরয় আইনবিরোধী কিছু করে নি। কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তখন আইনের আবেদনই বড়ো নয়। দেশে কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিল, প্রদেশে প্রদেশে জনসাধারণের নির্বাচিত সরকারও ছিল। সুসংবদ্ধ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলেরও অভাব ছিল না দেশে। তা ছাড়া এর আগে অনেকবার ভারত সরকার ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন যাতে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরস্পরের গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধান বের করা যায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু কারো পরামর্শ নেওয়া হল না; ভারতীয় নেতারা আরো বেশি আহত হলেন এই কারণে যে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কী সরকার তা আগেই বুঝবার অবকাশ পেয়েছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই মালয় ও দূর প্রাচ্যে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছিল; এর প্রতিবাদে কংগ্রেস পার্টি কেন্দ্রীয় আইনসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে (১৯৩৯) যোগদান থেকে বিরত রইলেন।

কিন্তু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কংগ্রেসের বিদ্বেষ ছিল আরো তীব্র। তাই যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তাঁদের যে প্রতিক্রিয়া হল তাকে সৌহার্দ্যব্যঞ্জক বলা যেতে পারে। ১৯৩৯-এর ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা একটি বিবৃতি দেন; তাতে কংগ্রেস পার্টির মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে :

> স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই যদি এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক অধিকার, কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা যদি এ যুদ্ধের মাধ্যমে অক্ষুণ্ণ থাকে তা হলে এ যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র-কেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতি যদি যুদ্ধের মূল প্রশ্ন হয়, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের উৎসাহের কোনো অভাব নেই।...প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সানন্দে প্রস্তুত থাকবে।...তবে সে সহযোগিতা হবে সমানে সমানে, পারস্পরিক সম্মতিকে ভিত্তি করে।...ব্রিটিশ সরকারকে কার্যকরী সমিতি তাই আহ্বান

> জানাচ্ছে তাঁরা দ্বার্থহীনভাবে বলুন গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের যুদ্ধ-লক্ষ্য কী, এবং কী ধরনের নতুন ব্যবস্থার কথা তাঁরা ভাবছেন। বিশেষত, বর্তমান ভারতের ক্ষেত্রে তাঁদের যুদ্ধ-সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করবেন তাও তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন।...যে-কোনো ঘোষণার বাস্তব মুল্যায়ন হয় তখনই, যখন তাকে বর্তমানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।...

এর যে উত্তর ভাইসরয় দিলেন ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা আদৌ সন্তোষজনক নয়। তাও এ উত্তর এল এক মাসেরও পরে, ১৯৩৯-এর ১৭ অক্টোবর। চিঠিতে ভাইসরয় এই বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে ব্রিটেনের যুদ্ধ-লক্ষ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যা বলেছেন তার চেয়ে কিছু বেশি বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরো কিছু ভারতীয়কে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য করে নিতে পারেন। তবে যুদ্ধের সময় শাসনক্ষমতা প্রায় পুরোপুরি ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া ব্যবহারিক দিক দিয়ে আদৌ সম্ভব নয়। তবে ভারতীয়দের মর্মান্তিক হতাশায় সান্ত্বনা হিসেবে কিছু নিরাপদ, অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি ভুললেন না। যুদ্ধ যখন শেষ হবে ব্রিটেন তখন ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখবে ১৯৩৫-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে কী কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে 'যাতে অন্যান্য বড়ো বড়ো ডোমিনিয়নদের (Dominions) মধ্যে ভারত যথাযোগ্য স্থান লাভ করতে পারে।'

এ উত্তর থেকে এমন কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া গেল না যে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটেন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। দূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশ্বাস দেওয়া হ'ল তা কেবল সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মর্যাদা, পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। বলা বাহুল্য, এ উত্তর কংগ্রেসের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। কার্যকরী সমিতি ভাইসরয়ের শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন অক্টোবর শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন। তবে আলোচনার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ না করে কিছুটা খোলা রাখা হল। কংগ্রেস তাঁদের বিবৃতিতে জানালেন, ব্রিটেন যদি তাঁদের মনোভাব ও নীতি পরিবর্তন করেন, তা হলে তাঁরাও সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তাঁরা বললেন, 'বর্তমান অবস্থায় গ্রেট ব্রিটেনকে কোনোরকম সাহায্য দেওয়া কার্যকরী সমিতির পক্ষে সম্ভব নয়, কোনোরকম সাহায্য দিলে তা সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করার সামিল হবে।' অর্থাৎ ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের নীতি পরিবর্তিত হলে কংগ্রেসও সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হবেন, এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ প্রতিশ্রুতির আভাস তাঁদের বিবৃতিতে স্পষ্ট।

১৯৪০-এর অক্টোবরে অর্থাৎ এক বছর পরেও গান্ধীজি নতুন করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার কথা ভাবছিলেন। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এ আন্দোলনে শুধুমাত্র বাছাই করা কয়েকজনই অংশ নেবেন। সরকাবের বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও

কংগ্রেস পার্টি বা গান্ধীজি কেউই গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারী যুদ্ধোদ্যমে বাধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যুদ্ধোদ্যমকে ভারতীয় জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করছে, ব্রিটিশের এই দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই ছিল শুধু এ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য। ভাইসরয়কে লেখা একটি চিঠিতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন :

> ...নাৎসীদের সাফল্য সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ নাগরিক যতটা বিমুখ, কংগ্রেসও ঠিক ততটাই বিমুখ। কিন্তু কংগ্রেসের বিমুখতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করানো যাবে না। আপনি এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট দুজনেই ঘোষণা করেছেন যে সারা ভারতবর্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করছে, এ কথা তাই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করছি যে অধিকাংশ ভারতবাসীরই এ ব্যপারে কোনো আগ্রহ নেই। যে দ্বৈত স্বৈরতন্ত্র তাদের ওপর শাসন চালায় তার সঙ্গে নাৎসীতন্ত্রের কোনো পার্থক্যই তারা করে না।

ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল ১৯৪০-এর অক্টোবরে। গান্ধীজি বিনোবাভাবেকে প্রথম সত্যাগ্রহী নেতা রূপে মনোনীত করলেন।

ক্রিপ্‌স্‌ মিশন

১৯১৪ সালে ইয়োরোপের যুদ্ধ চরমে পৌঁছল। ব্যাট্‌ল্‌ অফ ব্রিটেন (Battle of Britain) নামক যুদ্ধে পরাজিত হলেও জার্মানি একে একে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং ফ্রান্স অধিকার করল এবং ১৯৪১-এর জুনে রাশিয়া আক্রমণ করল। ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল। এইভাবে ১৯৪১ সাল শেষ হওয়ার আগেই এ যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিল। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া মিত্রশক্তির সমর্থনে পুরোপুরি যুদ্ধে যোগদান করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিত্রশক্তির পক্ষে জয়লাভ করা যে খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এমন কোনো সম্ভাবনা তখনো দেখা দেয় নি। বরং এশিয়ার রণাঙ্গনে প্রথম দিকের যত সাফল্য তা জাপানই অর্জন করে চলেছিল। জাপানী শক্তি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বর্মা অধিকার করে নিল। ১৯৪২-এর মার্চে জাপানী সৈন্যবাহিনীর হাতে রেঙ্গুন অধিকৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় সীমান্তের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা দেখা দিল।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মরিয়া হয়ে উঠলেন যাতে পুরোপুরিভাবে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা যায়। শুধু জাপানের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য নয়, তাঁদের সার্বিক যুদ্ধোদ্যমের পক্ষেই এ সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। ব্রিটিশ সরকার এও বুঝলেন যে এ সহযোগিতা অর্জন করতে গেলে ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতের সম্পর্কে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার। আর দরকার

অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আরো বিস্তৃত করা। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতবর্ষে পাঠানো হ'ল, তাঁর সঙ্গে রইল একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া। তীক্ষ্ণধী আইনজীবী, বিশ্বস্ত সমাজবাদী ক্রিপ্‌স্‌ ভারতীয় সমস্যা দীর্ঘদিন গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন; ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্পর্কও ছিল। কিন্তু যে ঘোষণাপত্রের খসড়াটি তিনি সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু রইল না। ঘোষণাপত্রে বিধৃত প্রস্তাবগুলি ছিল এইরকম : যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষকে 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদা (Dominion Status) দেওয়া হবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার অধিকারও ভারতবর্ষের থাকবে। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য যুদ্ধ শেষ হবার পরেই একটি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠিত হবে এবং অ্যাসেম্বলির সদস্যরা আসবেন ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত এবং দেশীয় রাজ্য—দু জায়গা থেকেই। ব্রিটিশ-ভারতের সদস্যেরা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নিম্নতর কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের সদস্যদের দেশীয় রাজারা মনোনয়ন করে পাঠাবেন। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যে সংবিধান রচনা করবেন, ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নেবেন এবং ভারতের সঙ্গে চুক্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এর মধ্যে একটি শর্ত থাকবে : যে-কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আওতার বাইরে থাকতে পারবে এবং সরাসরিভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবে।

যুদ্ধ চলার সময় কোনো সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এই প্রস্তাবগুলিতে দেওয়া হয় নি, তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে একটি 'জাতীয় সরকার' সংগঠনে ও তাকে সক্রিয় রাখায় ভারতীয় দলগুলি ও নেতারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত সামরিক বিষয়গুলি ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষেরই অধীনে থাকবে, তবে প্রতিরক্ষা-সদস্য হিসেবে একজন ভারতীয়ও থাকবেন।

ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করলেন প্রায় সব পার্টি; কিন্তু এ প্রত্যাখ্যানের কারণ বিভিন্ন, এমন-কি, অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতও। যে-কোনো প্রদেশকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র থাকার অধিকার দেওয়ার নীতিকে কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক নীতিকে মেনে নিতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বাধে নি। কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে তাই স্বীকার করে নেওয়া হল, 'কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরই তাদের প্রচলিত ও প্রচারিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হয়ে থাকার জন্য কার্যকরী সমিতি বাধ্য করতে পারে না।' কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে 'নির্বাচন ছাড়াই কিছু সদস্য আসতে পারবেন' এ প্রস্তাবকেও কংগ্রেস গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির ওপর তাঁরা আর নির্ভর করে থাকতে চাইলেন না। অবিলম্বে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ যাতে

সত্যি সত্যি হাতে পাওয়া যায়, তাই হ'ল তাঁদের দাবি। তাঁরা চাইলেন যে বিদেশে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে হলে তাঁদের নিজের দেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অবিলম্বে মঞ্জুর হবে।

প্রদেশগুলি ইচ্ছা করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারবে এই সম্ভাবনাকে অবশ্য মুসলিম লীগ সানন্দে স্বাগত জানালেন। এর কারণও ছিল। যে প্রদেশ বা অঞ্চলগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা ইচ্ছা করলে যে আলাদা একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারবে এ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে ছিল। তবে প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করতেও মুসলিম লীগ ছাড়েন নি। তাঁদের মতে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রস্তাবগুলিতে খুব স্পষ্টভাবে কিছু বলা ছিল না। তা ছাড়া তাঁদের ধারণায় প্রস্তাবগুলি খুবই অনমনীয় এবং কোনো রকম পরিবর্তনের অনুকূল নয়।

অন্যান্য দলও বিভিন্ন কারণে প্রস্তাবগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। হিন্দু মহাসভা প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করলেন ভারত-বিভাগের আশঙ্কায়। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিখেরা ভয় পেলেন এই ভেবে যে পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেবেন। আম্বেদকারের আশঙ্কা হ'ল প্রস্তাবগুলি যদি কার্যকরী হয় তা হলে হরিজনদের নির্ভর করে থাকতে হবে বর্ণহিন্দুদের দয়ার ওপর। তা ছাড়া অন্তর্বর্তী, অর্থাৎ যুদ্ধ চলার সময় শাসনের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষমতা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া হবে, প্রস্তাবগুলিতে স্পষ্ট করে বা সন্তোষজনভাবে বলে দেওয়া হয় নি এও ছিল তাঁদের সকলের অন্যতম অভিযোগ। আলোচনা চলার সময় প্রথম দিকে ক্রিপ্‌স্ 'জাতীয় সরকার' 'মন্ত্রিসভা' প্রভৃতি গঠনের কথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রস্তাবগুলিতে স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আদৌ যে কিছু ছিল না তা বোঝা গেল তাঁর আকস্মিক একটি ঘোষণায়। জাতীয় সরকার বা মন্ত্রিসভা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট স্বীকার করলেন যে তিনি শুধু ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সম্প্রসারণের কথাই বলেছেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিপ্‌স্-এর প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হল। অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে ক্রিপ্‌স্-এর দৌত্য সফল হল না।

১৯৪২-এর বিদ্রোহ

ক্রিপ্‌স্ মিশনের ব্যর্থতায় সারা দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ল। মুসলিম লীগের অবশ্য হতাশ বোধ করার খুব একটা কারণ ছিল না। যুদ্ধের ফলে কিছু কিছু ব্যক্তিও কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, কেউ কেউ আবার লোভনীয় কণ্ট্রাক্টও জোগাড় করতে পারে। কিন্তু এদের বাদ দিলে বাকি সবাই চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো রকম উদ্যেগহীনতাই অসহনীয়; কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এর পরে কী করা যায়।

ক্রিপ্‌স্‌ মিশনে গান্ধীজি খুব উৎসাহী না হলেও এর ব্যর্থতা তাঁকেও খুব নিরাশ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলীতেও তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সরে আসার ফলে ঐ-সব অঞ্চলের প্রতিরোধ শক্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, জাপানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তারা। একই ধরনের বিপর্যয় ঘটে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায়। পোড়ামাটি নীতি আশ্রয় করে গভীর প্রতিরক্ষার যে ব্যবস্থা এই-সব অঞ্চলে নেওয়া হচ্ছিল তার ফলে গোটা দেশ যাচ্ছিল ধ্বংস হয়ে। পূর্ব সীমান্ত দিয়ে শত্রুপক্ষ যদি ভারত আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় নদীপথে চলাচলের উপযোগী ছোটো ছোটো নৌকা বাংলাদেশে হাজারে হাজারে ধ্বংস করা হল যাতে তারা শত্রুর হাতে না পড়ে। ভারতের ভাগ্যে কী লেখা আছে তার কিছুটা আভাস এই বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। এই সময়ে বাংলার অর্থনীতিই শুধু বিপর্যস্ত হয় নি, শস্য বণ্টনের ব্যাপারেও গুরুতর সংকট দেখা দেয়। মালয় ও বর্মায় যা ঘটেছে ভারতবর্ষেও যাতে তাই না ঘটে সেজন্য গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে সামরিক আক্রমণের মুখোমুখি পড়ে মানুষ ভয়ে দিশাহারা হয়ে ওঠে, প্রতিরোধের কথা ভাবে না; ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার পথও বন্ধ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে ভারতের মানুষকে দিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে যদি যুদ্ধ করাতে হয় তা হলে তার একটাই উপায় আছে। তাদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রভু। শুধু তাই নয়, প্রতিরক্ষা ব্রিটিশের দায়িত্ব এই বিশ্বাসে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাদের মধ্যে এ বোধ সঞ্চারিত করতে হবে যে প্রতিরক্ষা তাদের নিজেদেরই কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে গান্ধীজি স্থির করলেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করবেন; আন্দোলনের লক্ষ্য হবে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটিশ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন : 'আমি জানি ধারণাটি এত অভিনব, এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এটি উপস্থাপিত হয়েছে যে অনেকেই বিহ্বল বোধ করছেন। আমাকেও হয়তো উন্মাদ আখ্যা দেওয়া হবে, কিন্তু আমি যদি নিজের প্রতি সত্য আচরণ করতে চাই, তা হলে এ সত্য না বলে আমার উপায় নেই। আমার ধারণা এ যুদ্ধে আমার যদি কোনো অবদান থাকে এই সে অবদান, ভারতবর্ষকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার এটাই আমি উপায় মনে করি; এটার মূল্য আমার কাছে এইজন্য এত বেশি।'

অনেক নেতারই কিন্তু মনে হয়েছিল যে এ-ধরনের চরম দাবি জানানোর পক্ষে সময় খুব অনুকূল নয়। তাঁরা শঙ্কিত হলেন যে এতে হয়তো চরম ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে; জাপানের মতো নির্মম শত্রুর হাতে জনসাধারণ হয়তো অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে পারে। নেহরু অন্য কথা ভাবছিলেন। ক্রিপ্‌স্‌ মিশন

তখন ব্যর্থ হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পূর্ণ সহযোগিতার আর কোনো পথ নেতাদের সামনে খোলা নেই। এ অবস্থায় দেশে যদি গণ-অভ্যুত্থানের আলোড়ন জাগানো হয়, তা হলে ফ্যাসিবাদীদের হাতে মিত্রশক্তির হয়তো পরাজয়ও ঘটতে পারে। একটি প্রশ্নে নেহরু আরো বিশেষ করে উদ্বিগ্ন হন ভারতকে যদি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রামী রাশিয়া ও চীনের পক্ষও বর্জন করতে হবে।

দীর্ঘদিন এ নিয়ে বিতর্ক আলোচনা চলে, অনেক তিক্ততারও সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি কিন্তু অনমনীয়ই থাকেন। শুধু তাই নয়, নিজের মতকে গ্রাহ্য করে তোলার ব্যাপারে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান। তিনি অবশ্য মেনে নিলেন যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভারতে যেতে পারে, এবং তাদের জন্য কিছু ঘাঁটিও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে তা একমাত্র শর্তে : অবিলম্বে ভারতের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। কংগ্রেস যদি এই মতটুকু মেনে না নেন তা হলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এবং 'ভারতের মাটি থেকেই কংগ্রেসের চেয়ে বৃহত্তর এক আন্দোলন গড়ে তুলবেন।'

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি জুলাই-এর গোড়ার দিকে ওয়ার্ধায় মিলিত হন, এখানে তাঁরা 'জাতীয় দাবির' একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। ব্রিটেনকে জানানো হয় তাঁরা যেন ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এ দেশ ছেড়ে চলে যান। এ প্রস্তাব যদি তাঁরা অগ্রাহ্য করেন তা হলে 'কংগ্রেস অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবেন; ১৯২০ সাল থেকে যত অহিংস শক্তি তাঁরা সঞ্চয় করেছেন তা এ সংগ্রামে ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন।' কংগ্রেসের সাধারণ কমিটি যাতে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন সেজন্য ৭ অগাস্ট বোম্বাইতে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়।

ইতিমধ্যে চীনের জেনারেল চিয়াং কাই-শেক এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের একটা আপস রফার চেষ্টা করছিলেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল কিন্তু কোনো রকম আপসে রাজী হলেন না; প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করার জন্য আমি ব্রিটিশ রাজের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করি নি।'

১৯৪২-এর অগাস্টে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসল ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। এই অধিবেশনেই গৃহীত হল বিখ্যাত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। তবে এ প্রস্তাবকে পুরোপুরি আপসহীন বলে মনে করা ভুল হবে। ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য-দানের অঙ্গীকার এ প্রস্তাবে ছিল, আর ছিল সরকারের প্রতি আহ্বান যাতে তাঁরা অবিলম্বে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেন। প্রস্তাবে আরো বলা হল :

> ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে, এবং স্বাধীন ভারত জাতিসংঘের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবে। মুসলিম লীগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে দেশের জন্য এমন একটি সংবিধান রচিত হবে যাতে প্রস্তাবিত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের

অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে প্রভূত মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতা ছাড়া বাকি ক্ষমতা অঞ্চলগুলির হাতেই তুলে দেওয়া হবে।

প্রস্তাবটির উপসংহারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয় :

> যে জাতি আজ সাম্রাজ্যবাদী, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিজের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে ব্রতী, তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা আর কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না।...ব্যাপকভাবে অহিংস গণ-অভ্যুত্থানকে জাগ্রত করার যে সংকল্প...কমিটি আজ তাকে অনুমোদন করার প্রস্তাব নিচ্ছে...এ সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজি।

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর গান্ধীজি সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন :

> প্রকৃত সংগ্রাম যে এই মুহূর্তেই শুরু হচ্ছে তা নয়। আপনারা আমার হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন; সেই ক্ষমতার ভিত্তিতে আমার প্রথম কাজ, মহামান্য ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের দাবি সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কাজে দু সপ্তাহ-এমন কি, তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। ততদিন আপনারা কী করবেন? চরকা অবশ্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কিছু আছে, যা অনুভবের। পুরুষই বা মহিলাই হোন আপনাদের প্রত্যেককে এই মুহূর্ত থেকে অনুভব করতে হবে যে আপনারা মুক্ত; আপনাদের স্বাধীনভাবে আচরণ করতে হবে, মনে রাখতে হবে আপনারা আর সাম্রাজ্যবাদের পদানত নন।

কিন্তু ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীজিকে দেখা করার সুযোগ সরকার আর দিলেন না। সরকারী শাসনবিভাগ প্রস্তুত হয়েই ছিল। ৮ অগাস্ট গভীর রাত্রে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হল; তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গান্ধীজি ও কার্যকরী সমিতির সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে বিশেষ ট্রেনে বোম্বাই থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুনার আগা খানের প্রাসাদে গান্ধীজি আটক রইলেন, অন্যদের পাঠানো হয় আহমেদনগর দুর্গে।

'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের খবর ভারতবাসীর কাছে একসঙ্গে পৌঁছল—৯ অগাস্টের সকালে। দেশের লোক এ সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না; স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। অবিলম্বে এর যে প্রতিক্রিয়া হল তা যেমনই চকিত, তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত। সারা দেশে জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেল, কাজের চাকা গেল থেমে। প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক শহরাঞ্চলে হরতাল পালিত হল, সংগঠিত হল বিক্ষোভ আর মিছিল। জাতীয় সংগীত ও শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে দেশবাসী দাবি করল নেতাদের মুক্তি। কোনো রকম হিংস্রতা কিন্তু তখনো দেখা দেয় নি, যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হলেও জনতা তখনো মোটামুটি শান্ত ছিল। কিন্তু চারিদিকে চাপা উত্তেজনা, বিপুল জনসমুদ্র দেখে সরকার বিচলিত হয়ে উঠলেন। যেখানেই জনতা সরকারী সতর্কবাণী মেনে নিতে বা ছত্রভঙ্গ হতে অস্বীকার করল সেখানেই চলল পুলিশের গুলিবর্ষণ। শুধু দিল্লিতেই ১১ ও ১২ অগাস্ট এই দুই তারিখে বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশ ৪৭ বার গুলিবর্ষণ করে। ফলে

৭৬ জন হত হন, গুরুতরভাবে আহত হন ১১৪ জন। গণ-বিক্ষোভ, পুলিশী অত্যাচার, গুলিবর্ষণ, গ্রেফতার—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় প্রতিটি জায়গায়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। অধিকাংশ নেতাই তখন জেলে, কেউ কেউ আত্মগোপন করে আছেন। জনসাধারণকে পরিচালনা করার মতো কেউ নেই, অথচ উত্তেজনা ক্রমশ চরমে উঠছে; পুলিশী অত্যাচার এবং (ব্রিটিশ) রাজের বিশেষ ক্ষমতার দম্ভ মানুষের ক্রোধের শিখা ক্রমশ লেলিহান করে তুলছে। কংগ্রেস আইন অমান্যের কোনো ডাক দেন নি; ছোটোখাটো প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষ হিসেবে যা শুরু হয়েছিল অচিরেই তা আন্দোলনের রূপ ধারণ করল। সে আন্দোলন আবার অচিরেই রূপান্তরিত হ'ল বিদ্রোহে। এ বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক। স্কুল, কলেজ এবং কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল; থানা, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে স্টেশন প্রভৃতি যে-সব প্রতিষ্ঠানেকে ব্রিটিশ-আধিপত্যের প্রতীক বলে ধরা হত তাদের ওপরও আক্রমণ চলল; বিদ্রোহীরা সেগুলিতে হয় আগুন লাগিয়ে দিল কিংবা ধ্বংস করে ফেলল, টেলিগ্রাফের তার কাটা বা ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপও শুরু হ'ল কিছুদিন পরে। কৃষকরা যাতে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তার জন্য ক্রমাগত প্রচারকার্য চালানো হল। অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা নিজেরাই বিকল্প সরকার গঠন করল; দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্রিটিশ সরকারের কোনো ক্ষমতাই ছিল না সে-সব অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করার। বালিয়ায় স্থানীয় নেতারাই শহরের কর্তৃত্ব দখল করে নিলেন; সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তবে তাঁদের দমন করা সম্ভব হল। সুতাহাটা, সাতারা এবং কর্ণাটকে কৃষকেরা গুপ্ত গেরিলা আন্দোলন শুরু করলেন; গেরিলা সংগ্রাম অব্যাহত ছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ ছিলেন এই যুগের গুপ্ত আন্দোলনের প্রধান নেতাদের অন্যতম। বৈপ্লবিক হিংস্রতাও ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করল এই সময়।

শুধুমাত্র ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতেই এ বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণের মধ্যেও। এই পরিস্থিতিতে সরকারী প্রতিক্রিয়া হ'ল যেমন ত্বরিত তেমনি নির্মম; সারা দেশে সৃষ্টি হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। লাঠিচালনা, গুলি বর্ষণ, ব্যাপকহারে গ্রেফতার—এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল এবং সারা দেশে পুলিশী রাষ্ট্রের রূপধারণ করল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনতার ওপর শূন্যপথ থেকে পর্যন্ত মেসিনগানে গুলিবর্ষণ করা হল। শাস্তিমূলক জরিমানা, বা প্রায় বিনা বিচারে দণ্ডাদেশ দেওয়াও স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠল। এই স্বল্পস্থায়ী অথচ প্রচণ্ড রকমের তীব্র বিদ্রোহকে দমন করতে সরকার যে নির্মমতার আশ্রয় নিলেন তা অভাবনীয়। পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণে প্রাণ হারাল দশ হাজারের ওপর মানুষ। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর সারা দেশে সরকারী দমননীতির এরকম ব্যাপক ও

নিষ্ঠুর প্রকাশ আর কখনো দেখা যায় নি।

১৯৪২-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার অনেক কারণ আছে। নিরস্ত্র জনতাদের পরিচালিত করার মতো না ছিলেন কোনো নেতা, না ছিল কোনো সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সফল হওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি, এর সাফল্যের স্বাক্ষর মেলে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ভারতবর্ষের ক্রোধ, মুক্তির জন্য তার অজেয় সংকল্প অত্যন্ত লক্ষণীয় ও অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পায় এ বিদ্রোহের মধ্যে। জাতীয়তাবাদী চেতনা কী তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, মুক্তির অধিকার অর্জনে কী নিপীড়ন, কী আত্মত্যাগ বরণ করার জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত হয়েছিল এ বিদ্রোহ তার জীবন্ত দলিল। দ্বিতীয়ত, ৪২-এর বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকদের মনে আর কোনো সন্দেহের অবকাশই রইল না যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের আবসান আসন্নপ্রায়।

৪২-এর বিদ্রোহকে এক অর্থে মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় বলা যেতে পারে। কখন, কিভাবে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে বা স্বাধীনতালাভের পর ভারতের সরকার কিভাবে সংগঠিত হবে এই প্রশ্নটুকুই শুধু তখনকার মতো অমীমাংসিত থাকে। সন্দেহ নেই ৪২-এর পরেও রাজনীতি অনেক রকম চেহারা নিয়েছে; ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অনেক আলোচনা, অনেক দর কষাকষি হয়েছে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের জয় যে অবধারিত এ সংগ্রামের পর সে সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশই ছিল না।

সিমলা বৈঠক

১৯৪৫-এর বসন্তকাল নাগাদ ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতবর্ষে এই সময় লিনলিথগোর পর ভাইসরয় হয়ে এলেন ওয়াভেল। ওয়াভেল পেশায় সৈনিক, লিনলিথগো ভাইসরয় থাকার সময় তিনি ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ। যুদ্ধবিশারদেরা সে সময় মনে করছিলেন যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরো কিছুদিন—অন্তত একবছর—চলবে। সৈনিক ওয়াভেলের নিজেরও ছিল এই মত। (১৯৪৫-এর অগাস্টে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার যে নাটকীয়ভাবে এশিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবে, তখনো তা বোঝার উপায় ছিল না)। এশিয়ায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকার অর্থ ভারতীয় যুদ্ধ-ঘাঁটি ও বেশি পরিমাণে ভারতীয় অর্থসম্পদের ব্যবহার। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তেজনা তখন যে স্তরে পৌঁছেছে তার থেকে ওয়াভেল বুঝতে পারছিলেন যে অচলাবস্থার অবসান অপরিহার্য—জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে গেলে ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পদত্যাগ করলেন, আবার নতুন নির্বাচন হবার কথা। ১৪ জুন কতকগুলি নতুন প্রস্তাব

ঘোষিত হল। তাতে বলা হ'ল যে ১৯৩৫-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষে আরো কিছু নতুন সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রবর্তিত হবে। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সব সদস্য মুক্তি পেলেন; গান্ধীজির ওপর থেকে আটকের আদেশ এর আগেই তুলে নেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থেকে কিছু প্রতিনিধিকে একটি সম্মেলনে ডাকা হ'ল। স্থির হ'ল সম্মেলন বসবে সিমলায়—২৫ জুন থেকে।

প্রস্তাবগুলির মধ্যে কিছুটা সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেলেও মূলত সেগুলি ছিল অসন্তোষজনক, আর অন্তত একটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্ররোচনামূলক। প্রস্তাবে বলা হ'ল, ভাইসরয় নিজে এবং ব্রিটিশ প্রধান সেনাধ্যক্ষ—এই দুজন ছাড়া ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বাকি সব সদস্য হবেন ভারতীয়। সরকারীভাবে ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতাগুলি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হবে না, তবে সে ক্ষমতা তিনি 'অযৌক্তিকভাবে' ব্যবহার করবেন না, এ আশ্বাস পাওয়া গেল। প্রস্তাবগুলির এই অংশটুকু প্রগতিমূলক; বাকি যা তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। বলা হল, কাউন্সিলে 'বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের অনুপাত হবে সমান সমান।' সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমতার যে দাবি মুসলিম লীগ এতদিন করে আসছিলেন তার প্রতি ব্রিটিশ নীতির সমর্থন এই প্রথম সরকারীভাবে ঘোষিত হল। অবশ্য বলা হ'ল যে 'কোনো সাংবিধানিক চুক্তি জোর করে আদায় করা বা চাপিয়ে দেওয়া' প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য নয়; প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হবে সিমলা সম্মেলনে।

সম্মেলন শুরু হবার সময় যেটুকু আশার রেখা দেখা দিয়েছিল তা অচিরেই মিলিয়ে যায়। জিন্নার অনমনীয় মনোভাব ও তাঁর প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন সম্মেলনের সাফল্যকে অসম্ভব করে তোলে। অবশেষে জিন্না যখন জিদ ধরে বসলেন যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যেরা শুধু মুসলিম লীগের দ্বারাই মনোনীত হতে পারবেন তখন মীমাংসা-আলোচনা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন না। 'বিভাজন ও শাসন' নীতির চরম রূপ দেখা গেল সিমলা বৈঠকে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

১৯৪২-এর বিদ্রোহ দমন থেকে ১৯৪৫-এর ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি—এর মধ্যবর্তী সময়ে সারা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায় ছিল না বললেই চলে। বিখ্যাত নেতারা সবাই তখন জেলে; নতুন নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটবে, পরিস্থিতি তার অনুকূল নয়। বিদ্রোহের আগুন গোপনে গোপনে জ্বলতে থাকলেও এক সার্বিক অবসাদ দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যুদ্ধের চাকা তখনো গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে; কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের গতি গিয়েছে থেমে। ইতিমধ্যে, ১৯৪১-এর মার্চে, সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে দেশত্যাগ করেছিলেন। তিনি প্রথমে যান সোভিয়েট রাশিয়ায়; উদ্দেশ্য

ছিল মুক্তি সংগ্রামে রাশিয়ার সাহায্যের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ১৯৪১-এর জুনে জার্মানির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে রাশিয়া মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিল। সুভাষচন্দ্র তখন সাহায্যের আশায় পাড়ি দিলেন জার্মানিতে। জার্মানির কাছ থেকে কিছু সাহায্যের আশ্বাস পাবার পর মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সুভাষচন্দ্র জাপানে গেলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সংগঠনে উদ্যোগী হয়েছিল জাপান। মালয় ও বর্মা থেকে ব্রিটিশ বাহিনী সরে আসার সময় এই-সব অফিসার ও সৈনিকদের ফেলে রেখে এসেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন অনেক যুদ্ধবন্দী (শুধু মালয়েই এঁদের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০) আর অসংখ্য ভারতীয় নাগরিক যাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাস করতেন। যুদ্ধের ফলে এঁরাও দেশে ফিরতে পারেন নি। এঁদের নিয়ে সংগঠিত বাহিনীর পরিচালনার ভার নিলেন সুভাষচন্দ্র। জাপানী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। জাতীয় বাহিনীর স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অফিসার ও সৈনিকদের স্বপ্ন ছিল তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভারতে প্রবেশ করবেন, আর স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের কর্ণধার হবেন সুভাষচন্দ্র।

জাপানের পরাজয়ের পর জাতীয় বাহিনীর পরিকল্পনা অপূর্ণই থেকে গেল। টোকিওর পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র নিহত হলেন। জাপান ও তার ফ্যাসিস্ট মিত্রদের সহায়তায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এ চিন্তা অনেক নেতারই মনঃপুত ছিল না এ কথা সত্য। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে জাতীয়তাবাদীরা যখন অসহায় ও নিরাশাপীড়িত, তখন তাদের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে রাখেন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর জাতীয় বাহিনী; সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে, এমন-কি, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছেও তাঁরা সাহস ও স্বদেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা যেমন মহৎ, তেমনই প্রেরণাদায়ক। তাই সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে জাতীয় বাহিনীর অনেক অফিসার ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করেছেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁদের বিচার হবে তখন সারাদেশের জাতীয়তাবাদীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে দেখা দিল গণবিক্ষোভ। শুধু কংগ্রেসই নয়, দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক নেতারা এই বিচারের বিরোধিতা করলেন, তাঁরা সবাই জোরের সঙ্গে দাবি করতে লাগলেন যে জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের মুক্তি দেওয়া হোক। ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সপ্রু, কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবীদের নিয়ে কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করলেন, বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের ভার পড়ল এই কমিটির ওপর। দিল্লিতে লালকেল্লার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলে জাতীয় নেতারা অফিসারদের পক্ষ সমর্থন করতে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন দেশজুড়ে এক চরম নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সব অফিসারই দোষী সাব্যস্ত হলেন, তাঁদের দণ্ডাদেশও দেওয়া হ'ল, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতেই হ'ল সরকারকে। অফিসারদের ওপর থেকে দণ্ডাদেশ তুলে নেওয়া হল। অবশেষে মুক্তি পেলেন তাঁরা।

সংগ্রামের সমাপ্তি

বিরোধের পালা যখন শেষ হল তখন এ কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ভারতকে আর বেশিদিন স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখা সম্ভব নয়। স্বদেশে-বিদেশে এমন অনেক ঘটনা ঘটছিল যাতে ব্রিটেনের এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা তখন বৃহৎ শক্তি হিসেবে গণ্য। উভয় দেশই ছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমর্থক। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার অর্থনীতি, তার সামরিক শক্তি গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেশকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সময় চাই। যুদ্ধক্লান্ত দেশবাসী, বিশেষ করে যাঁরা প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তা ছাড়া নির্বাচনে রক্ষণশীলদের পরাজয়ের ফলে ক্ষমতায় এলেন লেবার পার্টি। তাঁরা ছিলেন ভারতীয়দের দাবি মেনে নেবার পক্ষপাতী। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল, ভারতের পরিস্থিতিই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, ব্রিটিশের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা আর আদৌ সম্ভব ছিল না। আই.এন.এ. অফিসারদের বিচার এ কথা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করল যে ভারতের জনসাধারণ সরকারী দমননীতিকে আর মেনে নিতে রাজী নয়। অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের শান্ত রাখা যাবে না। ভারতের সংগ্রামী প্রাণশক্তি যেভাবে জেগে উঠেছে, তাতে জাতীয় দাবিগুলি যদি যথোপযুক্তভাবে মেনে নেওয়া না হয়, তা হলে যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা। এই ধারণার আরো অনেক সংগত কারণ ছিল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীতেও (Indian Air Force) ব্যাপক অসন্তোষ ও ধর্মঘট দেখা দিল। জব্বলপুরে ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোর (Indian Signal Corps) ধর্মঘট শুরু করলেন। পুলিশ এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যেও দেখা গেল জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ এবং এ কথা বোঝা গেল যে তাঁদের দিয়ে জাতীয় আন্দোলন দমন করতে গেলে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল শুধু যে ব্রিটিশ ভারতেই বৃদ্ধি পেল তা নয়, দেশীয় রাজ্যসমূহেও ছড়িয়ে পড়ল।

এই-সব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে ভারতের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সমস্ত খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন। সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ, বিশদ আলাপ-আলোচনার পর ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, এবং পরিকল্পনাটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই দলই গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরিকল্পনার ব্যাখ্যা নিয়ে আবার দেখা

দিল মতপার্থক্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে ওয়াভেল কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে সেপ্টেম্বরে (১৯৪৬) কংগ্রেসই সরকার গঠন করলেন, মন্ত্রীসভার (Council of Ministers) কর্ণধার হলেন জওহরলাল নেহরু। মুসলিম লীগও অক্টোবরে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন, কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন সংবিধান রচনায় কোনো রকম অংশগ্রহণ করবেন না। ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি ঘোষণা করলেন ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবেন।

এই সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের বন্দোবস্ত করার জন্য ভারতে ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে গুরুতর বিরোধ দেখা দিলেও লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একটি আপস প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে নির্ধারিত সময়ের এক বছরেরও আগে, ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তবে দেশকে দুভাগে ভাগ করা হবে। পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান—পশ্চিমের এই অঞ্চলগুলি এবং পূর্বে পূর্ববাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। এ রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই পাকিস্তানও স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হবে। অবশ্য প্রস্তাবে এ ব্যবস্থাও রইল যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও শ্রীহট্টের জনসাধারণের ইচ্ছা কী তা পরে গণভোটের মাধ্যমে স্থির হবে।

মুক্তিলাভের গর্ব ও আনন্দের পূর্ণ আস্বাদ তাই ভারতবাসী পেল না, তার সঙ্গে মিশে রইল দেশবিভাগের ও দেশবিভাগের পরিণতির যন্ত্রণা ও বিষাদ। দেশবাসী তাই বলে হতাশ হয়ে পড়ে নি। অগ্রগতির পথে স্বাধীনতা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আত্মপ্রত্যয় বিশ্বাস আর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়ের পরিপূর্ণতার সাধনায় ভারত এগিয়ে চলল।

□□

Printed at M/S Bharat Mudranalaya, Delhi